NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

ELECTIVE GEOGRAPHY HONOURS

EGR - 14

Agricultural Geography & Regional Planning

Blocks 1& 2

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনো বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে— যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ-কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোন শিক্ষার্থীও এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশকিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

অষ্টম পুনর্মুদ্রণ ঃ আগস্ট, 2019

বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the
Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় ঃ ভূগোল

স্নাতক স্তর

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ

EGR 14 : 01 & 02

		রচনা	সম্পাদনা
পর্যায় 1			
একক	1-3	অধ্যাপক পান্নালাল দাস	শ্রীমতী টিঙ্কি কর
পর্যায় 2			
একক	1-3	অধ্যাপিকা সংযুক্তা চ্যাটার্জী	অধ্যাপিকা কানন চ্যাটার্জী

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

E G R – 14

কৃষি ভূগোল ও প্রাকৃতিক ভূগোল
(স্নাতক পাঠক্রম)

পর্যায়

1

একক 1 ❑ কৃষি ভূগোলের প্রকৃতি, ক্ষেত্র গুরুত্ব ও ইতিবৃত্ত 7-14

একক 2 ❑ পেরি আরবান বলয় ও সিনক্লেয়ারের মডেল 15-31

একক 3 ❑ কৃষি অঞ্চল 32-48

পর্যায়

2

একক 1 ❑ অঞ্চলের ধারণা ও পরিকল্পনার প্রকারভেদ 51-79

একক 2 ❑ শহরের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ 80-109

একক 3 ❑ গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প— ভারতের উদাহরণ 110-123

একক 1 ❒ কৃষি ভূগোলের প্রকৃতি, ক্ষেত্র, গুরুত্ব ও ইতিবৃত্ত (Nature, Scope and Content of Agricultural Geography, Development of Agricultural Geography)

গঠন

1.0 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

1.1 অভিধানিক অর্থ

1.2 কৃষি ভূগোলের প্রকৃতি

1.3 কৃষি ভূগোলের লক্ষ্য **(Aims of Agricultural Geography)**

1.4 কৃষি ভূগোলের ক্ষেত্র ও গুরুত্ব **(Scope and significance of Agricultural Geography)**

1.5 কৃষি ভূগোলের ইতিবৃত্ত **(Historical development of Agricultural Geography)**

1.6 ভারতে কৃষি ভূগোলের পঠন-পাঠন ও প্রসার

1.0 প্রস্তাবনা

কোন বিষয়ে পাঠ আরম্ভ হয় বিষয়টি কি এই প্রশ্ন দিয়ে। কৃষি ভূগোল আজ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কৃষিকাজ সুপ্রাচীন পেশাসমূহ যেমন খাদ্যসংগ্রহ (Food gathering), পশুশিকার (Hunting), মৎস্য শিকার (Fishing), পশুচারণ (Nomadic herding) প্রভৃতির তুলনায় অনেক নবীন। তথাপি বর্তমানে কৃষিই পৃথিবীর শতকরা ৭০-৮০ ভাগ অধিবাসীর উপজীবিকা। তাই এর পাঠও আরম্ভ হওয়া দরকার বিষয়টি কি এই প্রশ্ন দিয়ে।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ঃ কৃষি ভূগোল এই দুটি শব্দের প্রথমটি অর্থাৎ 'কৃষি' (Agriculture) শব্দটি এসেছে লাতিন মূল থেকে আর 'ভূগোল' (Geography) কথাটি এসেছে গ্রিক মূল থেকে। (Agriculture) কথাটি লাতিন রূপ হল 'Agercultura'. এর মধ্যে আবার দুটি লাতিন শব্দ রয়েছে— 'ager' যার অর্থ ভূমি (field) এবং 'cultura' যার অর্থ culture অথবা to cultivate. মোদ্দা কথায় ভূমি কর্ষণ (tilling of soil). Geography কথাটির গ্রিক রূপ হল 'Geographia'-এর মধ্যেও রয়েছে দুটি গ্রিক শব্দ— 'geo' যার অর্থ earth অর্থাৎ পৃথিবী এবং 'graphia' যার অর্থ to describe অর্থাৎ বর্ণনা। মোদ্দা কথা পৃথিবীর বর্ণনা। শেষ মেশ, কৃষির অর্থ যা দাঁড়ালো তা হল মৃত্তিকা কর্ষণ বা পরিচর্যার দ্বারা ফসল ফলানো। আর কৃষি ভূগোলের অর্থ হল মৃত্তিকা কর্ষণের দ্বারা ফসল ফলানোর বর্ণনা।

1.0 উদ্দেশ্য (Objective)

কৃষি ভূগোল পাঠের উদ্দেশ্যগুলি হল—

(i) পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কৃষি ব্যবস্থা কেন গড়ে উঠেছে তা বিশ্লেষণ করা ও ওই ভিন্ন ভিন্ন কৃষিব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি তা নির্ধারণ করা। (ii) এক একটি বিশেষ কৃষি ব্যবস্থা বিশেষ বিশেষ অঞ্চলেই বা কেন গড়ে উঠেছে তা জানা এবং একটি কৃষি অঞ্চল আরেকটি অঞ্চলের সঙ্গে কতখানি সাদৃশ্যযুক্ত বা সাদৃশ্যযুক্ত নয় তা নিরূপণ করা। (iii) একটি কৃষি অঞ্চলে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটছে বা কেনই বা ঘটছে তা ব্যাখ্যা করা (iv) কোন একটি কৃষি অঞ্চলে যে পরিবর্তন ঘটছে তার পরিমাণ কি ও কোন্ দিকে পরিবর্তন ঘটছে তা পরিমাপ করা (v) শস্য অঞ্চল, কৃষি অঞ্চল, শস্য সংযোগ (crop combination) ইত্যাদি অঞ্চলের সীমা নির্ধারণ করা। (vi) একটি অঞ্চল অপর অঞ্চলের সঙ্গে কতখানি পার্থক্যযুক্ত তা নির্দেশ করা (vii) উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে দুর্বল স্থানগুলি চিহ্নিত করা (viii) কোন্ কোন্ অঞ্চল ক্রমপরিবর্তনশীল বা পরিবর্তন বিমুখ, বা দারিদ্রপীড়িত তাদের সীমা নির্দেশ করা ইত্যাদি।

1.1 অভিধানিক অর্থ

অভিধানের ভাষায় কৃষি হল, একটি বিজ্ঞান বা কৌশল অথবা ব্যাপক মৃত্তিকা কর্ষণ প্রক্রিয়া যার দ্বারা ফসল ফলানো হয়। কৃষি ও পশুপালন দুটি ভিন্ন পেশা। 'কৃষি' জমি কর্ষণ করে কৃষিপণ্য উৎপাদন করে আর 'পশু পালন' তৃণভোজী পশুপালনের দ্বারা পশু ও পশুজাত দ্রব্য উৎপাদন করে। উৎপাদনের ক্ষেত্র ভিন্ন হলেও মূলত দুই পেশার মধ্যে সাদৃশ্য আছে। তাই ব্যাপক অর্থে কৃষি বলতে কৃষিপণ্য উৎপাদন ও পশু ও পশুজাত খাদ্যবস্তু উৎপাদন দুটোকেই বোঝায়। শুধু পার্থক্য হল এই যে, কৃষি মৃত্তিকা পরিচর্যা করে আর পশুপালন তৃণভোজী পশুর পরিচর্যা করে।

পেশা হিসাবে কৃষির স্থান ঃ

কৃষি যেহেতু প্রকৃতির দান অর্থাৎ মৃত্তিকার পরিচর্যা করে এবং পশুপালন অর্থাৎ আরেকটি প্রকৃতির দান তৃণভোজী প্রাণীর প্রতিপালন করে তাই কৃষি একটি প্রাথমিক পেশা (Primary occupation)। কিন্তু অন্যান্য পেশাগুলি যেমন শিল্প (Secondary occupation) ব্যবসাবাণিজ্য (Tertiary occupation) অনেকাংশেই কৃষির উপর নির্ভরশীল। যেমন কেবলমাত্র কৃষিপণ্যের বা পশুজাত পণ্যের উপর ভিত্তি করে অনেক শিল্প গড়ে ওঠে। আবার ওই সকল শিল্পদ্রব্য আদান প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসাবাণিজ্য গড়ে ওঠে। তাই কৃষি আজও মানব সভ্যতার মূল ভিত্তি।

1.2 কৃষি ভূগোলের প্রকৃতি (Nature of Agriculture Geography)

এখন প্রশ্ন হল কৃষি ভূগোলের প্রকৃতি কি? এই বিষয়টিকে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা সমীচিন না কি মানবীয় বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা সমীচিন। সাধারণ কথায় যা কিছু যুক্তিগ্রাহ্য, যা কিছু যুক্তি দিয়ে

বিশ্লেষণ করা যায় তাই বিজ্ঞান। আর যা যুক্তিগ্রাহ্য নয় বা যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না তা বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয়। এখন দেখা যাক কৃষি ভূগোলের প্রকৃতি কি।

কৃষি ভূগোল হল পৃথিবীতে কৃষি ব্যবস্থার যে আঞ্চলিক বিভিন্নতা তা পাঠ করা ও তার বিশ্লেষণ করা এবং সময়ভেদে ওই অঞ্চলগুলিতে কি পরিবর্তন ঘটছে তা পর্যালোচনা করা। সেই হিসাবে কৃষি ভূগোল একটি বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়। কারণ কৃষির আঞ্চলিক বিভিন্নতা পরিবেশের আঞ্চলিক বিভিন্নতারই নামান্তর। যে অঞ্চলে বৃষ্টিপাত নগণ্য, তাপমাত্রাও অপ্রতুল সেখানে কৃষি সম্ভব নয়। যেখানে সারা বৎসর বৃষ্টিপাত ঘটে ও সারা বছরই তাপমাত্রা বেশি সেখানে গম চাষ সম্ভব নয়। যেখানে তৃণভূমি নেই সেইখানে পশুপালন গড়ে ওঠে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কৃষিব্যবস্থা গড়ে ওঠা যুক্তিনির্ভর। আবার যে সকল স্থান উর্বর সে সকল স্থানে কৃষি উৎপাদন বেশী। অন্যথায় কম। শুধু তাই নয় সময় ভেদে কোন অঞ্চলে যে কৃষিব্যবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাও যথেষ্ট যুক্তিনির্ভর। কোন একটি অঞ্চলে কোনও একটি শস্য চাষ বন্ধ হয়ে যেতে পারে যদি চাষীরা যথাযথ মূল্য না পায়। আবার একটি সম্পূর্ণ নতুন শস্যের চাষ শুরু হতে পারে যদি চাষীরা তা লাভজনক মনে করে। সুতরাং কোন শস্য কোন অঞ্চলে চাষ করা হবে কি না তা যথেষ্টই যুক্তিনির্ভর। সেই হিসাবে কৃষি ভূগোল একটি বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়। আর যুক্তিনির্ভর বলেই বা এই বিষয়টিকে যুক্তিনির্ভর হিসাবে গড়ে তোলার জন্যই আজ কৃষি ভূগোল সমগ্র বা মূল বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

1.3 কৃষি ভূগোলের লক্ষ্য (Aims of Agricultural Geography)

কৃষি ভূগোলের লক্ষ্য হল পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি ব্যবস্থার যে বৈষম্য তা চিহ্নিত করা, বৈষম্যের কারণ বিশ্লেষণ করা এবং একটি অঞ্চলের সঙ্গে অপর একটি অঞ্চলের সামঞ্জস্য পর্যালোচনা করা। এই কর্মযজ্ঞে কৃষি ভৌগোলিককে প্রথমে (ক) তার অনুসন্ধানের সমস্যাটিকে নির্দিষ্ট করতে হবে, (খ) সেই বিষয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, (গ) তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে কোন সূত্রে উপনীত হতে হবে এবং (ঘ) প্রয়োজন মতো ওই সূত্র পরিবর্তন করতে হবে যাতে করে প্রত্যেকটি কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ের উপযুক্ত ও যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

এখন এটা পরিষ্কার যে কৃষি ভগোল একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং একজন কৃষি ভৌগোলিক কোন স্থানের কৃষি সম্বন্ধে তিন ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে যথা (১) কি ধরনের কৃষিব্যবস্থা সেখানে গড়ে উঠেছে, (২) কোথায় সেটি অবস্থিত ও (৩) কেন সেখানে ওই ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

কৃষি ভৌগোলিকের আরেকটি কাজ হল তথ্যের ভিত্তিতে কোন স্থান বা অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থার যে প্রতিরূপ পরিস্ফুট হল তা মানচিত্রে উপস্থাপনা করা। মানচিত্রে উপস্থাপনের প্রধান সুবিধা এই যে একটি মানচিত্রে একসঙ্গে বহু তথ্য উপস্থাপিত করা সম্ভব। একটি অঞ্চলের মানচিত্র অন্য অঞ্চলের মানচিত্রের সঙ্গে তুলনা ওই দুটি অঞ্চলের গুণগত বা পরিমাণগত বা গঠনগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

আবার উৎপাদন ও তার এক বা একাধিক কারণের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলে তা একটিসূত্রের আকারে প্রকাশ করা যায়। যেমন যদি দেখা যায় বৃষ্টিপাত বাড়লে উৎপাদন বাড়ে তবে বৃষ্টিপাত কতটা বাড়লে উৎপাদন কত হবে তা নির্ধারণ করা সম্ভব। কৃষি উৎপাদন বা কোন কৃষি পণ্যের মূল্য বা কৃষি সংক্রান্ত অন্য কিছু কতকগুলি কারণের উপর নির্ভরশীল। ওই নির্ভরশীলতা একটি নক্সা বা মডেল এঁকে দেখানো যায়। এতে

একটি বিরাট কার্যকারণ সম্পর্ক একটি ছোট মডেলের সাহায্যে উপস্থাপনা করা যায়।

কৃষিবিজ্ঞানে কোন সমস্যা বা বিষয় সম্বন্ধে পাঠ ও গবেষণার পূর্বে সেই সংক্রান্ত বিষয়ে কি ধরনের পাঠ করা হয়েছে বা সিদ্ধান্ত হয়েছে তা জানা আবশ্যক। এ জন্য প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তক পাঠ করা দরকার। এর পর তথ্য সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করে ওই সকল পূর্বে গৃহীত সূত্রগুলিকে আরও বাস্তবময় করে তোলা দরকার। মনে রাখতে হবে যে, এসব সত্ত্বেও কৃষিবিজ্ঞানের বহু কাজ বাকী। এখনও অনেক কিছু প্রমাণ করার আছে। এই দায়িত্ব পরবর্তী যুগের কৃষি ভৌগোলিকদের গ্রহণ করতে হবে।

1.4 কৃষি ভূগোলের ক্ষেত্র ও গুরুত্ব (Scope and Significance of Agricultural Geography)

বিগত কয়েক দশকে কৃষি ভূগোলে অভূতপূর্ব গবেষণা হয়েছে। ফলে কৃষি ভূগোলের ক্ষেত্র ক্ষুদ্র থেকে ব্যাপক, ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়েছে। কৃষি ভূগোল, ভূগোলের অন্যান্য শাখাগুলির তুলনায় অনেক উন্নত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে নতুন নতুন ধারণা সৃষ্টিতে ও কৃষি ভূগোলের বিভিন্ন ঘটনাসমূহকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করার পারদর্শিতার দিক থেকে। বর্তমান পরিবর্তনশীল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে যে-কোন পরিস্থিতির মোকাবিলায় কৃষি ভূগোল সম্পূর্ণভাবে তৈরী। একজন কৃষি ভৌগোলিক সুষ্ঠু ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় সুচিন্তিত মতামত দিতে সক্ষম।

কৃষির দিক থেকে দুর্বল বা অনুন্নত অঞ্চলগুলি একবার চিহ্নিত করা সম্ভব হলে সেখানকার ত্রুটিগুলি দূর করে কিভাবে তা উন্নত করা যায় তার নির্দেশ দেওয়া কৃষি ভূগোলের কাজ। এই কাজ সম্পন্ন হলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য প্রশমিত করা সম্ভব হয় ও সামাজিক ভারসাম্য বজায় থাকে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কৃষি ভৌগোলিক কৃষককে নতুন কৃষি পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত করতে পারবে বা কিভাবে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে তার পরামর্শ দিতে পারবে।

কৃষি উৎপাদন বা ভূমির ব্যবহার নানা প্রাকৃতিক, আর্থ-সামাজিক, জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তবে এদের প্রত্যেকেই উৎপাদনের উপর সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করে না। যেমন বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, মৃত্তিকার উর্বরাশক্তি উৎপাদনের উপর প্রভাব ফেলে। আবার জনসংখ্যার ঘনত্ব কৃষি উৎপাদনের তাগিদ জুগিয়ে দেয়, জলসেচ, সার প্রয়োগের মাত্রা, অধিক ফলনশীল বীজ, ভূমিসংস্কার ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদন প্রভাবিত করে। বস্তুতপক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শস্য উৎপাদনের যে বিভিন্নতা তা এই সকল কারণের সম্মিলিত ফলাফল। এদের এক একটির সঙ্গে উৎপাদনের কি সম্পর্ক তা নির্ধারণ বা নিরূপণ করা কৃষি ভূগোলের আর একটি কাজ। তাই কৃষি গবেষণার আরও তিনটি ক্ষেত্র রয়েছে। যথা—(i) প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলির সঙ্গে কৃষি উৎপাদনের সম্পর্ক নির্দেশ করা, (ii) জনসংখ্যার বিস্তারের সঙ্গে কৃষিযোগ্য জমির সম্পর্ক নির্দেশ ও (iii) আর্থ-সামাজিক পরিবেশের উপাদানগুলির সঙ্গে ভূমি ব্যবহার ও কৃষি উৎপাদনের সম্পর্ক নির্দেশ করা।

পশু ও পক্ষীজাত দ্রব্য উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয় ঃ আগেই বলা হয়েছে ব্যাপক অর্থে পশু ও পক্ষীজাত দ্রব্য উৎপাদন কৃষির আওতায় পড়ে। সুতরাং ওই সকল দ্রব্য উৎপাদন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কেন কৃষি ভূগোল তার আলোচনা করে ও এদের উৎপাদন কি কি কারণের উপর নির্ভরশীল তা কৃষি ভূগোলের একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠের বিষয়। যেমন মাংস, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, ডিম ইত্যাদির মূল্য অন্যান্য কৃষিপণ্যের

তুলনায় বেশ বেশী। আবার এগুলি পচনশীলও বটে। তাই এদের উৎপাদন প্রধানত শহর ও শহরতলীর সন্নিকটেই সীমাবধ্ধ। আরও লক্ষ্যণীয় যে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যান ব্যবহারের ফলে এগুলি এখন শহর থেকে দূরেও উৎপাদিত হচ্ছে। ফলে এই সম্বন্ধে গবেষণার ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে কৃষি ভূগোলের পরিধি সুদূর প্রসারিত। আর এই প্রসার সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রসারিত হচ্ছে। একই সঙ্গে কৃষি ভূগোল পাঠের ক্ষেত্রও প্রসারিত হচ্ছে। কৃষি ভৌগোলিকগণও সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসছেন।

1.5 কৃষি ভূগোলের ইতিবৃত্ত (Historical development of Agricultural Geography)

মানব সভ্যতার আদি যুগ থেকেই কৃষি সাংস্কৃতিক ভূ-বৃপের উপর (Cultural landscape) আধিপত্য বিস্তার করে আসছে। ওই ধারা আজও সক্রিয়। আজও মানুষের মোট শ্রমদিবসের সিংহভাগ কৃষিকার্যেই নিয়োজিত। তবে একটি বিশেষ ক্ষেত্র হিসাবে কৃষি ভূগোলের পাঠ খুবই ইদানীংকালের ঘটনা বলা যেতে পারে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে। এর পূর্বে কৃষির উন্নতি ছিল অত্যন্ত ধীর। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত বেড়ে যায়। ফলে দেখা দেয় খাদ্যের অনটন। এই অনটনই মানুষকে কৃষি ব্যবস্থা পাঠের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়েছে। ওই সময় থেকেই আরম্ভ হয়েছে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কৃষি ব্যবস্থার বিভিন্নতার কারণ অনুসন্ধান, উৎপাদন ক্ষমতার বিভিন্নতার হিসাব, এক কৃষি অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ, ভূমি ব্যবহারের প্রতিরূপ ইত্যাদি। তার কারণ তখন মানুষের খাদ্যের শতকরা 94 ভাগই আসত জমি থেকে।

ইউরোপে কৃষি ভূগোল ঃ লেসলি সাইমন্স-এর (1967) বিবরণ থেকে জানা যায় গ্রিক ও রোমান যুগে কৃষি পণ্য তাদের নিজ নিজ সাম্রাজ্যের মধ্যে আদান প্রদান হত। এর সঙ্গে কৃষি সম্বন্ধে লব্ধ জ্ঞানও এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিনিময় হত। এমনকি ওই জ্ঞান ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের বাইরে বা অন্য সাম্রাজ্যের জ্ঞান নিজ সাম্রাজ্যের জ্ঞান নিজ সাম্রাজ্যের মধ্যে লেনদেন হত। স্ট্র্যাবো, কাইজার, প্লিনি প্রভৃতি মনীষীদের লেখা থেকে এসব তথ্য জানা যায়। তবে এঁদের লেখারমধ্যে কোন ধারাবাহিকতা নেই বা সম্পূর্ণও নয়। প্রাচীন যুগে এর বেশী বিশেষ কিছু জানা যায় না।

মধ্যযুগ কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। এই যুগে কৃষি ভূগোলের চর্চা বিশেষ কিছুই হয়নি বা হলেও জানা যায় না। প্রকৃত অর্থে কৃষি ভূগোল সম্বন্ধে চর্চা ও গবেষণা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই আরম্ভ হয়। ওই সময়ে বর্ণনামূলক কৃষি ভূগোল ছেড়ে কৃষির উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা হতে আরম্ভ করে। এই চিন্তাধারাকে বলে **পরিবেশ নির্ধারক মতবাদ** (Environmental determinism approach)। এদের মধ্যে ইংল্যান্ডের আর্থার ইয়াং (Arthur Young 1770), জার্মানীর জে. এন. সুয়েঞ্জ (J. N. Schwenz-1816) উল্লেখযোগ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কৃষি ভূগোল সম্বন্ধে চিন্তাধারার কিছু পরিবর্তন ঘটে। এই যুগে এই ধারণারই উদয় হয় যে-কোন স্থানের কৃষি একটি আঞ্চলিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এই মতবাদকে **আঞ্চলিক মতবাদ** (Regional approach) বলে অভিহিত করা হয় আর সেই মতো কৃষি বিবরণ তৈরী করা হয়। কৃষি ভূগোলের মডেল এই সময়ই প্রবর্তিত হয়। আলেকজাণ্ডার ভন হামবোল্ট (Alexander Von Humboldt,1807) , ভন থুনেন

(Von Thunen-1826) এই মতবাদের পথিকৃৎ। এই ভন থুনেনই 'অর্থনৈতিক অবস্থান' (Location of economic activity) মতবাদের জনক। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে (1883 খ্রীঃ) এঞ্জেলব্রেচ (Engelbrecht) উত্তর আমেরিকাকে কতকগুলি শস্য অঞ্চলে বিভক্ত করেন।

বিংশ শতাব্দীতে কৃষি ভূগোল সম্বন্ধে পাঠ ও গবেষণা আরও গভীরে প্রবেশ করে ও নিত্য নতুন তথ্য প্রকাশিত হতে থাকে। 1911 খ্রীষ্টাব্দে ক্রাইমোস্কি (Krymowski–1911) কৃষি ভূগোলের বৈজ্ঞানিক অবস্থান সম্বন্ধে গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। 1910 থেকে 1920 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি ভূগোল সম্বন্ধে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পঠন-পাঠন ও গবেষণা আরম্ভ হয়। সরাসরি ক্ষেত্র (Field) থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে মানচিত্র তৈরী করা হয় ও জার্নালে ছাপা হয়। তবে মানচিত্রগুলি নির্ভুলভাবে উপস্থাপিত নয় বা সেগুলিতে সঠিক গাণিতিক কৌশল অবলম্বন করা হয়নি। এই সমস্ত পঠন-পাঠন কৃষি অঞ্চলের ভূমির ঢাল, জলনির্গম, ভৌম জলস্তর, জলবায়ু, স্থানীয় উদ্ভিদ, জীবজন্তু প্রভৃতি বিষয় মনে রেখে তৈরী।

1919 খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে কয়েকজন বিখ্যাত কৃষি ভৌগোলিক কৃষি ভূগোল সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। এদের মধ্যে বেকার (1926-33) উত্তর আমেরিকার কৃষি অঞ্চল সম্বন্ধে বই প্রকাশ করেন। জোনাসন (Jonasson) ইউরোপের কৃষি অঞ্চল সম্বন্ধে বই প্রকাশ করেন (1925-26)। জোন্স(Jones) প্রকাশ করেন (1928-30) দক্ষিণ আমেরিকার কৃষি অঞ্চল। ভ্যান ভলকেনবার্গ 1931-36 খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন এশিয়ার কৃষি অঞ্চল সম্বন্ধে বই। টেলার (Tailor) 1930 খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন অষ্ট্রেলিয়ার কৃষি অঞ্চল সংক্রান্ত বই। 1940 খ্রীষ্টাব্দে শাঞ্জ (Shantz) প্রকাশ করেন আফ্রিকা মহাদেশের কৃষি অঞ্চল সম্বন্ধে বই। এই সমস্ত বই প্রকাশিত হওয়ায় বিভিন্ন মহাদেশে কৃষি অঞ্চলগুলির একটি সার্বিক ধারণা পাওয়া যায়। এই সময়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল কৃষিভূমি ব্যবহারের শ্রেণী বিভাগ। এটি জোন্স ও হুইটলসের (Jones and Whittlesey) বহু দিনের প্রচেষ্টায় 1932 খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পরিশেষে 1936 খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সারা পৃথিবীর কৃষি অঞ্চল সমন্বিত বইটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করেন হুইটলসে।

কৃষি ভূগোলে বিশ্বযুদ্ধেরপ্রভাব ঃ প্রথম (1014-18) ও দ্বিতীয় (1939-45) বিশ্বযুদ্ধ কৃষি ভূগোলের উপর একটি সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে দেখা দেয় খাদ্য সমস্যা। এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে ভূমির সদব্যবহার সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ে। আর সেই অনুসারে ভূমি ব্যবহার সম্বন্ধে ভূমির জরিপ আরম্ভ হয়। জমির সুষ্ঠু ও যথাযথ ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হয়। ইংল্যাণ্ডের ডাডলি স্ট্যাম্প বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে সমগ্র গ্রেট ব্রিটেনের ভূমি ব্যবহার সমীক্ষা করেন যা একটি যুগান্তকারী ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে মানুষ আরও সচেতন হয়। খাদ্য উৎপাদনে প্রাকৃতিক উপাদানগুলির পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উপাদানগুলির সমীক্ষা হতে থাকে।

যুদ্ধোত্তর পর্বে কৃষি ভূগোল ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কৃষি ভূগোলে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা যায়নি। ওই সময় কৃষি অঞ্চলের ভৌগোলিক বর্ণনাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে পঞ্চাশ দশকের পরে পরে ক্ষুদ্রাঞ্চল (Micro level) ভিত্তিক গবেষণার প্রয়োজন অনুভূত হয়। কারণ এর আগে যে সমস্ত পঠন-পাঠন হয়েছে তা মূলত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে অর্থাৎ সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাদের বিশেষ কোন গাণিতিক ভিত্তি ছিল না। তাই ক্ষুদ্রাঞ্চল ও মাঝারি অঞ্চলভিত্তিক কৃষি ভূগোল পাঠের প্রয়োজনীয়তা অধিক অনুভূত হয়। এর ফলে কৃষি অঞ্চলের সীমারেখা আরও সুষ্ঠুভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। গবেষণার ফলে আরও লক্ষ্য করা গেছে যে প্রতিষ্ঠানিক, infrastructural সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের

সঙ্গে সঙ্গে ওই সীমারেখার পরিবর্তন হয়।

এই সময়েই জন. সি. ওয়েভার (1945) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য পশ্চিম অঞ্চলকে কয়েকটি শস্য সংযোগ অঞ্চলে (Crop combinationregion) বিভক্ত করেন। কৃষি ভূগোলে এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এ কাজে তিনি তথ্য ও গাণিতিক কৌশল (Statistical technique) উভয়ই প্রয়োগ করেন। এটি 'Least deviation model নামে পরিচিত। কৃষি ভূগোলে মডেল যে ব্যবহার করা যায় তা কৃষি ভৌগোলিকদের মধ্যে পরিস্ফুট হয়। ইংল্যান্ডের ভৌগোলিক জে. টি. কোপক 1964 ও ভারতের যশবীর সিং (1976) দেখান যে ওয়েভারের পদ্ধতির সামান্য পরিবর্তন করে পদ্ধতির ত্রুটিগুলি দূর করা যায়।

পূর্বে বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে কৃষি সম্বন্ধে উপযুক্ত তথ্যের অভাব ছিল। তাই কোন কিছু সিদ্ধান্তে আসতে হলে অভিজ্ঞতার উপরে অনেকখানি নির্ভর করতে হত। কিন্তু বর্তমানে সেই অসুবিধা আর বিশেষ নেই। প্রায় সমস্ত দেশই তথ্য সংগ্রহে মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছে। এইসব তথ্যসংগ্রহ করে কোপক 1964 খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস-এর কৃষি আটলাস এবং 1971'এ এন এগ্রিকালচারাল জিওগ্রাফি অব গ্রেট ব্রিটেন প্রকাশ করেছেন 1969 খ্রীষ্টাব্দে 'ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অব এগ্রিকালচারাল ইকনমিস্টস' ওয়ার্ল্ড আটলাস অব এগ্রিকালচার নামে পুস্তক প্রকাশ করেছেন। এটিও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর দ্বারা সারা পৃথিবীর ভূমি ব্যবহার ও কৃষি ব্যবস্থা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। এটি বহু কৃষি ভৌগোলিকের বহু দিনের গবেষণার ফল। কৃষির বিভিন্ন সমস্যাও এতে তুলে ধরা হয়েছে।

1.6 ভারতে কৃষি ভূগোলের পঠন-পাঠন ও প্রসার

ভারত একটি উন্নতশীল দেশ। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে কৃষি, শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্যে এ দেশ দ্রুত উন্নতি লাভ করেছে। কৃষি বা অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণও করা হচ্ছে। এটি একটি বিপুল তথ্য ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে এবং এর নির্ভরযোগ্যতা পশ্চিমী দেশগুলির তুলনায় কোন অংশে কম নয়। এই তথ্য ভাণ্ডারের উপর নির্ভর করে নানা বিষয়ে গবেষণা হচ্ছে ও কৃষি পরিকল্পনায় কাজে লাগছে। আঞ্চলিক ভিত্তিতে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য রয়েছে তাও অনেকখানি দূরীভূত করা সম্ভব হয়েছে।

অতীতে ভারত নানা সময়েই দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছে। তা খাদ্য উৎপাদনের ঘাটতির জন্যেই হোক বা উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবেই হোক। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশ দুর্ভিক্ষের কবল থেকে অনেকটাই মুক্ত। এতে কৃষি ভৌগোলিকদের দান অনেক।

গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের প্রথম দিকে ভারত খাদ্যে স্বয়ংসম্ভরতা লাভ করে। বর্তমানে ভারতে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে খাদ্য উৎপাদন সেই হারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে ভারতের জনগণের আয় আগের তুলনায় বেড়ে গেছে। ফলে খাদ্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি ভৌগোলিকদের এই কথা মনে রাখতে হবে ও গবেষণার দ্বারা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে ভারতে যে বিপুল জনসংখ্যা যার অধিকাংশই কৃষিজীবী সেই তুলনায় কৃষির উপর তেমন নজর দেওয়া হয় নি বা প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাছাড়া কৃষি সম্বন্ধে শিক্ষা দান ও তথ্য ব্যবহার করে পঠন-পাঠন খুব কমই হয়েছে। যেটুকু কাজ হয়েছে তা কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যশবীর সিং ও তাঁর কিছু সহকর্মী হরিয়ানা রাজ্যের কৃষি নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁরা শস্য উৎপাদনে প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক

ও সাংস্কৃতিক কারণগুলির প্রভাব ব্যাখ্যা করেছেন যা খুবই যুগপোযোগী ও প্রশংসনীয়। 1956 খ্রীষ্টাব্দে ও. পি. ভরদ্বাজ স্থান ভেদে কৃষির সংগঠন (Spatial organization of agriculture)-এর উপর কাজ করেন যা ভারতে প্রথম। একই ধরনের কাজ করেছেন মহম্মদ সফিও (1956)। তাছাড়া রয়েছেন বি. এল শর্মা যিনি রাজস্থানের কৃষির উপর কাজ করেছেন। স্থানীয় ভাবে কৃষি-ভূমি ব্যবহার ও কৃষি অঞ্চলের উপর উল্লেখযোগ্য পঠন-পাঠন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বর্তমানে উন্মুক্ত তথ্য ভাণ্ডার ও নতুন নতুন সফটওয়ার ব্যবহার করে গবেষণা করার সুযোগ ভারতেও বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সাহায্যে কৃষির উপর মৃত্তিকার প্রভাব, কৃষি-জলবায়ু অঞ্চল, উদ্ভিদ-বাস্তুতন্ত্র, গ্রাম্য-সমাজ বিজ্ঞান, কৃষি অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে কাজ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আশা করা যায় এই প্রচেষ্টার উত্তরোত্তর উন্নতি হবে।

একক 2 ❒ পেরি আরবান বলয়ের ভূমি ব্যবহারের ও সিনক্লেয়ারের মডেল (Sinclair's model of Peri urban land use)

গঠন

2.1 সিনক্লেয়ারের মডেল ও পেরি আরবান বলয় (Sinclair's model of peri urban land use)
2.2 কৃষি উন্নতির কারণসমূহ (Factors controlling agricultural land use)
2.3 ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার নীতিসমূহ (Principles of land use planning)

2.1 পেরি আরবান বলয় ও সিনক্লেয়ার মডেল (Sinclair's model of peri urban land use)

একটি শহরকে আমরা এক জনবহুল হিসাবে জানি। যেখানে অধিকাংশ মানুষ অ-কৃষিকর্মে নিয়োজিত। যেখানে অধিকাংশ ভূমি, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, কলকারখানা, খেলাধূলার মাঠ, দোকানপাট প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়। যেখানে স্কুল-কলেজ, সিনেমা, ডাকঘর, ব্যাঙ্ক, অফিস-আদালত, বিদ্যুৎ, পানীয় জল সরবরাহের পরিষেবা বেশী। সেখানকার পরিবেশ কর্মব্যস্ততার পরিবেশ। একে আমরা আরবান বা শহর (Urban) অঞ্চল বলি। অপরদিকে একটি গ্রামকে আমরা জনবিরল স্থান হিসাবে জানি যেগুলি একটি শহরকে ঘিরে গড়ে ওঠে। এখানকার অধিকাংশ মানুষ কৃষি সংক্রান্ত খামার কর্মে নিয়োজিত। এখানকার অধিকাংশ ভূমি চাষ আবাদের কাজে ব্যবহৃত হয়। পরিষেবামূলক কর্মকাণ্ড এখানে কম। পাকা রাস্তা, স্কুল-কলেজ, ব্যাঙ্ক, সিনেমা হল, কলকারখানা, চিকিৎসালয়, ডাকঘর কদাচিত চোখে পড়ে। পরিবেশ শান্ত ও নির্মল। একে আমরা বলি গ্রামীণ অঞ্চল (Rural area)।

কিন্তু এই শহর ও গ্রামের মধ্যে একটি অঞ্চল আছে যেখানে শহুরে ও গ্রামীণ উভয় পরিবেশই বিদ্যমান। এখানকার মানুষ কৃষি ও অ-কৃষি উভয় পেশাতে নিযুক্ত। ভূমি কৃষি ও অ-কৃষি উভয় কাজেই ব্যবহৃত হয়। পরিষেবামূলক কাজ আছে, কিন্তু পর্যাপ্ত নয়। কর্মব্যস্ততা থাকলেও বেশ কম। পরিবেশ কর্মব্যস্ত শহর ও শান্ত গ্রামের মাঝামাঝি। এই অঞ্চলকে আমরা বলি পেরি আরবান (Peri urban) অঞ্চল। শহরের কেন্দ্র থেকে এদিকেই শহর বৃদ্ধি পায়। আর এখান থেকেই গ্রাম ক্রমশ পিছু হটে। সেই বিচারে পেরি আরবান অঞ্চল একটি গতিময় (Dynamic) অঞ্চল। আজ যেখানে আধা শহর কাল সেখানেই আধা গ্রাম আধা শহর। অর্থাৎ একটি **শহর প্রান্ত** (Urban fringe)।

পেরি আরবান অঞ্চলে ভূমি ব্যবহারের প্রতিরূপ : মানুষের প্রয়োজনে ভূমি নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। কোথাও ভূমিকে বসতির কাজে ব্যবহার করা হয়, কোথাও কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয়, কোথাও বা কলকারখানার কাজে আবার কোথাও বা ব্যবসাবাণিজ্যের কাজে। শহরাঞ্চলে ভূমির অধিকাংশই অ-কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয়। গ্রামে ব্যবহৃত হয় কৃষি কাজে। তবে বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে একটি ব্যবহারের সঙ্গে আরেকটি ব্যবহারের একটি সম্পর্ক আছে। সেই হিসাবে পারস্পরিক ভূমি ব্যবহারের একটি প্রতিরূপ (Pattern) গড়ে ওঠে।

শহর ও তার আশপাশ অঞ্চলের ভূমি ব্যবহার একটি অত্যন্ত চমকপ্রদ পঠন-পাঠনের ক্ষেত্র। সুদূর গ্রামাঞ্চলের ভূমি ব্যবহারের ধরনের থেকে এই অঞ্চলের অর্থাৎ শহর ও তার আশপাশ অঞ্চলের বা প্রান্ত অঞ্চলের ভূমি ব্যবহার অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির। কারণ এ অঞ্চলে একদিকে মানুষের ভূমি ব্যবহারের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধি

ও বাস্তুতন্ত্র রক্ষার তাগিদ প্রকট। তাছাড়া ব্যক্তিগত মালিকানা, সমষ্টিগত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানার সঙ্গে সংঘাত গড়ে ওঠে। এর সঙ্গে থাকে ভূমি ব্যবহারের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। তাই এ পর্যন্ত ভূমি ব্যবহারের যে সমস্ত উচ্চমানের (Calssical) তত্ত্ব (Theories) জন্ম দিয়েছে তা শহর ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভূমি ব্যবহার সম্বন্ধীয়। তাছাড়া ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত সরকারী নিয়ন্ত্রণ এই অঞ্চলেই সব থেকে বেশী। এর থেকেই জন্ম হয় ভূমি ব্যবহারের নীতিসমূহ। এই ব্যাপারে তিনটি বিষয় লক্ষ্য করতে হবে। যথা— (১) জমির মূল্যের ধরন ও তার সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্ব, (২) এই অঞ্চলের ভূমি ব্যবহারের গতিশীলতা (Dynamism) এবং (৩) মানুষের অনুভূতি বা মানুষ কিভাবে সাড়া (Responses) দিচ্ছে তার পর্যালোচনা।

কোন স্থানের জমির মূল দুটি নিয়ন্ত্রকের দ্বারা সাধারণত নির্ধারিত হয় যথা (ক) জমির উর্বরাশক্তি ও (খ) জমির অবস্থান। প্রতি একক উর্বর জমিতে অধিক ফসল ফলে। ফলে প্রতি একর জমিতে উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা লাভ বেশী। তাই জমির মূল্য বেশী বিশেষ করে যে সকল অঞ্চলে জমি কৃষিকার্য বা বনভূমির জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ব্যবসার কাজে লাগাতে বা অফিসের কাজে অথবা বাড়ি তৈরীর জন্য জমির অবস্থানই বড় কথা। সে স্থানে সহজেই যাওয়া যায় বা সুগম (Accessible) সেই স্থানের জমির মূল্য হবে সব থেকে বেশী। তাই শহরের কেন্দ্রস্থলে জমির মূল্য বেশী। আর সেখান থেকে যতই দূরে যাওয়া যায় জমির দাম হয় কম।

ভূমি ব্যবহারের ভন থুনেনের মতবাদ ঃ 1826 খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর জে. এইচ. ভন থুনেন ভূমির মূল্য ও ভূমি ব্যবহারের একটি মতবাদের অবতারণা করেন। এই মতবাদে তিনি দেখাবার চেষ্টা করেন যে-কোন একটি একই পরিবেশযুক্ত অঞ্চলে যদি একটিই শহর থাকে তবে তাকে কেন্দ্র করে তার চারপাশ কি ধরনের ভূমি ব্যবহার হলে তা সর্বাপেক্ষা লাভজনক হবে। তাঁর মতে শহর থেকে ক্রমশ দূরে কি প্রকৃতির ফসল চাষ করলে তা লাভজনক হবে তা নির্ভর করে পরিবহন ব্যয়ের উপর। কোন একটি শস্য চাষে লাভ অথবা খাজনা দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পাবে কারণ শহর থেকে দূরত্ব যত বাড়ে পরিবহন ব্যয়ও বাড়ে। তাঁর মতে কোন স্থানে সর্বাপেক্ষা লাভজনক ভূমি ব্যবহার কেমন হবে তা নক্সা এঁকে নির্ধারণ করা যায়।

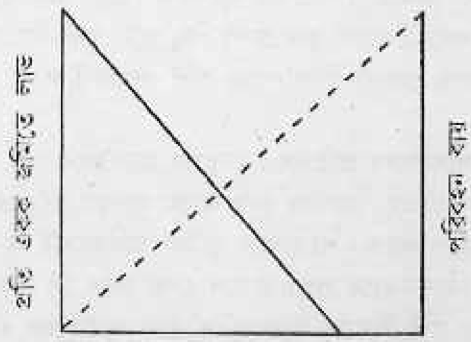

(ক)

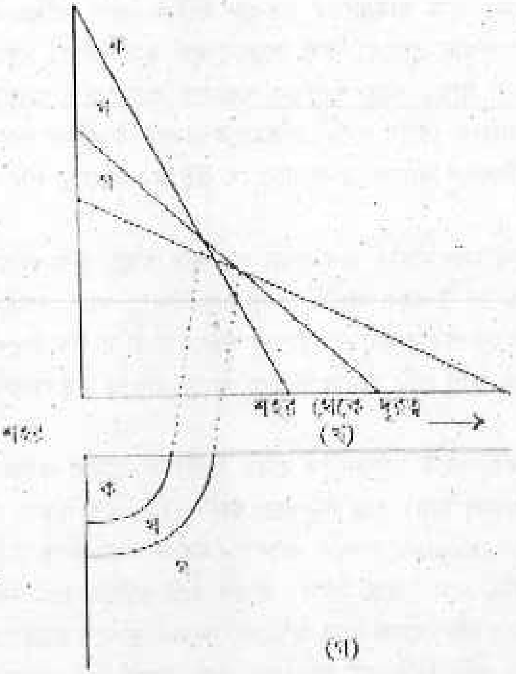

(চিত্র 1)

ভন থুনেনের ব্যাখ্যা ঃ

(ক) এক ধরনের ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতি একর জমিতে লাভ কেমন হবে তার নক্সা।

(খ) তিন ধরনের ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতি একর জমিতে লাভ কেমন হবে তার নক্সা।

(গ) শহরের এক চতুর্থাংশ স্থানে গ্রামীণ ভূমি ব্যবহার গড়ে ওঠার ধরন।

যদি ভূমি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত শুধু অর্থনীতির দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং অন্য সকল শর্ত অটুট থাকে তবে শহরের চতুর্দিকে ভূমি ব্যবহারের প্রতিবৃপটি হবে এক কেন্দ্র বিশিষ্ট বলয়াকৃতি। সব থেকে ভিতরের বলয়টি যেটি শহরের উপকণ্ঠেই অবস্থিত সেখানে ফলের বাগান ও দুগ্ধ প্রকল্পগুলি অবস্থিত থাকবে। এর পরপর বলয়গুলি ব্যবহৃত হবে কাঠ উৎপাদনে, নিবিড় পদ্ধতিতে কৃষিকর্মে, অপেক্ষাকৃত কম নিবিড় পদ্ধতিতে কৃষিকর্মে, আরও কম নিবিড় পদ্ধতিতে কৃষিকর্মে এবং পরিশেষে চারণভূমির কাজে। দ্বিতীয় বলয়ে কাঠ উৎপাদন আশ্চর্য মনে হলেও সেই যুগে প্রচুর কাঠ জ্বালানী ও আসবাবপত্র তৈরীতে ব্যবহৃত হত। অথচ কাঠ বিপুল আয়তন বিশিষ্ট ও ভারী। তা শহর থেকে বহু দূরে উৎপাদিত হলে পরিবহনের কারণে তার মূল্য হবে অনেক বেশী। তাই শহরের অনতিদূরে তার উৎপাদন সীমিত থাকবে।

ভন থুনেন শর্তসাপেক্ষে আদর্শ ভূমি ব্যবহারের রূপরেখাটি তুলে ধরছেন তা বাস্তবে পুরোপুরি দেখা না গেলেও শহর ও শহর থেকে ক্রমশ দূরে বিভিন্ন বলয়ে যে এরূপ ভূমি ব্যবহার হয়ে থাকে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। গ্রিফিন (1973), জোনাসন (1925) প্রভৃতি ভৌগোলিকদের গবেষণায় এই ধরনের বলয়রূপী ভূমি ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে বিশেষ করে পশ্চিমী দেশে।

ভন থুনেনের কাজের উপর ভিত্তি করে আরও অনেকে ভূমি ব্যবহারের প্রতিরূপের উপর গবেষণা করেছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ শহরের মধ্যেও বলয়রূপী ভূমি ব্যবহারের রূপরেখা লক্ষ্য করেছেন। এ ব্যাপারে আলনসোর (1960, 1964) নাম করা যেতে পারে। এদের মতে শহরের কেন্দ্রস্থল, যে স্থলে যাতায়াতের সুবিধা সব থেকে বেশী বা সুগম সেই অঞ্চলেই খুচরা ব্যবসা, শিল্প, প্রভৃতি গড়ে ওঠে। যে সকল কৃষক শহরমুখী কৃষিপণ্য উৎপাদন করে যেমন সব্জি, ফুল ইত্যাদি তারাও শহরের কাছাকাছি তাদের খেত-খামার গড়ে তুলতে চায়। আলনসোর-এর মতে একজন ব্যবসায়ী শহরের কেন্দ্রস্থলে জমি পেতে বেশী মূল্য দিতেও রাজি থাকে। কারণ এখানে পণ্য পরিবহণ শুধু সুলভই নয় তা কম খরচযুক্ত।

পেরি আরবান অঞ্চলের ভূমি ব্যবহার ঃ ভন থুনেনের ভূমি ব্যবহারের মতবাদ সঠিক হলে বিভিন্ন ভূমি ব্যবহার শহর থেকে ক্রমশ দূরে দূরে বলয়ের আকারে অবস্থান করবে। কিন্তু বাস্তবে খুব কম শহরেই বলয়ের আকারে চারপাশে ভূমি ব্যবহার সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। তবে পুরাতন শহরের আগেকার বলয়রূপী ভূমিব্যবহারের সবটা না হলেও কিছু কিছু অবশিষ্টাংশ আজও চোখে পড়ে। বর্তমানে একটি আধুনিক শহরের চারপাশে ভূমি ব্যবহারের রূপরেখা বা ধরন (Pattern) বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ওই সব ব্যবহার পরিবহন ব্যয় ছাড়াও অন্য নিয়ন্ত্রকের দ্বারা প্রভাবিত।

পশ্চিমী দেশের শহরগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সেখানকার জনসংখ্যা খুব দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাওয়া। আর শহর বেড়ে ওঠার প্রায় সমস্ত চাপ এসে পড়ছে শহরের উপকণ্ঠ অর্থাৎ পেরি আরবান অঞ্চলে। লক্ষ্যনীয় যে কৃষি জমিতে কৃষিকাজ বন্ধ হওয়ার আগেই বর্ধিত শহরের প্রভাব অনুভূত হচ্ছে। অর্থাৎ বাড়ী বা কলকারখানা স্থাপনের আগেই জমি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। বিক্রির পরে হয় কৃষি জমি অনাবাদী হয়ে পড়ে থাকছে নতুবা জমির বিক্রেতা বা ক্রেতা অল্প সময়ের জন্য চাষ করছে।

শহর ও গ্রামের জমির মূল্যমান ঃ কোন জমি চাষের কাজে ব্যবহারের চেয়ে বাড়ী বানানোর কাজে বা অন্য কোন শহুরে কাজে ব্যবহার করলে অধিক মূল্য পাওয়া যায়। গড় অনুপাত হল 1:10। এই হিসাব যে-কোন শহুরে-ব্যবহার কৃষি ব্যবহারকে সহজেই স্থানচ্যুত (Displace) করে দেবে। এমনকি শহর গড়ে উঠবে এমন সম্ভাবনা অনুমান বা ধারণা করা মাত্রই কৃষি জমির দাম বেড়ে যাবে। কারণ লগ্নীকারীরা জমি কিনে রাখার চেষ্টা করবে যাতে করে পরে লাভ পাওয়া যায়। তাতে যদি কয়েক বছর জমিকে ফেলেও রাখতে হয়তাতেও তারা পিছপা হবে না। আবার শহর বেড়ে ওঠার জন্য জমি বিক্রি বা অধিগ্রহণ হয়ে যাবে এমন সম্ভাবনা যদি কৃষক অনুমান করতে পারে তবে জমির উর্বরাশক্তি বজায় রাখতে বা উন্নতি করতে চাষীরা উৎসাহ বোধ করবে না। ফলে জমি ব্যবহারের অনিশ্চয়তা দেখা দেবে। জমিকে ফল চাষের কাজে ব্যবহার করতে চাইবে না কারণ নিয়ম মতো ফলের গাছ রোপনের কয়েকবছর পরে ফল পাওয়া যায়। ফলে শহর গড়ে ওঠার পূর্বেই জমির সদ্ব্যবহার বিঘ্নিত হবে। শহরের উপকণ্ঠ বরাবর জমিতে নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ ব্যহত হবে বা বন্ধই হয়ে যাবে। যত্নের অভাবে জমি আগাছায় ভরে যাবে। উপকণ্ঠ অঞ্চল থেকে আরও দূরে গ্রামীণ অঞ্চলে যে ধরনের চাষ হয় এখানে তা আর সম্ভব হবে না।

সিনক্লেয়ারের ভূমি ব্যবহার মডেল ঃ সিনক্লেয়ার (1967) পেরি আরবান অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যগুলিমনে রেখে বলয়াকৃতি গ্রামীণ ভূমি ব্যবহারের একটি পরিবর্তিত রূপরেখা উপস্থাপিত করেন।

ভন থুনেনের মডেলের পরিবর্তে সিনক্লেয়ার যে মডেল উপস্থাপিত করেন সেটিও ভন থুনেনের মত বলয়যুক্ত। সিনক্লেয়ারের মতে, শহরের কাছাকাছি উপর্যুপরি তিনটি বলয় অর্থাৎ ক, খ এবং গ বলয়ের ভূমি ব্যবহার শহরের নেতিবাচক প্রভাবযুক্ত। যেটি শহর থেকে বেশ দূরে সেখানে এবং চতুর্থ বলয়টিতে ডেয়ারী বা সমগোত্রীয় বাজার ঘেঁষা শস্যাসমূহের চাষ হয়। এরও পরের বলয়ে দানা শস্য বা গৃহপালিত পশু ফার্মিং চলে।

সিনক্লেয়ারের মডেল অনুযায়ী শহরের ঠিক উপকণ্ঠ অঞ্চলে যেখানে বর্ধিত শহরের চাপ বেশী সেখানে কৃষিজমর দাম কম যদিও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য জমির দাম বেশী। নিচের চিত্রে তা দেখানো হলো (চিত্র ঃ 2)।

লক্ষ্যণীয় যে সিনক্লেয়ারের মডেল ভন থুনেনের মত অতো অনমনীয় (Regorous) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় যদিও এরও একটি যুক্তিবাদী ভিত্তি আছে। মনে রাখতে হবে যে বলয়রূপী ভূমি ব্যবহার গড়ে উঠতে একই ধরনের ভৌত পরিবেশ দরকার যেখানে নগরায়ণও সমানভাবে গড়ে উঠবে। তাবে বাস্তবে তার কোনটাই সম্ভব হয় না। কিন্তু সিনক্লেয়ার যে উপাদানের (Element) কথা বলেছেন যে বহু শহরের চারিদিকে লক্ষ্য করা যায়।

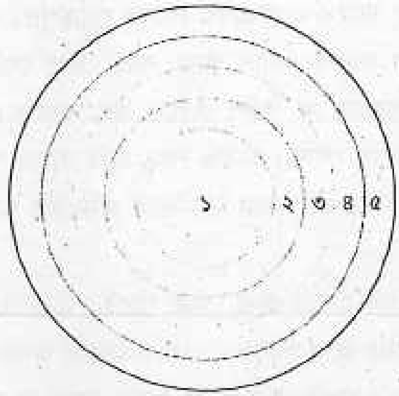

(১) শহরভিত্তিক চাষ
(২) খালি (vacant) ও চারণভূমি (অস্থায়ী)
(৩) শস্য ও চারণভূমি (অস্থায়ী)
(৪) ডেয়ারী ও শস্য
(৫) বিশেষ ধরনের পশুখাদ্য ও গৃহপালিত পশু

ক

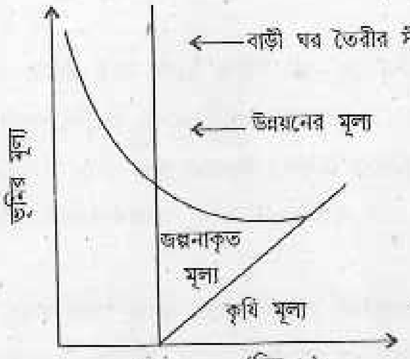

খ (চিত্র ২)

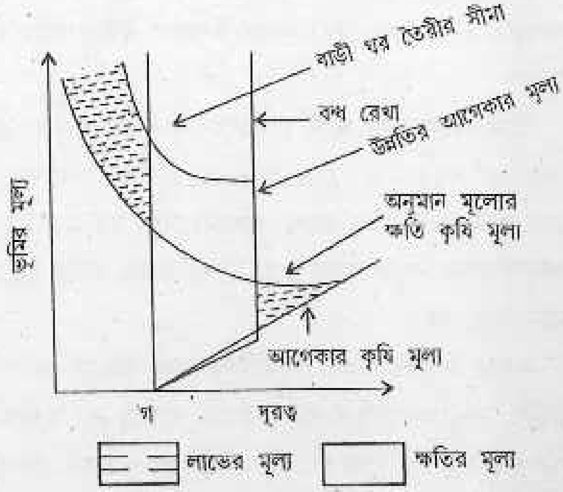

সিনক্রেয়ার মডেল ও শহরের চারদিকে ভূমির মূল্য ঃ-
(ক) সিনক্রেয়ার মডেল
(খ) ভূমির মূল্য ঃ আরবান ও কৃষি
(গ) ভূমির মূল্য ঃ আরবান ও কৃষি বর্ধিত শহ রের নিয়ন্ত্রণসমূহ

পেরি আরবান অঞ্চলে চাষের জমির অবস্থা ঃ শহরের উপকণ্ঠে অর্থাৎ পেরি আরবান অঞ্চলে ভগ্ন দশাপ্রাপ্ত (Derelict) কৃষি জমি, লম্বা ঘাসযুক্ত জমি, ভগ্ন দশাপ্রাপ্ত বেড়া হামেশাই চোখে পড়ে। নিঃসন্দেহে এগুলি প্রমোটারদের কিনে রাখা জমি। যারা পরবর্তীকালে অধিক লাভের আশায় জমি ফেলে রেখে দিয়েছে। তারা ও সকল জমি থেকে একটা বাৎসরিক আয়ের কথা চিন্তা করে না। আরেকটি লক্ষনীয় বিষয় এই যে এই অঞ্চলে মাঝারি মানের কিছু চারণভূমি দেখা যায় যেখানে গৃহপালিত পশু নির্দিষ্ট ঋতুতে চরানো হয়। যে সমস্ত জমিতে নির্মাণকার্য শীঘ্রই আরম্ভ হবে তবে এখনই নয় সে সমস্ত জমি ঋতুকালীন ভিত্তিতে জমির সাবেক মালিক বা যে ক্রয় করেছে সেই মালিক চাষের কাজে ঝুঁকি নিয়ে মূলধন বিনিয়োগ করতে চায় না। কিছু কিছু সরকারী সংস্থা কয়েক বছর ধরে জমি আটকে রাখে যাতে করে দরকারের সময় তারা প্রয়োজন মতো জায়গা পায়।

আরও কতকগুলি কারণ রয়েছে যার ফলে জমিগুলিকে মনোমতো কৃষির কাজে ব্যবহার করা যায় না। যেমন—ফসল চুরির ভয়,গবাদি পশুরদ্বারা ফসল নষ্টের ভয়, অযথা ময়লাফেলার ফলে জমি কৃষির কাজে ব্যবহারের অনোপযোগী হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। তবে শহরের প্রান্তদেশ যদি নদী, রেলপথ বা দুর্ভেদ্য বনভূমির দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে তবে এই সকল উপদ্রব বিশেষ থাকে না।

পেরি আরবান অঞ্চলে জমি যারা ব্যবহার করছে তাদের মনোভাবও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের শখের জন্য যত্ন নিয়ে ফুল বা ফলের বাগান করে। আর দেখা গেছে চাষীরা তাদের বেশ কিছুটা জমি অধিকমূল্য পাওয়ার জন্য বিক্রয় করেছে বা বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছে। তবুও অল্প কিছু জমি নিয়ে তারা আংশিক সময়ের জন্য চাষবাস চালিয়ে যাচ্ছে। আরও কিছু ব্যক্তি আছে যারা অন্য পেশায় নিযুক্ত হয়ে যাওয়ার জন্য তাদের নিজেদের জমি যত্ন নিয়ে চাষ করে না। ফলে জমিগুলি আগাছায় ভর্ত্তি হয়ে যায়।

পেরি আরবান অঞ্চলে হস্তান্তরতা ঃ জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে দেখা গেছে শহরের ঠিক উপকণ্ঠে কৃষি কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে অ-কৃষি কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে হস্তান্তর বেশী। এখানে একই জমি বারে বারে হস্তান্তর হতে দেখা যায়। অথচ উপকণ্ঠের বাইরে জমি হস্তান্তর কৃষি কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যেই বেশী হয়ে থাকে।

চিত্ত বিনোদনের স্থান ঃ শহরের উপকণ্ঠ অঞ্চলে ভূমি ব্যবহারের যে নক্সা রচিত হচ্ছে সেই নক্সায় ওই অঞ্চলকে সবুজবলয় (Green belt) হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। এখানে শহরের নাগরিকদের চিত্তবিনোদনের জন্য পার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। পশ্চিমী দেশে সব বড় বড় শহরের চারদিকে উপকণ্ঠ অঞ্চলে পার্ক গড়ে উঠেছে। স্থান বিশেষে সবুজ বলয় 2-25 কিলোমিটার পর্যন্ত চওড়া। এটিকে গ্রাম ও শহরের মধ্যে বাফার অঞ্চল বলে মনে করা হয়।

সবুজ বলয়ের একটি সামাজিক মূল্য রয়েছে। তবে শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে এদের দরত্ব বেশী হওয়ায় এগুলি মানুষের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। অনেক সময় এগুলির অপব্যবহার হচ্ছে যা মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। আরও দেখা গেছে যে সবুজ বলয় এমন এক ধরনের ভূমি ব্যবহার যা অনেক সময় খুবই লাভজনক। সেই হিসাবে এটি অর্থনৈতিক দিক থেকে একটি অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। পরিশেষে বলা যায় যে শহরের উপকণ্ঠে গড়ে ওঠা বা গড়ে তোলা চিত্ত বিনোদনের স্থানগুলি নগরায়ণের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর পেরি আরবান অঞ্চলের এটি একটি অন্যতম ভূমি ব্যবহার।

উপসংহার ঃ পেরি আরবান অঞ্চল হল শহর ও গ্রামের মধ্যে একটি সদ্য পরিবর্তনশীল অঞ্চল। এখানে ভূমি ব্যবহারের ধরন দ্রুত পরিবর্তন হয় এবং ভূমি ব্যবহার অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির। ক্রমবর্ধমান শহরের চাপ এই অঞ্চলকেই সহ্য করতে হয়। তাই ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সংঘাত এখানে বেশী। এলসনের মতে পেরি আরবান অঞ্চলের সমস্যা একটি বিশেষ ধরনের সমস্যা যার সঙ্গে মূল শহর বা মূল গ্রামের সমস্যার বিশেষ মিল নেই। একথাও বলতে বাধা নেই যে আমরা মেট্রোপলিটান শহর ও বড় বড় শহরের কথা বেশী করে ভাবছি। শুধু তাই নয় আমরা ভন থুনেন ও সিনক্লেয়ারের মডেল নিয়ে বেশী করে চিন্তা করছি। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বলয়রূপী ভূমি ব্যবহারের নীতি বজায় রেখে পেরি আরবান অঞ্চলে ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। কিন্তু সবসময়ে তা কার্যকরী হয় না। তার কারণ যারা ভূমি ব্যবহার করে তাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার মূল্যও দিতে হয়। কারণ পরিবেশের উৎকর্ষতার কথা চিন্তা করে।

2.2 কৃষি উন্নতির কারণসমূহ (Factors controlling agricultural land use)

কোন স্থানে কোনও কিছু গড়ে উঠতে গেলে উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন। তা সে কৃষিই হোক, শিল্প হোক বা অন্য কিছু হোক। পরিবেশ বলতে বুঝি পারিপার্শ্বিক অবস্থা অর্থাৎ সেই স্থানের বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, মৃত্তিকা, যাতায়াত ব্যবস্থা, জলসেচ ব্যবস্থা, উপযুক্ত বাজার, মূলধন, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ইত্যাদির সামগ্রিক অবস্থা। এদেরকে পরিবেশের এক একটি উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়। যে সকল স্থানে কৃষির উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে সেখানে কৃষি ব্যবস্থা ভালভাবে গড়ে ওঠে। অন্যথায় নয়। আবার কে এক ধরনের কৃষির জন্য এক এক ধরনের পরিবেশের প্রয়োজন হয়। যেমন বাণিজ্য ভিত্তিক কৃষির জন্য যে পরিবেশের প্রয়োজন ঝুম চাষের জন্য তার প্রয়োজন হয় না। বা জীবন সত্তা ভিত্তিক চাষের জন্য যে পরিবেশ প্রয়োজন দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য তা প্রয়োজন হয় না ইত্যাদি। কৃষির উন্নতিতেও এই একই উপাদনগুলি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কৃষির পরিবেশকে আমরা এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি যথা **ভৌত পরিবেশ ও আর্থসামাজিক পরিবেশ**। ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা ইত্যাদি পরিবেশের উপাদানকে ভৌত পরিবেশের উপাদান এবং জলসেচ, সার কীটনাশক দ্রব্য প্রয়োগ, বাজার, আন্তর্জাতিক মূল্যমান, চাহিদা, মূলধন, ভাগচাষ প্রথা ইত্যাদি উপাদানকে আর্থ-সামাজিক পরিবেশের উপাদান বলে।

কৃষি উন্নতিতে এই সকল ভৌত ও আর্থ-সামাজিক উপাদানগুলির প্রায় সমান গুরুত্ব থাকলেও কোন কোন কৃষি ভৌগোলিক ভৌত কারণগুলির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আবার কোন কোন কৃষি ভৌগোলিক আর্থ সামাজিক কারণগুলির উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তবে কারণগুলির প্রভাব পর্যালোচনা করে সাধারণভাবে দেখা গিয়েছে যে ভৌত কারণগুলি কৃষির সার্বিক সীমা (Broad Limit) নির্দেশ করে। আর আর্থ-সামাজিক কারণগুলি কৃষির নিবিড়তা ও লাভ ক্ষতি প্রভাবিত করে।

ভৌত কারণসমূহ ঃ ভূ-প্রকৃতি ঃ ভূমির প্রকৃতি কৃষিকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভূ-প্রকৃতির তিনটি উপাদান যথা **(ক) ভূমির উচ্চতা, (খ) ভূমির ঢালের দিক ও (গ) নতিমাত্রা**। এদের সকলেই নানাভাবে কৃষিকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ ভূমিতে কৃষিকাজ সম্ভব কিনা বা কতখানি সম্ভব তা ভূ-প্রকৃতির এই তিনটি উপাদান নির্ধারিত করে।

ভূমির উচ্চতা বাড়লে তা কৃষির প্রতিকূলতা বাড়ায়। ভূ-উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা হ্রাস পায়। ফলে কম তাপমাত্রা কৃষির একটি অন্তরায় রূপে দেখা দেয়। শস্য বৃদ্ধি ঋতু (Growing season) খাটো হয়ে যায়। ফলে সারা বছরে কৃষিকাজ করা সম্ভব হয় না। কেবল মাত্র গ্রীষ্ম ঋতুতেই কৃষি সম্ভব হয়। কৃষি সম্ভব হলেও প্রধানত কম তাপমাত্রা সহিষ্ণু (Hardy) শস্যই চাষ করা হয়। যেমন—ওট, রাই ইত্যাদি। তবে যে সকল ফসল কম তাপমাত্রায় ভাল হয় সেগুলি মাঝারি উচ্চতায় চাষ হয়। যেমন আপেল, ন্যাসপাতি, প্লাম, বেদানা ইত্যাদি। উচ্চতা আরও বৃদ্ধি পেলে চাষ একেবারেই সম্ভব হয় না। তাছাড়া তাপমাত্রা হ্রাস হেতু তুষারপাতের ফলে শস্য উৎপাদন ব্যহত হয়।

উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে মৃত্তিকা ক্ষয়ের সম্ভাবনা বাড়ে ও বায়ুর অধিক গতিবেগের কারণে বাষ্পীভূত ও বাষ্পীমোচন প্রক্রিয়া দ্রুত হয়। ফলে কৃষি ব্যহত হয়।

তবে উচ্চতা বৃদ্ধি অনেক সময়ে কৃষির সুযোগও বৃদ্ধি করে। যেমন ক্রান্তীয় অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে, সমভূমি অঞ্চলে অধিক উষ্ণতার কারণে কৃষিকাজ প্রায় অসম্ভব। তখন পাহাড়ের উচ্চস্থানে তাপমাত্রা কম থাকায় কৃষিকার্য

সম্ভব হয়। যেমন ধান, গম, সব্জি চাষ গ্রীষ্মকালে অধিক উচ্চতায় চলতে থাকে।

ভূমির ঢালের দিক ঃ ভূ-প্রকৃতির আরেকটি বিষয় হল ভূমির ঢালের দিক। পার্বত্য অঞ্চলে ভূমির যে ঢাল সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে সে দিকের তাপমাত্রা ও সূর্যালোকের পরিমাণ বিপরীত ঢাল অঞ্চলের তুলনায় বেশী। ফলে সূর্যমুখী ঢালে চাষ আবাদ অপর ঢালের তুলনায় বেশী হয়। সে দিকে বৃক্ষরূপী গাছপালার পরিমাণও বেশী। উত্তর গোলার্ধের পর্বতসমূহের দক্ষিণ ঢালে এবং দক্ষিণ গোলার্ধের পর্বতসমূহের উত্তর ঢালে তাপমাত্রা ও সূর্যকিরণের পরিমাণ বিপরীত ঢালে কম। তাই উত্তর গোলার্ধের দক্ষিণ ঢালে ও দক্ষিণ গোলার্ধের উত্তর ঢালে চাষ বেশী হয়। হিমালয় অঞ্চলে এই বিষয় প্রায়শই চোখে পড়ে। শুধু তাই নয় সূর্যমুখী ঢালগুলিতে তাপমাত্রা ও সূর্যকিরণ বেশী হওয়ায় অধিক উচ্চতা পর্যন্ত চাষবাস চলে। অপরদিকে বিপরীত ঢালে চাষ না হওয়ায় সেখানকার ভূমি বনভূমিতে পূর্ণ থাকে। বাড়ীঘরও কম।

নতিমাত্রা (Gradient) ঃ ভূমির ঢালের নাতিমাত্রা বিশেষ করে পাহাড়ী ও পার্বত্য অঞ্চলে কৃষিকার্যে ও কৃষি ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অধিক ঢালু বা অধিক ঢালযুক্ত স্থানে কৃষিকার্যের পদ্ধতি সমতল অঞ্চলের তুলনায় আলাদা। ঢালু অংশে ধাপ কেটে কেটে চাষ করতে হয়। তাই কৃষি জমিগুলি অপরিসর হয়ে থাকে। ফলে কৃষি জমিতে যন্ত্র ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। সাধারণত ভূমির ঢাল 10°-এর কম হলে তবেই কৃষিযন্ত্র ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া ভূমির ঢাল বেশী হলে ভূমিক্ষয়ের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সাধারণত দেখা গেছে যে ভূমির ঢাল 3° বা তার কম হলে কৃষিকাজ সহজসাধ্য হয়। ওই ঢাল 6° হলে চাষ করা চলে বটে তবে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। ভূমির ঢাল 10°-এর বেশী হলে ভূমি শস্য চাষের পক্ষে অনুপযোগী বলে বিবেচিত হয় ও সেক্ষেত্রে ভূমি স্থায়ী ঘাসের জমিতে পরিণত করা বাঞ্ছনীয়। ঢাল আরও বেশী হলে চাষ করা একেবারেই সমীচীন নয় এবং এক্ষেত্রে ভূমি বনভূমি দ্বারা আবৃত থাকা দরকার।

তবে মনে রাখতে হবে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে অধিক উচ্চতা ও অধিক ঢালযুক্ত অঞ্চলগুলিতেও কৃষিব্যবস্থা গড়ে ওঠে বা গড়ে তুলতে হবে। সেক্ষেত্রে ভূমিক্ষয় রোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শুধু তাই নয় উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য সার ব্যবহার করতে হয়। যার ফলে কৃষি ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

কৃষিকার্যে জলবায়ুর প্রভাব ঃ যে-কোন উদ্ভিদের উদ্ভিদকোষ সজীব রাখতে জলের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া যেহেতু উদ্ভিদ তাদের খাদ্যমৌল জলে দ্রবীভূত অবস্থায় না থাকলে গ্রহণ করতে পারে না সেহেতু উদ্ভিদ জল ছাড়া বাঁচতে পারে না। ওই জল উদ্ভিদ প্রধানত মৃত্তিকা থেকেই সংগ্রহ করে থাকে। আবার অত্যধিক বৃষ্টিপাত বা জলের যোগান উদ্ভিদের পক্ষে হিতকর নয়। কারণ এতে মৃত্তিকার অনুরন্ধ্রগুলি জলপূর্ণ হয়ে উদ্ভিদ বৃদ্ধি ব্যহত করে। তাছাড়া অধিক বৃষ্টিপাত যেমন ভূমিক্ষয় ঘটিয়ে কৃষি ব্যবস্থার বিপর্যয় আনতে পারে তেমনি নিম্নভূমি অঞ্চলে বন্যা ঘটিয়ে ফসলের হানি ঘটায়। উচ্চ অক্ষাংশ অঞ্চলে গ্রীষ্মের শুরুতে বরফ গলে জলাভূমির সৃষ্টি করে যা কৃষির একটি ব্যাঘাত স্বরূপ। এক্ষেত্রে ফসল চাষ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে উপর্যুপরি জলের অপ্রতুল যোগান যেমন কৃষির বাধাস্বরূপ তেমনি অধিক জলের যোগানও কৃষির অন্তরায়। তাই পরিমিত জলই কৃষির সহায়ক। তবে একথাও মনে রাখা দরকার যে ভিন্ন ভিন্ন ফসল ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের জলের প্রয়োজন অনুভব করে। যেমন ধান চাষের জন্য পর্যাপ্ত জলের প্রয়োজন। কিন্তু গম চাষের জন্য হালকা বৃষ্টিপাতই যথেষ্ট।

তাপমাত্রার পরিমাণের উপরও জলের চাহিদা নির্ভর করে। ক্রান্তীয় অঞ্চলে যেখানে তাপমাত্রার পরিমাণ বেশী সেখানে অধিক বাষ্পীভবনের জন্য উদ্ভিদের জলের চাহিদা বেশী। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে তাপমাত্রা কম

থাকায় উদ্ভিদের জলের চাহিদা কম। যেমন ক্রান্তীয় অঞ্চলে 75 সে.মি. বৃষ্টিপাত কৃষির পক্ষে যথেষ্ট মনে না হলেও ওই একই পরিমাণ বৃষ্টিপাত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে কৃষির পক্ষে অধিক বলে মনে হবে।

তাপমাত্রার আরেকটি দিক হল সঞ্চিত তাপমাত্রা। অর্থাৎ কোন একটি উদ্ভিদ যে তাপমাত্রার নিচে বাঁচতে পারে না সেই তাপমাত্রার উপরে ওই উদ্ভিদের বৃদ্ধি সময়ে (Growing season) প্রতিদিনের তাপমাত্রার পরিমাণের হিসাবকে বোঝায়। শস্য উৎপাদনে, বিশেষ করে উচ্চ অক্ষাংশ ও অধিক উচ্চতায় এই তাপমাত্রার হিসাব অত্যন্ত জরুরী। উদাহরণস্বরূপ গম চাষে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পরিমাণ 5° সেঃ। গম সুষ্ঠুভাবে পেকে উঠতে 1300 দিন ডিগ্রি সঞ্চিত তাপমাত্রার (Accumulated temperature) প্রয়োজন হয়। ওই পরিমাণ তাপমাত্রা কোন অঞ্চলে না পেলে গম চাষ সম্ভব হয় না। শুধু তাই নয় কম তাপমাত্রাযুক্ত অঞ্চলে গম বা অন্যান্য ফসলের চাষ তুষারপাতের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইউরোপের উত্তরাঞ্চল ও কানাডায় কৃষিকাজে তুষারপাতের প্রভাব অত্যন্ত বেশী।

সূর্যালোক ঃ উদ্ভিদ বেড়ে উঠতে ও ফসল পেকে উঠতে সূর্যালোকের প্রভাব অপরিসীম। আর কৃষিকাজে এটি একটি অন্যতম কারণ হিসাবে দেখা দেয় এই কারণে যে পৃথিবীর সর্বত্র ও সবসময় সূর্যালোকের পরিমাণ সমান থাকে না। দেখা গেছে যে-কোন একটি ফসল পেকে উঠতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সূর্যালোকের প্রয়োজন। তা না পেলে ওই ফসল সেখানে চাষ করা সম্ভব হয় না। পৃথিবীর যে সকল অঞ্চলে বৃদ্ধিসময় (Growing Season) কম সেই সকল অঞ্চলে এটি খুবই প্রাসঙ্গিক। আরও দেখা গেছে যে আকাশ বেশীদিন মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ফসল পাকতে দেরী হয় কারণ নির্দিষ্ট পরিমাণ সূর্যালোক না পেলে তা পাকতে পারে না। আমাদের দেশে বিকল্প ধান চাষে মেঘমুক্ত দিনে অধিক সূর্যালোক পাওয়ার কারণে অল্পদিনে ধান চাষ সম্ভব হয়।

বায়ুপ্রবাহ ঃ বায়ুপ্রবাহ নানাভাবে কৃষিকার্যকে প্রভাবিত করে থাকে এবং কখনও কখনও কৃষিব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দেয়। ঘূর্ণিঝড়ের ফলে এইরূপ অবস্থা প্রায়শই ঘটে থাকে। পূর্বভারতের কালবৈশাখী, ফিলিপিন্সের টাইফুন, মেক্সিকো উপকূলের হারিকেন ঝড় এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। বায়ু প্রবাহের গতিবেগ কালবৈশাখী, হারিকেন, টাইফুন প্রভৃতির মতো না হলেও বায়ু প্রবাহের গুরুত্ব কৃষির উপর থেকে যায়। কারণ বায়ু বাষ্পীভবনের হার বাড়িয়ে দেয়। তার ফলে উদ্ভিদের জলের প্রয়োজন স্বাভাবিক তুলনায় বড়ে যায়। আবার কখনও কখনও শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত হলে শস্য চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এপ্রিল-মে মাসে ভারতের গাঙ্গেয় সমভূমিতে দুপুরে যে গরম শুষ্ক লু বহে তা এরূপ একটি ক্ষতিকর বায়ু। একইভাবে শুষ্ক শীতল বায়ুও একইভাবে শস্য চাষের পক্ষে ক্ষতিকর। বেগবান বায়ুর দ্বারা দানা শস্যের গাছ পড়ে গিয়ে ফলনের পরমিাণ কমিয়ে দেয়।

কৃষির উপর মৃত্তিকার প্রভাব ঃ কৃষিকার্য প্রধানত মৃত্তিকার উপর নির্বরশীল। উদ্ভিদ মৃত্তিকা থেকেই তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যমৌল সংগ্রহ করে থাকে। এদের মধ্যে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, সালফার প্রধান। আরও কিছু রয়েছে যেগুলি উদ্ভিদ নামমাত্র বা অতি অল্প পরিমাণে ব্যবহার করে। যেমন লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম, কোবাল্ট, বোরন, আয়োডিন ইত্যাদি। যে মৃত্তিকা এই সকল খাদ্যমৌলগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করতে পারে সেই মৃত্তিকে **উর্বর মৃত্তিকা** বলে। এতে কৃষিকার্য খুব ভাল হয়। অন্যথায় কৃষিকাজ বা ফসল ভাল হয় না। তাছাড়া মৃত্তিকার গ্রগন, গঠন, জৈব পদার্থের পরিমাণ, জলধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি শস্য উৎপাদনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন দোআঁশ মৃত্তিকা ও ক্রাম্বযুক্ত গঠন শস্য চাষে বিশেষ উপযোগী। এরূপ মৃত্তিকা উদ্ভিদের শিকড়ের প্রবেশ্যতা, ধৌত-প্রক্রিয়া, বায়ু চলাচল, তাপের সঞ্চরণ, হাল চালানোর সুবিধাযুক্ত। তাই এ মৃত্তিকা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়। কর্দমযুক্ত মৃত্তিকা বা কাদামাটি কৃষির পক্ষে উপযোগী।

তবে জলনির্গম প্রণালী ভাল হওয়া দরকার। বালিমাটি কৃষির পক্ষে তেমন উপযুক্ত নয়। কারণ এর জলধারণ ক্ষমতা ও উদ্ভিদ খাদ্যমৌল ধরে রাখার ক্ষমতা কম। তাই বালিমাটিযুক্ত জমিতে ফসল চাষ করতে গেলে প্রচুর সার প্রয়োগ করতে হয়।

আর্থ-সামাজিক কারণসমূহ ঃ আর্থ-সামাজিক কারণসমূহ কৃষির লাভ লোকসান ও কৃষির ব্যাপকতা নির্ধারণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তাছাড়া কৃষির প্রসার ও কৃষি পদ্ধতি নির্ধারণে আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলির প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রায়তী স্বত্ব ঃ এক কথায় এর অর্থ হল জমি কার অধিকারে রয়েছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের রায়তী স্বত্ব প্রচলিত থাকে। যেমন কোন দেশে জমি যে চাষ করে সে নিজেই জমির স্বত্বাধিকারী (Free hold ownership)। আবার কোথাও বা বিভিন্ন ধরনের রায়তী স্বত্ব প্রচলিত। যেমন কোথাও কোথাও জমিদারকে খাজনার বিনিময়ে রায়ত জমি চাষ করে। কোথাও বা জমিদারকে ফসলের ভাগ দেয়। কোথাও বা সরকার জমির মালিক। কোথাও বা একই গোষ্ঠীভুক্ত লোক সমস্ত জমি একত্রে চাষ করে ইত্যাদি। রায়তী স্বত্বের উপর কৃষি উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করে।

উন্নত দেশগুলিতে কৃষক নিজেই জমির স্বত্বাধিকারী। এক্ষেত্রে কৃষক নিজের ইচ্ছামতো জমি ব্যবহার করতে পারে এবং সে নিজেই নিজের থেকে উৎসাহ পায়। কিন্তু এই ব্যবস্থায় ফসলের সমস্ত ঝুঁকি তাকে বহন করতে হয়। তাছাড়া কৃষকের মৃত্যুর পর তার জমি, তার সন্তানদের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করে দেওয়ার অধিকারী। জমি ভাগ হওয়ার ফলে কৃষি উৎপাদন অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আর একটি প্রথা হল ভাগ চাষ পদ্ধতি। এতে জমিদারের জমি চাষীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। চাষী তার উৎপাদনের পূর্বে নির্ধারিত একটি বিশেষ অংশ জমির মালিককে অর্পণ করে। এই ব্যবস্থায় কৃষক তার নিজের ইচ্ছামতো জমি ব্যবহার করতে পারে না। উন্নয়নমূলক কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে না। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। তবে এক্ষেত্রে কৃষককে জমির জন্য কোন ব্যয় করতে হয় না। তাছাড়া কৃষকের মৃত্যুর পর জমি ভাগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কৃষির ঝুঁকিও অনেকটা কম। তবে ক্ষেত্র বিশেষে মালিককে মৃত্যুর পর নির্ধারিত ফসলের অংশ দেওয়ার পরিমাণ বেশ বেশী। ফলে কৃষকের হাতে বিশেষ কিছুই থাকে না।

আবার কখনও কখনও কৃষক মালিকের কাছ থেকে জমি কয়েক বছরের জন্য ইজারা বা পাট্টা (Lease) হিসাবে গ্রহণ করে। বিনিময়ে কৃষক মালিককে ফসলের অংশ বা নগদ অর্থ প্রদান করে। কয় বছরের জন্য ইজারা নেওয়া হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে জমিতে কোন উন্নয়নমূলক কাজ করা যাবে কিনা। ইজারা বেশী বছরের জন্য হলে মালিকের অনুমতি নিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারে। অন্যথায় নয়। এই ব্যবস্থা কৃষির উন্নতিতে কিছুটা সহায়ক। তবে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়।

আমাদের দেশে নানা জায়গায় নানা ব্যবস্থা চালু আছে। জমিদারী প্রথা 2952 খ্রীষ্টাব্দে উচ্ছেদ হলেও প্রায় সমান্তরাল প্রথা অনেক জায়গায় চালু রয়েছে যদিও নানারূপে। ভাগ চাষ, জমি ইজারা নিয়ে চাষ সব প্রথাই এদেশে চালু রয়েছে। এতে কোথাও কৃষিব্যবস্থা উন্নততর হচ্ছে কোথাও অবনতি হচ্ছে।

রায়ত স্বত্বের আরেকটি প্রকারভেদ হল রাষ্ট্রীয় মালিকানা। এ ব্যবস্থায় জমি, জমিচাষের সাজসরঞ্জাম ও মূলধন সবই রাষ্ট্র বহন করে। ব্যক্তিমালিকানার কুফলগুলি যেমন জমিগুলি বিখণ্ডীকরণ, জমির ক্ষুদ্র আয়তনের কারণে কৃষির অসুবিধা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আর থাকে না। কমিউনিস্ট দেশগুলিতে যেমন হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তবে এই ব্যবস্থা সর্বত্র খুব ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ এই ব্যবস্থায়

কৃষি শ্রমিকের গড় উৎপাদন ক্ষমতা বেশী হলেও প্রতি হেক্টর উৎপাদন বা মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি পায় না। রাশিয়ায় সরকারী কৃষি খামারগুলিকে বলা হতো **সভখজী** (Sozkhozy)। আর সমষ্টিগত খামারগুলিকে বলা হতো **কলখজী** (Kolkhozy)। প্রথম প্রথম এই ব্যবস্থায় কিছু সাফল্য এলেও পরবর্তকালে এই ব্যবস্থা খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। তদানীন্তন সোভিয়েত রাশিয়ায় রাষ্ট্রীয় মালিকানায় কৃষিব্যবস্থা চালু করা সত্ত্বেও খাদ্য সমস্যার সমাধান হয়নি।

কার্যপদ্ধতি ঃ কার্যপদ্ধতি বলতে দুটি বিষয় বোঝায় ঃ যথা— (১) জোতের আয়তন ও (২) জোতের খণ্ড খণ্ড বিস্তার।

(১) জোতের আয়তন (Farm Size) ঃ অর্থনৈতিকভাবে উপযুক্ত এমন জমির আয়তন কতটা হওয়া উচিত তার হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। এটি 1 হেক্টর হতে পারে আবার 400 হেক্টরও হতে পারে। তবে একথা ঠিক যে জাতের আয়তন বেশী হলে বা বড় হতে তা কৃষি উন্নতির সহায়ক। এর কারণ জোতের আয়তন বড় হলে তাতে উপযুক্ত কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যায়। ফলনও বেশী হয়।

খণ্ড খণ্ড বিস্তার (Fragmentation of land) ঃ একই কৃষকের জমির পরিমাণ বেশী হলেও তার জোতগুলি বা জমিগুলি খণ্ড খণ্ড অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার জন্য কৃষি কাজে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। জমিগুলি একদিকে আয়তনে ছোট, উপরন্তু এক জমি থেকে অন্য জমিতে যেতে অধিক সময় ব্যয় হয়ে যায়। তাছাড়া সীমা নির্ধারণের জন্য আল দিতে অনেকটা জমি চলে যায়। ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়।

কৃষিতে জোতের খণ্ড খণ্ড বিস্তারের অসুবিধার কথা চিন্তা করে ইউরোপের অনেক দেশেই খণ্ড খণ্ড জোতগুলিকে একত্রিত করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। ফ্রান্সে 1941 খ্রীষ্টাব্দ থেকেই এ কাজ শুরু হয়েছে। জার্মানী, নেদারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে এর অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। ভারতে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা কালে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। তবে আশানুরূপ অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়নি।

বাজার ঃ জীবনধারণবৃত্তিক অর্থনীতিতে কোন কৃষিদ্রব্য উৎপাদনে স্বভাবতই বাজারের বিশেষ প্রভাব থাকে না। অন্য অর্থনীতিতে চাষীরা সেই সমস্ত কৃষিদ্রব্য বা ফসল চাষ করতে আগ্রহী হয় যেগুলির চাহিদা বেশী বা চাষ করলে অধিক লাভজনক। তবে চাহিদা ও যোগান যার দ্বারা কোন দ্রব্যের স্বাভাবিক মূল্যমান নির্ধারিত হয় তা জটিল হয়ে যায় যখন সরকার ভর্তুকী চালু করে বা অন্য কোন নিষেধাজ্ঞা চালু করে বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে চুক্তি করে বাজারমূল্য প্রভাবিত করে।

মনে রাখতে হবে যে ক্রেতার তুলনায় বিক্রেতা কম হলে মূল্য নির্ধারণে বিক্রেতার প্রভাবই বেশী হয়। আবার ফসল যখন তোলা হয় বা গবাদি পশু যখন মোটাসোটা হয় তখন চাষী ওই সকল দ্রব্য কম দামে বিক্রয়ে বাধ্য হয়। কারণ মাল গুদামজাত করার ক্ষমতা বা সুবিধা তাদের থাকে না। উৎপাদনকারীদের সংগঠন বা সমবায় প্রথা চালু করেও পড়তি মূল্য রোধ করা যায়। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমেও ফসল সংরক্ষণ করা যায় যাতে করে ক্রমপড়তি মূল্য আয়ত্তের মধ্যে রাখা যায়।

পচনশীল কৃষিদ্রব্য যেমন জল, দুধ, মাখন ইত্যাদির মূল্য দৈনিক চাহিদার উপর নির্ভর করে। তাই এদের মূল্য স্থিতিশীল থাকে না। তবে আধুনিক সংরক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করে এদের মূল্যমান স্থিতিশীল রাখা যায়। কোন ফসলের বাজার দাম কমে গেলে সেই সকল ফসল চাষে চাষীরা আগ্রহ হারায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোন কৃষি দ্রব্য উৎপাদনে বা চাষে বাজারের একটি ভূমিকা আছে। আবার ফসলের প্রকৃতি, সরকারী নীতি, সমবায় প্রথা বাজার দর প্রভাবিত করে। এগুলিকে বলে কৃষির নিয়ন্ত্রক।

পরিবহন ঃ পরিবহন কৃষি দ্রব্য উৎপাদনকারী ও ক্রেতার মধ্যে যোগসূত্র তৈরী করে। তাছাড়া বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক দ্রব্য পরিবহনের ক্ষেত্রে পরিবহনের ভূমিকা রয়েছে। কৃষিদ্রব্যের বাজার মূল্য পরিবহনের খরচের উপর নির্ভরশীল। সাধারণভাবে উৎপাদনের স্থান থেকে বাজারের দূরত্বই জিনিসের দাম নির্ধারিত করে। ভন থুনেনের মডেলে কৃষির অবস্থান পরিবহন মূল্যের উপরই ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল— যে জিনিসের দাম কম সেগুলির চাষ শহর থেকে খুব দূরে উৎপাদিত হওয়া সম্ভব নয়। আবার যে সমস্ত দ্রব্যের দাম বেশী সে সকল দ্রব্য বাজার থেকে দূরে হলেও চাষ করা সম্ভব।

পরিবহনের প্রকার ও পরিবহনের গতিও কৃষি পণ্য উৎপাদনের নিয়ন্ত্রক। পচনশীল দ্রব্য ধীরগতিসম্পন্ন যানে। পরিবহন করলে পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এর জন্য চাই গতিসম্পন্ন যান। শীততাপ নিয়ন্ত্রণের সুবিধা থাকলে পচনশীল সামগ্রী বহু দুর থেকে আমদানি করা সম্ভব।

পরিবহনের সুবিধা গড়ে ওঠা মাত্র কৃষিব্যবস্থা গড়ে ওঠে। উত্তর আমেরিকার প্রেইরী অঞ্চলে রেল পরিবহন আরম্ভ হওয়া মাত্র সেখানে বিস্তৃত তৃণভূমির উপর গম, ভুট্টা প্রভৃতির চাষ শুরু হয়ে যায়। আবার গম ও ভুট্টার উপর নির্ভর করে মাংস প্যাকিং করে রপ্তানীর কাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

যে সকল দ্রব্য টাটকা অবস্থায় বিক্রি করলে বেশী মূল্য পাওয়া যায় সেই সকল দ্রব্য উড়োজাহাজে পরিবহন করা সম্ভব। যেমন ফুল বা সব্জি। ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত সিসিলি, চ্যানেলদ্বীপ থেকে ফুল, ফল ও সব্জি লণ্ডনের বাজারে উড়োজাহাজে পরিবাহিত হয়। জলজাহাজের সুবিধা থাকলে দ্রব্য পরিবহন অনেক সস্তায় করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অধিক ওজন ও আয়তন বিশিষ্ট দ্রব্য যেমন গম, ভুট্টা, ধান প্রভৃতি দ্রব্য পরিবহন করা লাভজনক। দেখা যাচ্ছে যে পরিবহন কৃষি উন্নয়ন ও প্রসারে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক।

শ্রমিক ঃ চাষের কাজে শ্রমিকদের প্রয়োজন। জমি কর্ষণে, বীজ বপন করতে, আগাছা পরিষ্কার করতে, জল দিতে, সার ও কীটনাশক দ্রব্য ব্যবহার করতে, ফসল কাটা, ঝাড়াই, গুদামজাত করা প্রভৃতি কাজে প্রচুর শ্রমিক লাগে। তাই ফসলের মূল্য নির্ধারণে শ্রমিকের জন্য ব্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন কৃষি পণ্য উৎপাদনে এই ব্যয় বেশী হলে এবং ওই পণ্যের বাজার দাম কম হলে ও শস্য চাষ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং কোন ফসল চাষ করা সম্ভব হবে কি হবে না তা নির্ভর করে শ্রমিকের জন্য নির্দিষ্ট ব্যয়ের উপরে। আবার সব ধরনের ফসল চাষে একই পরিমাণ শ্রমিকের দরকার হয় না। হিসাব করে দেখা গেছে যেখানে গম বা যব উৎপাদনে প্রতি হেক্টর 4.9 শ্রম দিন লাগে সেখানে আলু উৎপাদনে লাগে 37.0 শ্রম দিন, ফল উৎপাদনের লাগে 56.8 শ্রম দিন, ওলকপি চাষে 22.2 শ্রম দিন ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ফলের দাম গম, আলু, ওলকপি প্রভৃতি ফসলের তুলনায় বেশী হবে কারণ শ্রমিকের জন্য উৎপাদন ব্যয় বেশী।

শ্রমিকের প্রয়োজনের আরেকটি দিক হল ফসলের চাষের সময়ভেদে শ্রমিকের প্রয়োজনের পার্থক্য। অধিকাংশ কৃষিপণ্য বিশেষ করে দানা শস্য ও সব্জি কয়েক মাসের মধ্যেই চাষ সম্পূর্ণ হয়। ফসলের বীজ বপনের সময় ও ফসল কাটার সময় বেশী শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। ওই সময়ে চাষীরা প্রায় সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকে। কখনও কখনও আংশিক সময়ের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করতে হয়। বীজ বপন ও ফসল কাটার সময়ে শ্রমিকের চাহিদা যেমন বেশী তেমনি মজুরির হারও বেশী থাকে। এমনকি শ্রমিকদের অভাবের জন্য অনেক সময় ওই সকল ফসল চা, করা সম্ভবও হয় না। পক্ষান্তরে বছরের যে সময়ে ফসলের চাষ হয় না সেই সময়ে শ্রমিক কাজের অভাবে বসে থাকে। ফলে তখন তাদের মজুরীও কম। তাই শ্রমিক কৃষিকার্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উন্নত দেশগুলিতে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। কারণ তারা কৃষিকাজে বিশেষ উৎসাহী নয়। তাছাড়া তারা শিল্পকাজে নিযুক্ত হওয়ার দিকে নজর দিচ্ছে কারণ সেখানে মজুরী বেশী। হ্রাস পাওয়ার আরেকটি কারণ হল কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার। যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে শ্রমিকের প্রয়োজনও কমে গেছে। তবে অনুন্নত বা উন্নতশীল দেশসমূহে শ্রমিকের যোগান বেড়ে চলেছে। কারণ সেখানে মূলধনের অভাবে কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার কম। বিকল্প হিসাবে শিল্পও বিশেষ গড়ে ওঠেনি। তাই ওই সমস্ত দেশে শ্রমিকের মজুরী কম। তাই কৃষিপণ্যের দামও কম। উন্নত দেশে শ্রমিকের মজুরী অত্যধিক বেশী হওয়ায় উৎপাদন ব্যয় বেশী। সেজন্য তাদের দেশে প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও অনেক ফসল তাদের দেশে চাষ না করে বিদেশ থেকে আমদানি করে।

কৃষি যন্ত্র ব্যবহারে আরেকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে তা হল যে সকল স্থানে চাষ হত না সেই সকল স্থান অল্প খরচে চাষযোগ্য করে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। জমি সমতল করার কাজে, বনভূমি পরিষ্কার কাজে যন্ত্রের ব্যবহার হচ্ছে। শ্রমিক ব্যবহার করে জমি সমতল করতে যে পরিমাণ খরচ হয় যন্ত্র ব্যবহার করে অনেক কম খরচে এখন তা সম্ভব হচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে শ্রমিক শুধু কৃষিপণ্যের দামই নির্ধারণ করে না, কোন ফসল হওয়া সম্ভব কিনা তাও নির্ধারণ করে।

মূলধন : বর্তমানে কৃষি একটি মূলধনী কারবার (Agribusiness)। কৃষি যন্ত্রপাতি, জলসেচ, সার প্রয়োগ, কীটনাশক দ্রব্য প্রয়োগ, উন্নতমানের বীজ ক্রয় প্রভৃতি খাতে প্রচুর অর্থব্যয় করতে হয়। তাই আধুনিক যুগে মূলধন বা মূলধনের যোগান কৃষিতে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক হিসাবে পরিগণিত হয়েছে ও কৃষি একটি মূলধননিবিড় (Capital intensive) বৃত্তি হিসাবে দেখা দিয়েছে। ডব্লুউ. বি. মরগান ও আর. জে. সি. মুনটনের মতে বর্তমানে কৃষিতে জমি ও শ্রমিকের আপেক্ষিক প্রয়োজনীয়তা কমে গেছে। এদের মতে কৃষির উন্নতি এখন মূলধনের বরাদ্দ ও বাজার ব্যবহারের নৈপুণ্যের উপর নির্ভরশীল।

উন্নত দেশগুলিতে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা সরাসরি বা বন্ধকের (Mortgage) বিনিময়ে ঋণ প্রদান করে। তাছাড়া সমবায় ব্যাঙ্ক ও কৃষি ঋণ প্রদানকারী ব্যাঙ্কও রয়েছে। সরকারও জমির উন্নয়নে ও গৃহনির্মাণে ঋণ প্রদান করে। চাষীরা শিক্ষিত হওয়ায় ঋণগ্রহণের খুঁটিনাটি সহজেই বুঝতে পারে ও সদ্ব্যবহার করতে পারে। ফলে কৃষি উন্নতিতে মূলধনের অভাব হয় না।

অনুন্নত ও উন্নতশীল দেশগুলিতে কৃষির উন্নতিতে মূলধন একটি প্রধান অন্তরায়। কৃষকের নিজের ভোগ ব্যবহারের পরে উদ্বৃত্ত ফসল আর বিশেষ থাকে না। ফলে মূলধন গড়ে ওঠে না। তাই তারা কৃষির উন্নতিতে প্রায় কিছুই বিনিয়োগ করতে পারে না। ঋণ নিলেও তারা শোধ করতে পারে না। ফলে বেসরকারী সংস্থাগুলি ঋণ দেওয়ার ঝুঁকি নিতে পারে না। ঋণ দানকারী সমবায় ব্যাঙ্ক বা কৃষি ব্যাঙ্কও তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। সরকারও স্বতস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসে না। এই সব কারণে কৃষিতে বিনিয়োগ খুব সামান্য। এগুলি কৃষি উন্নতির অন্তরায় হয়ে পড়েছে। তাই অনুন্নত ও উন্নতশীল দেশগুলি উন্নত দেশগুলির তুলনায় ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছে। আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে উন্নতশীল দেশগুলিতে যে কয়জন অবস্থাপন্ন চাষী থাকে তাদের হাতে মূলধন এলে তারা তা কৃষির উন্নতিতে লগ্নী করতে চায় না। তারা বরং শহরে গিয়ে বসবাস করে ও ছোট খাট শিল্পস্থাপনে আগ্রহী হয়।

ভারতসহ কিছু দেশে অবশ্য এই ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি ঘটেছে বা ঘটছে। কৃষি ঋণ দিতে সরকার এগিয়ে আসছে। তাছাড়া সমবায় ব্যাঙ্ক, কৃষি ঋণদারকারী ব্যাঙ্ক, গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলি অল্প সুদে কৃষি ঋণ প্রদান করছে। এই বিষয়ে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচারাল এণ্ড রুরাল ডেভলপমেন্ট (NABARD) যথেষ্ট সক্রিয়।

এতদ্‌সত্ত্বেও ভারতে কৃষি উন্নতি মূলধনের যথেষ্ট যোগানের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে ঋণ গ্রহণের খুঁটিনাটি তাদের আয়ত্ত্বের মধ্যে থাকে না। তারা দালালের মাধ্যমে যেতে বাধ্য হয়। আর ওইসব দালাল ঋণের অনেকটাই আত্মসাৎ করে।

সরকারী নিয়ন্ত্রণ ঃ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে কৃষি ব্যবস্থায় সরকারী নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব বেড়ে গেছে। এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার যে একটি স্থিতিশীল সরকার একটি স্থিতিশীল কৃষিব্যবস্থা গড়ে তুলতে আগ্রহান্বিত হবে। সেই মতো প্রগতিশীল, জনকল্যাণমূলক সরকার ভূমির করনীতি, খাদ্য শস্যের মূল্যমান, শ্রমিকের মজুরী, পরিবহন ব্যয়ের হার, খাদ্য আমদানী বা রপ্তানী সব কিছুই নির্ধারণ করে দেয়। এমনকি কৃষি উন্নতির জন্য ভূমি সংস্কার করে থাকে।

সরকার যে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তার দুটি ক্ষেত্র আছে, যথা— **(ক) কৃষির আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও (খ) কৃষির বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ।**

(ক) পশ্চিমী দেশগুলিতে সরকার কৃষির উন্নতির জন্য কৃষকদের নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করে। যেমন কৃষকদের ঋণদান, ভর্তুকী, জমির করে ছাড়, বাড়ী বা খামার তৈরীতে ঋণদান প্রভৃতি। তাছাড়া সরকার জলাভূমি বা পতিত জমি উদ্ধারে (Reclamation) কম সুদে ঋণদান করে থাকে। আর যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা হল ফসলের ন্যূনতম মূল্য বেঁধে দেওয়া, বিদেশ থেকে আমদানিকৃত ফসলের সঙ্গে যাতে দেশীয় ফসল প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে তার জন্য কর মুকুব বা আমদানী কর ধার্য ইত্যাদি। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে সরকার কৃষির সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণের অধিকারী।

(খ) বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করে যাতে করে দেশের স্বার্থ রক্ষিত হয়। বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকল দেশই আন্তর্জাতিক চুক্তি মেনে চলে। এর জন্য রয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization)। কৃষি পণ্য আমদানি যাতে দেশীয় পণ্য অযথা প্রতিযোগিতার সম্মুখীন না হতে হয় বা সম্মুখীন হলেও যাতে টিকে থাকতে পারে আইনের মাধ্যমে তার ব্যবস্থা করে। এমন্য হতে পারে যে বিদেশের পণ্যের দামের সঙ্গে খোলা প্রতিযোগিতায় তারা মোটেই টিকতে পারবে না। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে সরকারী নীতি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

জলসেচ ঃ খাদ্য উৎপাদনে তথা কৃষিক্ষেত্র বিস্তারে জলসেচের প্রভাব অপরিসীম বিশেষ করে শুষ্ক অঞ্চলে। উদ্ভিদ সাধারণত মৃত্তিকায় যে জল সঞ্চিত থাকে তা ব্যবহার করে। কিন্তু মৃত্তিকায় জল পর্যাপ্ত না থাকলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও উৎপাদন কম হয়। সেক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে জল সিঞ্চন করে শস্য চাষ করা হয় ও ফসলের উৎপাদন বাড়ে। দেখা গেছে শুষ্ক অঞ্চলে প্রয়োজন মতো জল সিঞ্চন করলে উৎপাদন শতকরা 40 ভাগ বাড়ানো যায়। সুতরাং জলসেচ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে কৃষির উন্নতি সাধন করে।

জলসেচের সুবিধা পেলে পতিত জমিতেও কৃষি কাজ করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়ে। আর কৃষিজমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও কৃষির উন্নতি ঘটে। আবার উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে উদ্বৃত্ত ফসলের পরিমাণ বাড়ে যা কৃষকের মূলধন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। বাণিজ্যও বৃদ্ধি পায়। মোট কথা কৃষিকর্ম যত বাড়ে ফলে পরোক্ষভাবে কৃষির উন্নতি ঘটে। এই সকল কারণে ভারতসহ সকল দেশে যুগ যুগ ধরে কৃষি জমিতে জলসেচ হয়ে আসছে।

জীব রসায়ন (Biochemical) ঃ উন্নত দেশগুলি গত 50 বৎসরে যে কৃষি উৎপাদন দ্বিগুণ করতে পেরেছে তার একটি প্রধান কারণ হল কৃষিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ ও কীটনাশক দ্রব্যের ব্যবহার। দেখা গেছে রাসায়নিক

সার প্রয়োগ করে জমির উর্বরা শক্তিকে বজায় রাখা যায়। এমনকি ওই শক্তি বৃদ্ধিও সম্ভব হয়েছে। এতে কৃষি উৎপাদন তথা উন্নতি সম্ভব হয়েছে।

কীটনাশক দ্রব্য প্রয়োগ করে গাছকে রোগ পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা গেছে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং কৃষির উন্নতিতে এটিও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হিসাবে গণ্য করা যায়।

উন্নত মানের ও উচ্চ ফলনশীল বীজ ঃ বর্তমানে বিশ্বে কৃষি অগ্রগতির আরেকটি কারণ হল উন্নত মানের ও উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার। এর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে কৃষিতে সবুজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে। উন্নতমানের বীজ ব্যবহারের ফলে হেক্টর প্রতি ফলন দ্বিগুণ হয়েছে। উন্নতশীল দেশগুলি যে অনেক ক্ষেত্রেই স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করেছে তার একটি প্রধান কারণ উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার। এ ব্যাপারে ভারত একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

2.3 ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার নীতিসমূহ (Principles of land use planning)

আমরা যার উপর চলাফেলা করি, কৃষিকাজ করি, বাড়ীঘর তৈরী করি, কলকারখানা তৈরী করি, রাস্তাঘাট, রেলপথ তৈরী করি, খেলাধূলার মাঠ তৈরী করি বা গোচারণভূমি হিসাবে ব্যবহার করি তাকেই সাধারণভাবে ভূমি (Land) বলি। এই ভূমির উপরই মানব সভ্যতা গড়ে ওঠে। সুতরাং ভূমির ব্যবহার বহুধা। আবার কোন ভূমি আজ যে কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে কাল তা অন্য কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। ভৌগোলিক কারণে সব ধরনের ভূমিকে যে কোন কাজে ব্যবহার করা যায় না। যেমন খাড়া ঢালযুক্ত ভূমিতে কৃষিকাজ করা যায় না আবার জলাভূমিতে কলকারখানা গড়া যায় না ইত্যাদি। অর্থাৎ ভূমির প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। কোন ভূমি উর্বর আবার কোন ভূমি অনুর্বর। স্থান ভেদে ভূমির উৎকর্ষতার পার্থক্য লক্ষিত হয়। মানুষের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে, ভূমির প্রকৃতির বিভিন্নতার কারণে ও ভূমির উৎকর্ষতার পার্থক্যের কারণে পৃথিবীতে নানান ধরনের ভূমি ব্যবহার গড়ে উঠেছে। ভূমির প্রকৃতির উপর ও উৎকর্ষতার উপর নির্ভর করে সভ্যতার প্রসার ও সভ্যতার উৎকর্ষতা নির্ভর করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে পৃথিবীতে ভূমির পরিমাণ নির্দিষ্ট। আবার ভূমিকে যথেচ্ছ ব্যবহার করলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। তাই মানুষ বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ভূমির যথেচ্ছ ব্যবহার না করে সচেতনভাবে ব্যবহার করতে শিখেছে। তাই প্রয়োজন হয়েছে ভূমি ব্যবহারের আগাম পরিকল্পনা।

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ঃ মানব সভ্যতার আদি যুগে পৃথিবীতে জনসংখ্যা ছিল সীমিত। সেই তুলনায় ভূমি ছিল অফুরন্ত। মানুষ তার ইচ্ছা ও সাধ্য অনুযায়ী ভূমি দখল ও ব্যবহার করতে পেরেছিল। সভ্যতার প্রথম যুগে সমতল, উর্বর ভূমিই চাষ ও বাড়ী নির্মাণে মানুষ ব্যবহার করেছে। নীল নদের সভ্যতা টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর তীরে গড়ে ওঠা ব্যাবিলনের সভ্যতা, সিন্ধু নদের তীরে গড়ে ওঠা মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা তারই সাক্ষ্য দেয়। সভ্যতার প্রসারও হয়েছিল নদীর তীর বরাবর। কারণ উর্বর মৃত্তিকা নদীর তীর বরাবরই গড়ে উঠেছিল।

এর পর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎকৃষ্ট উর্বর ভূমির অভাব দেখা দিল। মানুষ নদী থেকে ক্রমশ দূরবর্তী কম উর্বর স্থানগুলি দখল করতে লাগলো। আরম্ভ হল নদীতীরবর্তী উৎকৃষ্ট ভূমি দখলের প্রতিযোগিতা। ওই সকল উৎকৃষ্ট ভূমির মূল্য গেলো বেড়ে। যারা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারলো না তারা আরও দূরবর্তী

স্থানে বসতি স্থাপন করলো। বসতি ও ক্ষেতখামার গড়তে হয়তো কাটা পড়লো অরণ্য বা দূরীভূত হল তৃণভূমি। ফলে দেখা দিল প্রকৃতির ভারসাম্যের অভাব। আবার হয়তো এমন হল কৃষিভূমিতে তৈরী হল বাড়ীঘর আর জলাভূমি ভরাট করে স্থাপিত হল কলকারখানা ইত্যাদি। অর্থাৎ যে ভূমি যে প্রয়োজনে ব্যবহার করা উচিত তা না হয়ে হল অন্য এক ব্যবহার। এতেও দেখা দিলো ভারসাম্যের অভাব। পরবর্তীকালে জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধির ফলে ওইসব সমস্যা আরও প্রকট হল, অনুভূত হল ভূমির যথাযথ বা সুষ্ঠু ব্যবহারের চিন্তা, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা।

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ঃ সাধারণ কথায় পরিকল্পনা হল কোন কিছু লভিষ্টে পৌছাতে আগে থেকে কর্মসূচী ছকে নেওয়া। অভিধানিক অর্থ হল নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যে পৌছাতে কর্মসূচী উপস্থাপনার প্রক্রিয়া। যে কোন শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রেই হোক, ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রেই হোক, আর খনিজ দ্রব্য আহরণের ক্ষেত্রেই হোক। যেহেতু ভূমির পরিমাণ পৃথিবীতে নির্দিষ্ট ও সীমিত এবং যেহেতু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ভূমির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল সেইহেতু ভূমি ব্যবহারের কোন্ কোন্ খাতে কতটা নিয়োজিত করা যায় তার একটা আগাম পরিকল্পনা করে নেওয়া দরকার, যদিও দিন বদলের সাথে সাথে ভূমি ব্যবহারের প্রতিরূপও পরিবর্তিত হতে পারে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রখ্যাত ভূগোলবিদ্ ডাডলি স্ট্যাম্পের সংজ্ঞা বিষয়োপযোগী। তিনি বলেছেন ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা হল এমন একটি নকসা প্রণয়ন যার দ্বারা প্রতিটি একক ভূমি ব্যবহার করে আশানুরূপ (Optimum) ফল পাওয়া যায় এবং যেটি পরিবর্তনশীল চাহিদার সাথে সাথে পরিবর্তিত করে নেওয়া যায়। অর্থাৎ "Land planning is in essence the determination of the optimum use of every acre of land which must be elastic and can change from time to time to adopt the changing conditions." অপর কথায় মোট প্রাপ্ত ভূমিকে ভূমি ব্যবহারের বিভিন্ন খাতের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করে দেওয়া যাতে করে ভূমি ব্যবহার করে সম্ভাব্য সর্বাধিক ফল লাভ করা যায়। যে সকল দেশে ভূমির উপর জনসংখ্যার চাপ খুব বেশী সে সকল দেশে মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যের সংস্থান করা সহজসাধ্য নয়। তথাপি পরিকল্পনাকারীর কাজ হল ভূমিকে পরিকল্পনামাফিক ব্যবহার করে খাদ্য সমস্যার যথাসাধ্য সমাধান করতে ব্রতী হওয়া। সুতরাং ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা রচনার প্রথম ধাপ হবে পরিকল্পনার নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করা। এটাই হবে পরিকল্পনার মূল বা প্রধান নীতি।

যেমন উদ্দেশ্য যদি খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি হয় তবে কৃষির খাতে বেশী ভূমি লগ্নী করতে হবে। আবার যদি শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি হয় তবে বেশী ভূমি কলকারখানা স্থাপন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, রেলপথ স্থাপন প্রভৃতি বিষয়ে লগ্নী করতে হবে। পরিবেশ উন্নয়নকে যদি প্রধান লক্ষ্য হিসাবে স্থির করা হয় তবে বেশী ভূমি অরণ্য, পার্ক, খেলার মাঠ প্রভৃতি স্থাপনে নিয়োজিত করতে হবে ইত্যাদি। পরিকল্পনার লক্ষ্য হল ঃ

(১) ভূমির প্রতিটি অংশ যেন সঠিক ব্যবহারে নিয়োজিত হয়।

(২) ভূমির অব্যবহার বা অপব্যবহার যাতে না হয় তা সুনিশ্চিত করা।

(৩) খালি ভূমি, অবক্ষয়িত ভূমি, জলাভূমি, শুখা ভূমি, পতিত ভূমি, অনুর্বর ভূমি প্রভৃতি ভূমি চিহ্নিত করা।

(৪) ভূমির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারণ ও পরিমাপ করা।

(৫) ভূমি সামর্থ (Land Capability) বজায় রাখার চেষ্টা করা।

(৬) কৃষির যথাযথ উন্নতি সাধন করা।

(৭) বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা।

(৮) ভূমিকে নানাবিধ দুর্বিপাক থেকে রক্ষা করা।

(৯) বিভিন্ন ভূমিকে যথাযথ ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে মতামত দেওয়া।

(১০) ভূমি ব্যবহার যথাযথ করতে যা যা পরিকাঠামোর প্রয়োজন তা প্রস্তাব করা ইত্যাদি।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যগুলি মাথায় রেখে মোট প্রাপ্ত ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা রচিত হয়। এই কাজ সফল করতে কোন একজন, কয়েকজন অথবা কোন সংস্থার লোকজনের সুচিন্তিত চিন্তা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে ভূমি ব্যবহার, পরিকল্পনা স্বল্প সময়ের জন্য বা দীর্ঘ সময়ের জন্য রচিত হতে পারে।

একক 3 ❒ কৃষি অঞ্চল (Agricultural Region)

গঠন

3.1 প্রস্তাবনা

3.2 ধারণা **(Concept)**

3.3 কৃষি অঞ্চল নির্ধারণের কলাকৌশল **(Techniques for delineating agricultural regions)**

3.4 ভারতের কৃষি অঞ্চল **(Agricultural Regions of India)**

3.5 কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার **(Use of machines in agriculture)**

3.6 ভারতের কৃষি সমস্যা ও তাদের সমাধান **(Agricultural probelms in India and their possible remidies)**

3.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

3.1 প্রস্তাবনা

সাধারণত দেখা গেছে পৃথিবীর কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে নির্দিষ্ট কয়েকটি ভৌগোলিক ঘটনার উদ্ভব হয়েছে। যেগুলি এক একটি বাস্তব (Real) ঘটনা আর সেগুলি কয়েকটি প্রাকৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্য-কারণের দ্বারা সম্পর্কযুক্ত। এক একটি অঞ্চলে গড়ে ওঠা একই ধরনের বাস্তবতার ধারণাকে বলে **অঞ্চল** (Region)। হার্টশোন (Hartshone), হুইটলসে (Whittlesey), গ্রিগ (Grigg) প্রভৃতি ভৌগোলিকদের মতে গড়ে ওঠা সকল অঞ্চলের ভৌগোলিক পঠন-পাঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কৃষি ঘটনা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে ঘটলেও এগুলি কতকগুলি প্রাকৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিয়ম মেনে চলে। অর্থাৎ খামখেয়ালীভাবে বা এলোপাতাড়িভাবে গড়ে ওঠে না। যেখানে চা হয় সেখানে গম হয় না, যেখানে তুলো হয় সেখানে পাট হয় না। আরও দেখা গেছে কোন একটি অঞ্চলে দুটি ফসল প্রায় সমানভাবে চাষ হয়।

3.2 ধারণা (Concept)

পৃথিবীর নানা জায়গায় নানান ধরনের কৃষিপণ্য উৎপন্ন হয়। আবার বছরের বিভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন ফসলের চাষ হয়। ওই সকল পণ্যের চাষ কোথায় প্রধানত মানুষের পেশী শক্তির সাহায্যে হয়ে থাকে, কোথাও বা ওই চাষ পশুশক্তির সাহায্যে হয়। আবার কোথাও চাষের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে যন্ত্র। কৃষি ভূগোলে এগুলি এক একটি ঘটনা (Phenomenon) হিসেবে বিবেচিত হয়।

আর এই সকল ঘটনার এক একটি নির্দিষ্ট অবস্থান (location) রয়েছে। এগুলিকে কৃষি অবস্থান (Agricultural location) হিসাবে গণ্য করা যায়। এখন দেখা যাক কৃষি অঞ্চল কাকে বলে। কারণ কৃষি অঞ্চল শুধুমাত্র কৃষি ভৌগোলিকদের বিষয়বস্তু নয়। অর্থনীতিবিদগণও সমান গুরুত্ব দিয়ে কৃষি অঞ্চলের পঠন-পাঠন করে।

কৃষি ভূগোলে পাঠের প্রথম যুগে প্রাকৃতিক অঞ্চলকেই কৃষি অঞ্চল হিসাবে গণ্য করা হত কারণ দেখা গিয়েছিল

যে একই ভূমিরূপ, জলবায়ু ও মৃত্তিকায় একই ধরনের কৃষি ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। তবে বাস্তবে তা সত্য নয়। কারণ একই প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন কৃষি ব্যবস্থা গড়ে উঠতে দেখা যায়। আর. ও. বুখাননের (R. O. Bukhanon) মতে কৃষি অঞ্চলকে চিহ্নিত বা সুনির্দিষ্ট করতে কৃষির উপাদানসমূহ প্রধান বিবেচ্য। যেমন কোন শস্য উৎপাদিত হচ্ছে বা কি ধরনের পশু কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হচ্ছে বা কৃষিতে কোন পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে বা কৃষির সংগঠনই বা কিরূপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে (Field) এগুলি সহজেই নির্ধারণ করা যায়। এরা সম্মিলিতভাবে কোন অঞ্চলে একই কৃষি ব্যবস্থা সৃষ্টি করে। এইভাবে একই প্রকৃতির কতকগুলি অঞ্চল গড়ে উঠলে তাদেরকে বলা হয় **কৃষি অঞ্চল** (Agricultural region)। কোথাও কোথাও এই অঞ্চলগুলিকে **বলয়** (Belt), **অর্থনৈতিক ভূ-রূপ** (Economic Landscape) বা **মণ্ডল** (Zone) বলা হয়। ইদানীংকালে কৃষি অঞ্চল সৃষ্টির প্রক্রিয়া বা কৃষি অঞ্চলায়নের উপর নানান কাজকর্ম লক্ষ্য করা গেছে। সেইমতো কৃষি অঞ্চল নির্ণয়ের পদ্ধতিরও পরিবর্তন হয়েছে। শুধু তাই নয় এর সঙ্গে পদ্ধতির গুণগত মানও বৃদ্ধি পেয়েছে যাতে করে কৃষি অঞ্চলের সংজ্ঞা আরও উন্নততর হয়েছে ও কৃষি অঞ্চলগুলিকে সুনির্দিষ্ট করা গেছে। মরগান ও মুনটনের মতে (1971) যদিও আমাদের কৃষি ভূগোল পাঠের দৃষ্টিভঙ্গি (approach) অঞ্চলভিত্তিক বা অবস্থানগত তথাপি আমরা স্থানের থেকে কৃষি ব্যবস্থার উপদানগুলির উপর জোর দিচ্ছি।

এখানে কৃষি অঞ্চল বলতে এমন এক অখণ্ড অঞ্চলকে বোঝায় যার মধ্যে একটা একত্ব (Homogeneity) ভাব রয়েছে এবং যার একটি সুস্পষ্ট সীমা আছে। স্বাভাবিকভাবে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষণ দেখে একটি কৃষি অঞ্চলকে সহজেই সনাক্ত করা যায় যার মধ্যে একটি নিজস্ব সত্তা ফুটে ওঠে। মোদ্দা কথা কৃষি অঞ্চলায়ন হল কৃষি সংক্রান্ত ঘটনার শ্রেণীভুক্তকরণ (Grouping)। সুতরাং কৃষি অঞ্চল একটি বস্তু নয়। কৃষি অঞ্চল নিজের থেকে গড়ে ওঠা এক বুদ্ধিদীপ্ত ধারণা (Intellectual concept)।

যেহেতু কৃষি আজও পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের উপজীবিকা এবং যেহেতু কৃষি ওই সমস্ত দেশের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস বিশেষ করে উন্নতশীল ও অনুন্নত দেশগুলিতে সেই হেতু কৃষি অঞ্চলের সনাক্তকরণ কৃষি ভৌগোলিকদের গবেষণার এক প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত। তবে প্রশ্ন হল কৃষি অঞ্চল সনাক্তকরণের নির্ণায়ক (criteria) কি হবে। শস্য অঞ্চল উৎপাদনশীলতা, শ্রম দিবস ব্যবহারের পরিমাণ, পশুশক্তি ব্যবহারের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য এ ব্যাপারে এক একটি নির্ণায়ক হিসাবে গণ্য হতে পারে। এই সকল বিষয় সংক্রান্ত তথ্য শতকরা হিসাবে বা অন্য কোন সূচকে (Index) পরিবর্তিত করে অথবা যথাযথ পরিসংখ্যান সংক্রান্ত কৌশল ব্যবহার করে কৃষি অঞ্চল সমূহকে সনাক্ত করা যায়। সুতরাং মোটামুটি বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে একই ধরনের কৃষি ব্যবস্থাযুক্ত অঞ্চলগুলি কৃষি অঞ্চল হিসাবে পরিগণিত হয় যা স্থান ভেদে কৃষির বণ্টন পরিস্ফুট করে।

কৃষি ভূগোলে আঞ্চলিক ধারণা ঃ আঞ্চলিক ধারণাই approach কৃষি ভূগোলের মৌলিক বিষয় হিসাবে পরিগণিত। কৃষির আঞ্চলিক বিভিন্নতার ব্যাখ্যাই কৃষি ভৌগোলিকদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। সেইহেতু কৃষি ভৌগোলিকগণ কৃষি অঞ্চলায়ন নির্ধারণের পন্থা উদ্ভাবনে সচেষ্ট। শুধু তাই নয়, কৃষি উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প যেমন C. ADP, IRDP ইত্যাদি রূপায়ণে কৃষি অঞ্চল নির্ধারণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে। তাই উত্তরোত্তর নতুন নতুন পন্থার উদ্ভাবন হচ্ছে। এ বিষয়ে ডি. এস. হুইটলসে, জে. কসট্রোউকি, ভি. গ্রিগের নাম করা যেতে পারে।

3.3 কৃষি অঞ্চল নির্ধারণের কলাকৌশল (Techniques for delineating agricultural regions) :

কলাকৌশল বলতে বোঝায় কোন সমস্যা সমাধানে যথাযথ তথ্য ও পরিসংখ্যানগত পন্থা ব্যবহার করে নির্দিষ্ট কোন কৌশল সৃষ্টি করা। যদিও কৃষি অঞ্চলের সংজ্ঞা দেওয়া সহজসাধ্য কিন্তু অঞ্চল নির্ধারণের সঠিক কৌশল নির্দেশ করা বেশ কঠিন কাজ। কারণ একটি কৃষি অঞ্চল একটি বা দুটি নয় অঞ্চলটি পরিবেশের সজীব, নির্জীব প্রভৃতি নানা উপাদানের সম্মিলিত কার্য-কারণের ফলশ্রুতি হিসাবে গড়ে ওঠে। তবে এর প্রাথমিক ভিত্তি হল কৃষি পণ্যাদি বা গবাদি অথবা অন্য পশু যা ওই অঞ্চল থেকে উত্তোলিত (raised) হয়। কৃষির উৎপাদনশীলতা, কৃষির নিবিড়তা, পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণের মাত্রা, জীবিকাসত্তার মাত্রা, কৃষি রীতি (farming practice), কৃষি প্রযুক্তির বিকাশ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে কৃষি অঞ্চলগুলিকে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে ভাগ করা যায়।

সুতরাং কৃষি আঞ্চলিকতার প্রথম ধাপ হল কৃষি অঞ্চলকে সনাক্ত করা। আর দ্বিতীয় ধাপ হল অঞ্চল সমূহের সুনির্দিষ্ট সীমা নির্দেশ করা। স্বাভাবিকভাবেই প্রথম ধাপে থাকছে কৃষির গঠনগত বৈশিষ্ট্য যেমন প্রধান বা মুখ্য শস্য, শতকরা হিসাবে এর স্থান, প্রথম সারির শস্যসমূহের কেন্দ্রীভবন (concentration) ,শস্য-কাঠামো, কৃষিতে শস্য, গবাদি পশুর স্থান, কৃতি রীতি, কৃষির ধরন ইত্যাদি। তৃতীয় ধাপে থাকছে পরিসংখ্যান ভিত্তিক মানচিত্র তৈরী। সুতরাং কৃষি ভৌগলিকের কাছে যথেষ্ট পরিমাণের কৃষি সংক্রান্ত তথ্য থাকা জরুরী। কোন স্থানকে কৃষি অঞ্চলে বিভক্ত করতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের পন্থা বা কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। ওই সকল কৌশল সমূহকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা—(১) **ধারণা প্রসূত কৌশল, (২) অভিজ্ঞতালব্ধ কৌশল, (৩) এক উপাদান বিশিষ্ট কৌশল, (৪) পরিসংখ্যানগত কৌশল বহু উপাদান এবং (৫) গ্রাহ্য কৌশল।**

(১) **ধারণাপ্রসূত কৌশল** ঃ নির্দিষ্ট কতকগুলি অবস্থায় এক বিশেষ ধরনের কৃষি অঞ্চল গড়ে উঠবে এই ধারণা করে এই, কৃষি ব্যবস্থা কল্পনা করা যায়। 1826 খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর ভন থুনেন (Von Thunen) একটি মডেল স্থাপন করেন যার দ্বারা তিনি কৃষির অবস্থা কোন এক জায়গায় কেমন হবে তার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এ ব্যাপারে তিনি বিশেষ কয়েকটি শর্তের উল্লেখ করেছেন। যেমন সেখানকার ভূমিরূপ হবে সমতল প্রকৃতির যেখানে জমির উর্বরতা হবে একই ধরনের, সেখানে পরিবহনের সুবিধা থাকবে একই; এবং সেখানে একটিই বাজার থাকবে। সেখানে জমির খাজনা, ভূমি ব্যবহারের তীব্রতা, কৃষির অবস্থান শুধুমাত্র পরিবহনের খরচের উপর নির্ভর করবে। আর পরিবহনের ব্যয় শহর থেকে দূরত্ব অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। স্থানীয়ভাবে কোন দ্রব্যের দাম নির্ভর করবে ওই পরিবহনের খরচের উপর। অর্থাৎ দেখা যাবে অর্থনৈতিক আয় শহর থেকে দূরত্ব যত বাড়বে তত কমবে।

ধারণাপ্রসূত কৌশল (**Normative technique**) ঃ যদি অনেকগুলি শস্য উৎপাদনের কথা ভাবা যায় তবে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন পণ্যের দাম তাদের আয়তন ও পচনশীলতার উপর নির্ভর করছে। ভন থুনেনের সূত্র অনুযায়ী ভূমির ব্যবহারের রূপরেখাটি হবে বৃত্তাকার যার কেন্দ্র থাকবে শহরের কেন্দ্রে। কেন্দ্র থেকে দূরত্ব অনুযায়ী পরস্পর দুটি বৃত্তের মধ্যে এক এক ধরনের পণ্যের চাষ হবে। শহরের কাছাকাছি সেই সকল পণ্যের উৎপাদন হবে যাদের ওজন বা আয়তন বেশী বা যে সকল দ্রব্য পচনশীল। যে সকল দ্রব্যের ওজন বা আয়তন কম অথবা পচনশীল নয় সেগুলি উৎপাদিত হবে শহর থেকে ক্রমশ দূরে। এইভাবে বৃত্তাকার ভূমি ব্যবহারের একটি রূপরেখা গড়ে উঠবে।

কেবলমাত্র ধারণা করে এক আদর্শ কৃষি অঞ্চল নির্ধারণ করার এই কৌশলকে ধারণাপ্রসূত কৌশল (Normative technique) বলে। ই. এম. হুভার (1973), এ. লোচ (1954) ডব্লু ইসার্ড (1956) এই নীতি অবলম্বন করে অনেক কাজ করেছেন। এই কৌশলে নরম্যাটিভ সম্পর্ক হল লভ্যাংশ সর্বাধিক করার প্রচেষ্টা।

সমালোচনা ঃ ভুন থুনেন কৃষি অবস্থানের যে নক্সা বা মডেলের কথা চিন্তা করেছেন তা একান্তই তাত্ত্বিক। তিনি কয়েকটি শর্তের কথা বলেছেন যেগুলি বাস্তবসম্মত নয়। এমনকি তখনকার দিনেও এ ধরনের একটি বিচ্ছিন্ন স্থান (Isolated place) চিন্তা করা দুরূহ। আজকের দিনে তো নয়ই। তবে তিনি যে তত্ত্বের কথা বলেছেন তার মূল্য আজও আছে। শুধু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাকে পরিমার্জিত করে নিতে হবে। সেদিক থেকে এটি একটি উচ্চাঙ্গের বা উৎকর্ষতার (Classical) নিদর্শন এবং কৌশলটি চমকপ্রদ।

(২) **অভিজ্ঞতালব্ধ কৌশল ঃ** কোন কিছুকে চোখে দেখে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে যখন কোন স্থানকে কৃষি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় তখন সেই কৌশলকে **অভিজ্ঞতালব্ধ কৌশল** (Empirical technique) নামে অভিহিত করা হয়। এ কৌশল কোন ধারণার উপর ভিত্তি করে নয়। অর্থাৎ এর বাস্তবতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। ও. ই. বেকার (1925) এই মতবাদের পথিকৃৎ। তিনি কৃষির অবস্থানে ভৌত ও অর্থনৈতিক নীতির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

বেকারের নীতিসমূহ ঃ বেকারের ধারণা প্রসূত নীতিগুলি হল ঃ (ক) যে সকল কৃষিজাত পণ্য যেগুলি অনুকূল জলবায়ু ও ভৌত অবস্থার দরকার হবে সেগুলি প্রথম শ্রেণীর জমিতে উৎপাদিত হবে। যদি অবশ্য ওই পণ্যের যথেষ্ট চাহিদা থাকে। স্বাভাবিকভাবেই ওই সকল অঞ্চল ওই সকল শস্য উৎপাদনে একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। এর ফলে ওই শস্য যে মূল্য লাভ করে অন্য কৃষি পণ্য ওই অঞ্চলে তা লাভ করতে পারে না।

(খ) যে সমস্ত পণ্যের একক পরিমাণ মূল্যের তুলনায় আয়তন কম সেই সকল পণ্য বহুদূর থেক্যে পরিবহনের সাহায্যে আনা সম্ভব। তাই সেগুলি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থানে উৎপাদিত হবে।

(গ) বিভিন্ন ঋতুতে কৃষিপণ্য উৎপাদনে বিভিন্ন পরিবর্তনশীল শ্রমিকের যোগান থাকলে কৃষিপণ্যে বৈচিত্র্য আসে।

(ঘ) বিভিন্ন ঋতুতে কৃষিপণ্য চাষে শুধু যে বৈচিত্র্য আসে তাই নয় এর ফলে মৃত্তিকায় উর্বরাশক্তি বজায় থাকে ও শস্যে পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হয়।

(ঙ) যে ফসলের উৎপাদন সব থেকে বেশী ও অধিক অর্থকরী সেই সকল ফসল জমিতে চাষ করার প্রবণতা বাড়ে এবং সব থেকে মূল্যবান জমিতেই তা চাষ করা হয়। জনসংখ্যা ও জমির মূল্য যত বৃদ্ধি পায় এই অধিক প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায় কারণ অধিক মূল্যের জমি ও পর্যাপ্ত শ্রমিক লাভজনকভাবে নিয়োজিত করতে হয়।

(ক) কোন অঞ্চলের কৃষকের বা কৃষক সম্প্রদায়ের নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতা এ ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ও কৃষিকে প্রভাবিত করে।

ও. ই. বেকার অভিজ্ঞতার দ্বারা কৃষি অঞ্চল নির্ণয়ের একজন বড়ো প্রবক্তা। কোনরূপ মতবাদ ছাড়াই কেবলমাত্র চোখে দেখে ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তিনি কৃষি অঞ্চল নির্ণয় করেছেন। তবে তিনি ওই সকল অঞ্চলের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক কোন অর্থনৈতিক সম্পর্ক দেখাননি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভুট্টা অঞ্চলের মধ্যে শস্য চাষ সংক্রান্ত বিরাট পরিবর্তন এসেছে। ভুট্টা অঞ্চল ভুট্টা সয়াবীন অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। সুতরাং অঞ্চলের সীমা নির্ধারণ অসুবিধাজনক হয়ে পড়েছে। তাছাড়া সীমা নির্দেশও সব সময় সঠিক হয়নি।

শুধু তাই নয় কৃষি অঞ্চল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি বৃহদাঞ্চলের পক্ষে প্রযোজ্য সেগুলি ক্ষুদ্রাঞ্চল বা অতি ক্ষুদ্রাঞ্চলের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশের পর থেকে অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর

করেই কৃষি অঞ্চল নির্ধারণ করা হতো। তার একটি প্রধান কারণ ছিল উপযুক্ত কৃষি সংক্রান্ত তথ্যের অভাব। ও. ই. বেকার (1925, 1926), ও. জোনাসন (1925-26) , ডব্লু. ডি. জোন্স (1928-30), জি. টেলর (1930) প্রভৃতি কৃষি ভৌগোলিকগণ বিভিন্ন মহাদেশের কৃষি অঞ্চল দেখিয়েছেন ও বর্ণনা দিয়েছেন। পরবর্তীকালে ওই সমস্ত অঞ্চলের আঞ্চলিক বিভিন্নতার কারণও কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন। যাই হোক এই সমস্ত কার্যের মধ্যে মহাদেশ সম্পর্কিত একটি সাধারণ বর্ণনা পাওয়া যায় যা সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অমূল্য বলে আজও বিবেচিত।

(৩) **এক উপাদান বিশিষ্ট কৌশল :** কোন একটি কৃষিপণ্য কোন একটি স্থানে ব্যাপকভাবে চাষ হতে পারে। ওই একই স্থানে অন্য কোন কৃষিপণ্যের চাষ হলেও তার পরিমাণ প্রথমটির তুলনায় কম বা বেশ কম হতে পারে। কৃষি পণ্য ছাড়া গবাদি পশু বা কোন পশুর বিষয়ও ধরা যেতে পারে। যেমন যদি মোট চাষযোগ্য জমির মধ্যে ধানের বা গম চাষের অংশ ধরা যায় বা মোট পশুর মধ্যে গরু বা মহিষের কথা ধরা যায় এবং সেই অনুযায়ী ধান উৎপাদক অঞ্চল বা গম উৎপাদক অঞ্চল অথবা ইক্ষু উৎপাদক অঞ্চল হিসাবে দেখানো যায়। তবে একটি শস্যকে অবলম্বন করে কৃষি অঞ্চল দেখানোর কৌশল বা পদ্ধতিকে **এক উপাদান বিশিষ্ট কৌশল** (Single element technique) হিসাবে গণ্য করা হয়। টি. এইচ. এনজেলব্রেচট (T. H. Engelbrecht) 1983 খ্রীষ্টাব্দে এইভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শস্য ও গৃহপালিত পশুর বিস্তার দেখিয়েছেন। ওই একই দেশের কৃষি ভৌগোলিকগণ দেশটিকে ভুট্টা অঞ্চল, তুলা অঞ্চল, গম অঞ্চল প্রভৃতি বলয়ে ভাগ করেছেন। ভারতের যশবীর সিং (1976) হরিয়ানার ধানের বাটি (Rice bowl), আখের কোষ (Sugarcane cell) বা তুলা ভূ-ভাগ (Cotton tract) প্রভৃতি অঞ্চলে ভাগ করেছেন। মনে রাখতে হবে যে এই সকল এক একটি অঞ্চলে ওই ওই শস্য ছাড়াও অন্য শস্য চাষ হতে পারে, তবে ধান অঞ্চলে ধান, ইক্ষু অঞ্চলে ইক্ষু বা তুলা অঞ্চলে তুলা হল প্রথম স্থানাধিকারী (First ranking) শস্য।

এই কৌশলে সাধারণভাবে কোন স্থানের কৃষি অঞ্চলের একটি ধারণা এক হিসাবে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কোন কোন স্থানে দুটি শস্য প্রায় একই গুরুত্বের সঙ্গে পাশাপাশি চাষ করা হয়ে থাকে। এক উপাদান বিশিষ্ট কৌশলে যে শস্যটি প্রথম স্থানাধিকারী শস্যের তুলনায় সামান্য কম জমিতে চাষ হয় সেটি সম্পূর্ণভাবে বাদ চলে যায়। সেটি কখনই কাম্য নয়। 1954 খ্রীষ্টাব্দে জে. সি. ওয়েভার (J. C. Weaver) সঠিকভাবে বলেছেন যে অনেক ক্ষেত্রে কয়েকটি শস্য প্রায় সমান গুরুত্বের সঙ্গে পাশাপাশি একই সঙ্গে চাষ হয়। সুতরাং এক উপাদান গ্রাহ্য কৌশল অবলম্বন করে কৃষি অঞ্চলের প্রকৃতি ছবি দর্শায় না। ঠিক একইভাবে গরু বা মহিষ অথবা ভেড়ার মধ্যে যেটি প্রথম স্থানাধিকারী তার উপর নির্ভর করে যদি অঞ্চল দেখানো হয় তবে একই সমস্যা দেখা দেবে। এই কারণে ডি. এস. হুইটলসে (1936) শস্য-গৃহপালিত পশু একত্রে (Crop livestock association) অবলম্বন করে কৃষি অঞ্চল দেখানোর কথা বলেছেন।

এই সকল অসুবিধার জন্য এক উপাদান গ্রাহ্য কৌশল তেমন আর প্রচলিত নয়। পরিবর্তে একাধিক উপাদান গ্রাহ্য কৌশল গৃহীত হয়।

(৪) **পরিসংখ্যান গ্রাহ্য কৌশল :** বর্তমান পৃথিবীতে কৃষি ব্যবস্থা জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। সুতরাং একটি উপাদান বা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কোন স্থানকে কৃষি অঞ্চলে বিভক্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়। যদিও প্রাথমিক অবস্থায় তা করা যেতে পারে। সেই কারণে কৃষি ভৌগোলিকগণ পরিসংখ্যান গ্রাহ্য কৌশলের অবতারণা করেছেন। এ ব্যাপারে হর্টশোর্ন ও ডিকেনের (1935) নাম করা যেতে পারে। তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যবহার করে তাঁরা উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের কৃষি-অঞ্চল দেখিয়েছেন। এ ব্যাপারে এক বা একাধিক কৃষি পণ্যের দাম বা উৎপাদনশীলতার চেয়ে ওই সকল কৃষি পণ্য মোট কৃষি জমির শতকরা কতখানি অংশ অধিকার করছে

তার উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ কোন শস্য যতটা জমিতে চাষ হয় তা সহজে পণ্যের দামের মতো পরিবর্তিত হয় না।

(৫) কৃষির একাধিক উপাদান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে সেই সকল তথ্য পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে কৃষি অঞ্চল বার করার রীতি বর্তমানে গৃহীত হয়েছে। সেই হিসাবে এই কৌশল বা পদ্ধতিকে **বহু-উপাদানগ্রাহ্য কৌশল** (Multi element technique) হিসাবে গণ্য করা যায়। কখনও কখনও এক উপাদানগ্রাহ্য কৃষি অঞ্চলসমূহকে একটির উপর একটিকে অধ্যারোপ (Superimpose) করে কৃষি অঞ্চলের সীমা নির্দেশ করা যেতে পারে।

কৃষির বিভিন্ন উপাদানসমূহের কম্বিনেশনের দ্বারাও কৃষি অঞ্চল দেখানো যায়। যেমন গতানুগতিক (Traditional) কৃষি অঞ্চল জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি ও মৃত্তিকার উপর ভিত্তি করে দেখানো সম্ভব।

আধুনিক পরিসংখ্যানগত কৌশল ঃ আধুনিক যুগে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বহু নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। ওই সমস্ত কৌশল ব্যবহার করে আরও সুষ্ঠুভাবে কৃষি অঞ্চল বার করার কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে দুধরনের ব্যবহৃত কৌশলের কথা আলোচনা করা হল যথা— (ক) **গুচ্ছ বিশ্লেষণ** (Cluster analysis) ও (খ) **একত্রীভূত বিশ্লেষণ** (Combinational analysis)।

(ক) **গুচ্ছ বিশ্লেষণ ঃ** এই কৌশলে কোন এলাকায় একই ধরনের বৈশিষ্ট্যসমন্বিত স্থানগুলিকে চিহ্নিত করে কয়েকটি কৃষি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। স্বভাবতই ওই অঞ্চলগুলিতে কৃষির বৈশিষ্টগত উপাদানগুলির (attrilentes) মিল (Similarity) বা পারস্পরিক সম্পর্ক (association) লক্ষ্য করা যায়। তবে ওই মিল বা অমিল বিভিন্ন কৃষি উপাদানসমূহকে নির্দিষ্ট পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারণের এই পদ্ধতিসমূহ বিভিন্ন কৃষি উপাদানের (Attributes) মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্কিত পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে রচিত। সুতরাং একই বৈশিষ্ট্যযুক্ত স্থান বা এলাকাগুলিকে একই গুচ্ছের (cluster) আওতায় আনা হয়। সেই কারণে এই কৌশলকে **গুচ্ছ বিশ্লেষণ** (chester) **কৌশল** বলে।

(খ) **একত্রীভূত বিশ্লেষণ ঃ** একটি কৃষি ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকার উৎপন্ন দ্রব্যই কৃষি অঞ্চলের একমাত্র উপাদান নয়। কৃষি ব্যবস্থা বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্য, গৃহপালিত পশু ও কৃষি প্রক্রিয়া প্রভৃতিকে বোঝায়। এদের অর্থাৎ এই সকল উপাদানের পরিসংখ্যানগত সঠিক একত্রীভূতিই হল প্রকৃত কৃষি ব্যবস্থার প্রতিফলন যা একটি কৃষি অঞ্চল সৃষ্টি করে। 1954 খ্রীষ্টাব্দে ওয়েভার শস্য একত্রীভূতির (Crop combination) একটি পরিসংখ্যানগত ধারণা দেন যা আজ সর্বজনগ্রাহ্য। ইহাই **একত্রীভূত বিশ্লেষণ** (Combinational analysis)।

ওই পদ্ধতিতে কোন একটি স্থানে বা অঞ্চলে যে সমস্ত শস্য উৎপাদিত হয় থিওরিটিক্যাল দিক থেকে মোট শস্যভূমির (Gross cropped area) কতটা অংশ শতকরা হিসাবে অধিকার করছে তার হিসাব করা হয়। আর ওই শতকরা হিসাবের সঙ্গে ওই সমস্ত শস্য সত্যিকারের (Actual) মোট শস্য ভূমির শতকরা হিসাবে কতটা শস্যভূমি অধিকার করে তার একটা তুলনা করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল শস্য সমূহের এমন একটি কম্বিনেশন খুঁজে বার করা যেখানে সত্যিকারের শতকরা হিসাবে অ্যাবসট্র্যাক্ট থিওরিটিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন থেকে সর্বাপেক্ষা কম ডিভিয়েট করছে। এই অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন হয় সর্বনিম্ন। এইভাবে এক একটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিটের শস্যের কম্বিনেশন বার করে মানচিত্রে দেখানো যায়। এভাবে একই কম্বিনেশন যুক্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিটগুলিকে একত্রিত করে কৃষি অঞ্চল বার করা যায়।

3.4 ভারতের কৃষি অঞ্চল (Agricultural Regions of India) :

প্রথমেই বলে নেওয়া যাক কৃষি অঞ্চল কাকে বলে। ভূ-পৃষ্ঠের কোন অঞ্চলে ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, কৃষি প্রণালী (Farming practices) উৎপাদিত শস্য ও শস্য সংগঠন (Crop association) যদি এক প্রকৃতির হয় তবে ওই অঞ্চলটিকে **কৃষি অঞ্চল** (Agricultural region) বলে। ভারত ভূপ্রাকৃতিক, জলবায়ু, মৃত্তিকা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো প্রভৃতি বিষয়ে একটি বৈচিত্র্যময় দেশ। তাই ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের কৃষি প্রণালী, বিভিন্ন ধরনের শস্য, শস্য সংগঠনের ধরন (Crop association) ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। সেই কারণে ভারতে বহু ধরনের কৃষি অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে বৈচিত্রময় এই ভারতকে বিভিন্ন কৃষি অঞ্চলে বিভক্ত করা সহজসাধ্য নয়। কারণ কোন একটি বিষয়কে বা উপাদানকে ভিত্তি করে ভারতকে কৃষি অঞ্চলে বিভক্ত করা যায় না। নানাবিধ কৃষি উপাদানকে গ্রাহ্য করে ভারতকে কৃষি অঞ্চলে বিভক্ত করতে হয়।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে এম.এস. রান্ধাওয়া (1958), ডি. স্ট্যাম্প (1958), ও. এইচ. কে. স্পেপ (1960), রামচন্দ্রন (1963), পি. সেনগুপ্ত (1968), আর. এল. সিং (1971), জে সিং (1975) প্রভৃতি ভৌগোলিকগণের প্রচেষ্টা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (I.C.A.R.) ভারতকে ছয়টি প্রধান কৃষি অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন যেটি সহজবোধ্য ও বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অঞ্চলগুলির বর্ণনা নিচে দেওয়া হল :

ধান-পাট-চা অঞ্চল : আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা, মেঘালয়, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের তরাই অঞ্চল নিয়ে এই কৃষি অঞ্চলটি গঠিত। অঞ্চলটি প্রধানত নদীবিধৌত নিম্ন সমভূমি দ্বারা গঠিত। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 180 থেকে 250 সে. মিটারের মতো। পলিগঠিত মৃত্তিকা, গ্রীষ্মকালীন পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার জন্য ধানই প্রধান ফসল। পাট প্রধানত হুগলী উপত্যকা অঞ্চলে উৎপাদিত হয়। তবে আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, বিহার, তরাই সন্নিহিত উত্তরপ্রদেশ ও উড়িষ্যাতেও পাট চাষ হয়ে থাকে। চা উৎপাদিত হয় পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আসাম এবং ত্রিপুরায়। এছাড়া বিহারে উৎপন্ন হয় আখ ও তামাক। সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে চাষ হয় নারকেল। আম, আনারস, কাঁঠাল ও কমলালেবু প্রভৃতি ফলও এখানে উৎপন্ন হয়।

গম-আখ অঞ্চল : এই কৃষি অঞ্চলটি বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তর-পূর্ব রাজস্থান নিয়ে গঠিত। প্রায় সমগ্র অঞ্চলটিকে রয়েছে উর্বর পলিগঠিত মৃত্তিকা। তবে কিছু কিছু অঞ্চলে কৃষ্ণ ও লোহিত মৃত্তিকা দেখা যায়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে সমগ্র অঞ্চলটিতে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হয়। পরিমাণ 80-180 সে. মিটার। শীতকালে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে কিছু বৃষ্টিপাত ঘটে। কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে চাষ জলসেচের সাহায্যে চলে। গমই অঞ্চলের প্রধান ফসল। ভারতের প্রধান গম উৎপাদন অঞ্চলটি পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পূর্বরাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশের গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। আখ উৎপাদক অঞ্চলটিও উত্তরপ্রদেশ ও পূর্বদিকে বিহার রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্যান্য ফসলের মধ্যে রয়েছে ধান, ভুট্টা, ডাল ও তৈলবীজ।

তুলা অঞ্চল : তুলা অঞ্চলটি দাক্ষিণাত্যের মালভূমির কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। বৃষ্টিপাত মাঝারি থেকে অল্প। পরিমাণ 75-100 সে. মিটার। তুলা প্রধান ফসল হলেও এখানে জোয়ার, বাজরা, ছোলা, আখ ও গম উৎপাদিত হয়।

ভুট্টা ও কর্কশ (Coarse) শস্য অঞ্চল : পধানত পশ্চিম রাজস্থান, উত্তর গুজরাট এই কৃষি অঞ্চলটির

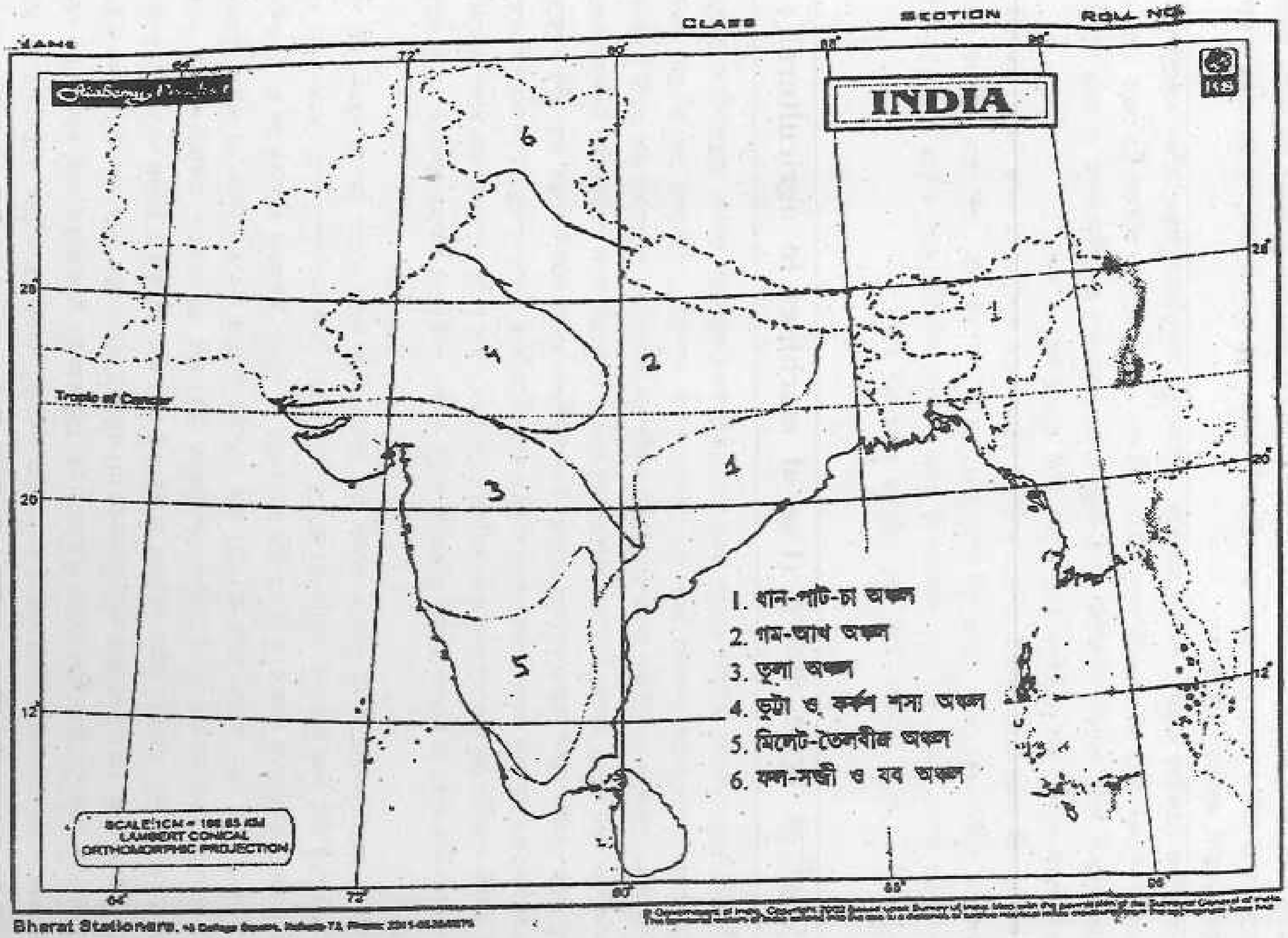
NAME
CLASS
SECTION
ROLL NO
INDIA
Tropic of Cancer
SCALE 1CM = 186.85 KM
LAMBERT CONICAL
ORTHOMORPHIC PROJECTION
1. ধান-পাট-চা অঞ্চল
2. গম-আখ অঞ্চল
3. তুলা অঞ্চল
4. ভুট্টা ও কর্কশ শস্য অঞ্চল
5. মিলেট-তৈলবীজ অঞ্চল
6. ফল-সব্জী ও যব অঞ্চল
Bharat Stationers

অন্তর্গত। এটি স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল। পরিমাণ 50 সে. মিটারের কম। ভুট্টা উৎপাদিত হয় মেবার অঞ্চলে। এখানে গম ও রাগীর চাষও হয়ে থাকে। অঞ্চলটির দক্ষিণাঞ্চলে ধান, তুলা ও আখ চাষ হয়। সমগ্র অঞ্চলের বাজরা ও ডাল অল্পবিস্তর উৎপন্ন হয়।

মিলেট ও তৈলবীজ অঞ্চল ঃ কর্নাটক মালভূমি, তামিলনাড়ুর মালভূমিময় অঞ্চল, দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কেরালার পূর্বাঞ্চল জুড়ে এই অঞ্চলটি গড়ে উঠেছে। বৃষ্টিপাত মাঝারি ধরনের। পরিমাণ 75 থেকে 125 সে. মিটার। বাজরা, রাগী, জোয়ার যা মিলেট নামে পরিচিত তা এখানে চাষ হয়। চিনাবাদাম বা রেড়ি তৈলবীজ হিসাবে প্রধান ফসল। ডালও উৎপন্ন হয়। ফলের মধ্যে রয়েছে আম ও কলা।

ফল ও সব্জী অঞ্চল ঃ এই অঞ্চলটি পশ্চিমে কাশ্মীর উপত্যকা থেকে পূর্বে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমদিকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 60 সে.মি. হলেও পূর্ব দিকে 200 সে.মি.। আপেল পীচ, চেরী, প্লাম, এপ্রিকট প্রভৃতি ফল পশ্চিম দিকের ফসল। পূর্বাঞ্চলে কমলালেবুই প্রধান। অন্যান্য ফসলের মধ্যে রয়েছে ধান, ভুট্টা, রাগী, আলু, লঙ্কা ও সব্জী। এখানকার বেশ কিছু জায়গায় যবের চাষ চলে।

3.5 কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার (Use of machines in agriculture) :

পশ্চিমী উন্নত দেশগুলি যে আজ কৃষিতে উন্নত তার একটি প্রধান কারণ হল কৃষিতে যন্ত্রের সঠিক ব্যবহার। মাটি খোঁড়ার কাজে ট্রাক্টর, জলসেচ দিতে জল তোলার কাজে পাম্পসেট, কীটনাশক দ্রব্য ছড়ানো স্প্রেইং মেশিন, ফসল তোলা ও ঝাড়াইয়ের কাজে হারভেস্টর প্রভৃতি হল কৃষিতে যন্ত্র ব্যবহারের এক একটি উপাদান। এমনকি বীজ বপন করতে আগাছা নিড়ানোর ক্ষেত্রেও যন্ত্র ব্যবহার হচ্ছে। এর ফলে যেমন জমির উৎপাদনশীলতা বেড়ে গেছে তেমনি চাষের সময়ও সংক্ষিপ্ত হয়েছে। উৎপাদনশীলতা বাড়ার জন্য কৃষকের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সময় সংক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য কৃষক নিজেকে অন্য অ-কৃষি কাজে নিয়োজিত করতে পারছে। উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রয়ের জন্য ও কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় বিক্রয়ের জন্য ব্যবসাবাণিজ্য বেড়ে গেছে। আর বেড়ে গেছে ব্যাঙ্কের সঙ্গে লেনদেন। উন্নত দেশগুলির মতো না হলেও ভারতে কৃষিকার্যে যন্ত্রের ব্যবহার স্বাধীনতার সময়ের তুলনায় বহুগুণ বেড়ে গেছে।

কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার যেমন কৃষিকে অনেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে তেমনি এই সব যন্ত্র ব্যবহারের কিছু কিছু কুফল বা অসুবিধাও রয়েছে বিশেষ করে উন্নতশীল দেশগুলিতে, যেমন—(1) যন্ত্র ব্যবহার একটি ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে যে পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয় তা উন্নতশীল দেশগুলির কৃষকরা বহন করতে পারে না। (2) কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে ন্যূনতম যে জমির পরিমাণ একটি কৃষকের থাকা দরকার তা উন্নতশীল দেশগুলিতে নেই। তাই যন্ত্র ব্যবহার অর্থনৈতিক দিক থেকে অলাভজনক। (3) শুধু মাথাপিছু জমির পরিমাণ যে কম তাই নয়। জমিগুলি ক্ষুদ্র ও বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তাই যন্ত্র ব্যবহার অসুবিধাজনক। (4) যন্ত্রপাতি খারাপ হয়ে গেলে সেগুলি মেরামত করার মতো কারিগরী বিদ্যাবুদ্ধি উন্নতশীল দেশের কৃষকের নেই। (5) যন্ত্রসমূহ অপেক্ষাকৃত ভারী হওয়ায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করতে নিয়ে যাওয়া দুষ্কর। তাই কৃষকেরা সহজে যন্ত্র ব্যবহার করতে চায় না। (6) কৃষি যন্ত্রপাতিসমূহ ওজনে ভারী ও আয়তনে বেশী হওয়ায় কৃষকের বাড়ীতে রাখার অসুবিধা। এই কারণেও

অনেক কৃষক যন্ত্র ব্যবহারে অনীহা পোষণ করে। (7) কৃষকরা অনেক সময় সংরক্ষণশীল হয়। বিশেষ করে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকরা। ফলে নতুন নতুন যন্ত্র ব্যবহার তাদের মনঃপুত নয়। (8) পাহাড়ী বা পার্বত্যময় অঞ্চলে ভারী ট্রাক্টর ব্যবহার করা যায় না।) কৃষি যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণে ও মেরামতিতে খরচ বেশী ইত্যাদি।

চাষের ক্ষেত্রে ট্রাক্টরের ব্যবহার ঃ কর্ষণের কাজে ট্রাক্টরের ব্যবহার ইদানীং যুগে একটি জনপ্রিয় ব্যবস্থা। উন্নত দেশগুলিতে ট্রাক্টরের ব্যবহারের ফলে শস্যের উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে গেছে। একটি কৃষক ট্রাক্টরের সাহায্যে কম সময়ে অনেক জমি কর্ষণ করার কারণে ওই কৃষক বড় বড় কৃষি খামার চালাতে পারে। ফলে কৃষক প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ বেশী। ট্রাক্টর ব্যবহারের অন্যান্য সুবিধাগুলি হল এর সাহায্যে মৃত্তিকার অনেক গভীর পর্যন্ত কর্ষণ করা যায়। যার ফলে জমিতে বেশী জল সংরক্ষণ করা যায়। এই পদ্ধতিতে জল সংরক্ষণ শুখা অঞ্চলে অধিক কার্যকরী। মৌসুমী প্রভাবিত দেশগুলিতে চাষের কাজ অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ করতে হয়। কারণ উপযুক্ত বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা যা ধানচাষের পক্ষে উপযুক্ত তা বছরে অল্প সময়েই পাওয়া যায়। বলদ টানা কাঠের লাঙ্গলে চাষ করলে সব জমি উপযুক্ত সময়ে চাষ করে ওঠা যায় না। ট্রাক্টরের সাহায্যে চাষ করলে এই সমস্যা থাকে না। কারণ প্রয়োজনের সময়ে ট্রাক্টরের সাহায্যে সেগুলিও চাষ করা সম্ভব।

ওই সকল কারণে ভারতে ট্রাক্টর ব্যবহার ক্রম জনপ্রিয়তা লাভ করছে। স্বাধীনতার সময় ভারতের ট্রাক্টরের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। এরপর এই সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে কৃষিতে অভূতপূর্ব সাফল্যের পিছনে ট্রাক্টরের প্রভাব অপরিসীম। ভারতের অধিকাংশ (শতকরা 70 ভাগ) ট্রাক্টর এই সকল অঞ্চলেই ছড়িয়ে রয়েছে। ধান, গম, আখ, তুলা প্রভৃতি চাষের ক্ষেত্রেই ট্রাক্টর অধিক ব্যবহৃত হয়। লক্ষ্যণীয় যে ভারতের যে সকল অঞ্চলে অধিক ট্রাক্টর ব্যবহৃত হয় সে সকল অঞ্চলই কৃষিতে সর্বাপেক্ষা উন্নত।

ট্রাক্টর ব্যবহারের ফলে ভারতীয় কৃষিতে যে পরিবর্তনগুলি এসেছে সেগুলি হল— (ক) যে সকল অঞ্চলে শস্য উৎপাদন হত না সেই সকল অঞ্চলে চাষ হচ্ছে। অর্থাৎ মোট কৃষিভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। (খ) ভারী এঁটেল মৃত্তিকার কারণে যে সকল অঞ্চলে চাষ হত না সে সকল অঞ্চলেও চাষ হচ্ছে। (গ) জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। (ঘ) দ্রুত চাষ সম্পন্ন হওয়ায় শ্রমিক কম প্রয়োজন হচ্ছে। (ঙ) একই জমিতে বছরে একাধিকবার চাষ সম্ভব হচ্ছে। ফলে শস্য চাষের নিবিড়তা (Cropping intensity) বেড়ে গেছে। (চ) খামার প্রতি বা অঞ্চল ভিত্তিতে উৎপাদন বেড়ে গেছে ইত্যাদি। কোন দেশে কতগুলি ট্রাক্টর চাষের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তা সেই দেশের মেকানাইজেশনের নিবিড়তার মাপকাঠির পরিমাপ হিসাবে পরিগণিত হয়।

অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি ঃ অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে পাম্পসেট, স্প্রেয়ার, হারভেস্টর, থ্রাসার বা শস্য মাড়াই করার যন্ত্র, বীজ বপন করার যন্ত্র ইত্যাদি। এদের মধ্যে পাম্পসেট বা জল তোলার যন্ত্র ও কীটনাশক দ্রব্য ছড়ানোর যন্ত্র অর্থাৎ স্প্রেয়ার অধিক ব্যবহৃত হয়। হারভেস্টর এর প্রচলন কম। হস্তচালিত থ্রাসারও বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

ট্রাক্টারের মতো এই সকল যন্ত্রপাতির ব্যবহারও ভারতে স্বাধীনতা লাভের সময়ে খুব কম ছিল। স্বাধীনতা লাভের পরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকে এদের দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে পাম্পসেট ও স্প্রেয়ার ব্যবহারের ক্ষেত্রে। ভারতে এইসব যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দিক থেকে উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি রয়েছে সর্বাগ্রে। অর্থাৎ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ ইত্যাদি। অন্যান্য প্রগতিশীল রাজ্যগুলি হল গুজরাট, মধ্য প্রদেশের পশ্চিমাংশ, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরীর বদ্বীপ অঞ্চল। বর্তমানে দানা শস্য ছাড়াও আম, আপেল, প্লাম, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছে কীটনাশক দ্রব্য ছড়াতে স্প্রেয়ার ব্যবহৃত হচ্ছে। কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র এ বিষয়ে অগ্রণী।

3.6 ভারতের কৃষি সমস্যা ও তাদের সমাধান (Agricultural problems in India and possible remedies) :

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারত একটি কৃষিপ্রধান দেশ হিসাবে পরিচিত। বর্তমানে কৃষিতে শতকরা 60 ভাগ শ্রমজীবী মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি দেশের মোট উৎপাদনের 29 ভাগ অংশ অধিকার করে। কৃষি শুধু যে মানুষের খাদ্য ও বস্ত্রের চাহিদা মেটায় তাই নয়, দেশের বহু শিল্প তাদের কাঁচামালের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। আবার কৃষি বহু শিল্পদ্রব্যের ক্রেতা। নানাবিধ কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করছে। সেই হিসাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি ভারতের শতকরা 70 ভাগের বেশী লোকের রুজি রোজগারের উৎস।

1947 সালে স্বাধীনতার পরে ভারতে কৃষিক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। ইতিমধ্যে ভারত খাদ্যে স্বয়ংভরতা লাভ করেছে। আধুনিক প্রযুক্তি সঠিকভাবে ব্যবহার করে জমির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। খাদ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যায় দেশ আজ অন্যের মুখাপেক্ষী নয়। তথাপি ভারত বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন। এদের মধ্যে কিছু আছে প্রাকৃতিক কারণজনিত, আর কিছু মানুষের সৃষ্টি। এগুলির মধ্যে মুখ্য কয়েকটি সমস্যার কথা আলোচিত হল ঃ

মৌসুমী জলবায়ুর প্রকৃতি ঃ ভারত মৌসুমীবায়ু অধ্যুষিত দেশ। দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমীবায়ুই ভারতের শতকরা 80 ভাগ বৃষ্টিপাতের উৎস যার উপর কৃষির সাফল্য অসাফল্য নির্ভর করে। কিন্তু মৌসুমীবায়ুর কারণে ভারতে শুধু বর্ষা ঋতুতেই বৃষ্টিপাত হয়। অন্য ঋতু প্রধানত শুষ্ক। তাই বর্ষা ঋতু ছাড়া অন্য ঋতুতে কৃষিকাজ প্রায় অসম্ভব। এর উপরে রয়েছে অধিক বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির সম্ভাবনা। অধিক বৃষ্টিতে দেখা দেয় বন্যা যা ফসল হানির কারণ। অনাবৃষ্টিতে হয় খরা। যার ফলে ফসল শুকিয়ে গিয়ে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। এটি একটি প্রাকৃতিক সমস্যা।

তাছাড়া সময়ে সময়ে ঘূর্ণিপাতের ফলে অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত, শিলাবৃষ্টি, কালবৈশাখীর ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কৃষিতে নিয়ে আসে অপূরণীয় ক্ষতি।

ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত জমি ঃ ভারত একটি জনবহুল দেশ। এ দেশের মোট কৃষি জমির পরিমাণ 142.1 মিলিয়ন হেক্টর হলেও অধিক জনসংখ্যার জন্য মাথাপিছু কৃষিজমির পরিমাণ বেশ কম। 1995-96 খ্রীষ্টাব্দে গড় জমির আয়তন ছিল 1.5 হেক্টর। ভারতে প্রচলিত উত্তরাধিকার আইনের জন্য জমির গড় আয়তন দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। ফলে ট্রাক্টর বা অন্য প্রকার কৃষি যন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি একটি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। ভারতের জনবিরল রাজ্যগুলিতে যেমন রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, কর্নাটক প্রভৃতি রাজ্যগুলিতে জমির গড় আয়তন বেশী হলেও জনবহুল রাজ্যগুলিতে যেমন পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যগুলিতে গড় জমির আয়তন খুবই কম।

আরও দেখা যাচ্ছে যে শতকরা 59 ভাগ কৃষি জমির আয়তন এক হেক্টরের নিচে। এক থেকে দুই হেক্টর বিশিষ্ট জমির শতকরা ভাগ 19 , শতকরা 13.2 ভাগ দুই থেকে চার হেক্টরের, শতকরা 7.2 ভাগ চার থেকে দশ হেক্টর বিশিষ্ট, আর মাত্র শতকরা 1.6 ভাগ দশ হেক্টরের বেশী আয়তনবিশিষ্ট।

শুধু যে মাথাপিছু জমির আয়তন কম তাই নয়। জমিগুলি খণ্ড খণ্ড এবং বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত। ফলে এক জমি থেকে অন্য জমিতে যাতায়াত করতে বা কৃষি যন্ত্রপাতি বহন করতে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন

হয়। ফসলের উপর দৃষ্টি দেওয়া বা যন্ত্র নেওয়াও যায় না। ফলে উৎপাদন হ্রাস পায়। জমির সীমানা নির্ধারণ করতে অযথা কিছু জমিও যায়। সরকারীভাবে জমি একত্রীকরণ করার প্রচেষ্টা শুরু হলেও তার অগ্রগতি শ্লথ। বিক্ষিপ্ত জমিগুলিতে জলসেচ দেওয়া বা সার ছড়ানো বা বীজ বপন করা শ্রমসাধ্য ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই সকল কারণে জমির উৎপাদনশীলতা কম। উৎপাদন ব্যয়বহুলও বটে। এটি ভারতের অন্যতম কৃষি সমস্যা।

উন্নতমানের বীজ ঃ ভারতে বিভিন্ন শস্য চাষে যে সকল বীজ ব্যবহৃত হয় তা উন্নতমানের নয়। আশানুরূপ উৎপাদন না হওয়ার এটিও একটি কারণ। উন্নতমানের যে বীজ দেশে পাওয়া যায় তার দাম অত্যধিক বেশী। সেই কারণে সাধারণ চাষীরা সেই বীজ ক্রয় করতে পারে না। উন্নতমানের বীজের অভাব ও দামের কথা চিন্তা [illegible] (NSC) 1963 খ্রীষ্টাব্দে সৃষ্টি করেন। এছাড়া 1969 খ্রীষ্টাব্দে সৃষ্টি করা হয় স্টেট ফার্মাস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া। 13টি স্টেট সিড কর্পোরেশনও এদের সঙ্গে যুক্ত হয়। ন্যাশনাল সিডস কর্পোরেশন 1993-94 খ্রীষ্টাব্দে 4.14 লক্ষ কুইন্টাল বীজ উৎপন্ন করেছে।

1966-67 খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ এদেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। ধান, গম, জোয়ার, বাজরা, রাগী, ভুট্টা প্রভৃতি ফসল এতে উপকৃত হচ্ছে। 1994 খ্রীষ্টাব্দে 745 লক্ষ জমিতে এগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। ভারত যে আজ খাদ্য শস্যে স্বয়ংভরতা লাভ করছে এর একটি প্রধান কারণ হল উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার।

সার ও কীটনাশক দ্রব্যের ব্যবহার ঃ দেখা গেছে যে ভারতে যুগ যুগ ধরে একই জমিতে চাষ হয়ে আসছে। এর ফলে মৃত্তিকার উর্বরাশক্তি উত্তরোত্তর হ্রাস পাচ্ছে। সেই কারণে ভারতে হেক্টর প্রতি ফলন খুব কম। কিছু গোবর সার ব্যবহার করা হলেও তার পরিমাণ যথেষ্ট নয়। তাছাড়া যে পলিগঠিত মৃত্তিকায় ভারতের অধিকাংশ ফসলের চাষ হয় সেই মৃত্তিকায় জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ এমনিতেই কম। রাসায়নিক সার ও উন্নতমানের জৈবসার ব্যবহার করে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। কিন্তু সমস্যা এই যে ওই সমস্ত সারের দামও বেশী। ফলে চাষীরা যথেষ্ট পরিমাণে সার ব্যবহার করতে পারে না। ভারতের গ্রামাঞ্চলে যে 650 মিলিয়ন টন ও শহরে 160 লক্ষ টন কমপোস্ট পাওয়া যায় তার সদ্ব্যবহারও করা হয় না।

সমাধান ঃ এই সমস্যার কথা মাথায় রেখে ভারত সরকার রাসায়নিক সারের উপর ভর্তুকি চালু করেছে যাতে চাষীরা কম দামে সার ক্রয় করতে পারে। তাই স্বাধীনতার পর থেকে দেশে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া রাসায়নিক সারের গুণগত মান বজায় রাখতে সারা দেশে 52টি কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও একটি সেন্ট্রাল ফার্টিলাইজার কোয়ালিটি কন্ট্রোল এবং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। এটি ফরিদাবাদে অবস্থিত। এর তিনটি আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে মুম্বাই, কলকাতা ও চেন্নাইয়ে।

আমাদের দেশে বিভিন্ন শস্যপ্রদানকারী উদ্ভিদ পোকামাকড়ের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে আশানুরূপ উৎপাদন হয় না। অর্থাৎ এদের আক্রমণে ফসলের এক তৃতীয়াংশ নষ্ট হয়ে যায়। এই অসুবিধা কীটনাশক দ্রব্য ব্যবহার করে দূর করা যায়। স্বাধীনতার সময়ে যেখানে কীটনাশক দ্রব্য একেবারেই ব্যবহার করা হত না সেখানে বর্তমানে এর ব্যবহার বহুগুণ বেড়ে গেছে। 1992-93 খ্রীষ্টাব্দে দেশে 2 লক্ষ টন কীটনাশক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়েছে। 1960 খ্রীষ্টাব্দে এর পরিমাণ ছিল মাত্র 8600 টন। এর ফলে কৃষি ফলন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এই দ্রব্য যথেচ্ছ ব্যবহার যাতে না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে কারণ এতে মৃত্তিকা ও জলের দূষণ বৃদ্ধি পায়।

জলসেচ ঃ ভারতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পর্যাপ্ত হলেও বছরের সব সময় বৃষ্টিপাত হয় না। বৃষ্টিপাত কেবলমাত্র বর্ষা ঋতুতেই ঘটে থাকে। তাছাড়া বর্ষণ দেশের সকল স্থানে সমানভাবে হয় না। বর্ষণও অনিশ্চিত। এতে অতিবৃষ্টিতে যেমন বন্যা হয়, তেমনি স্বল্পবৃষ্টিতে ফসলের হানি ঘটে। মোট উৎপাদন যায় কমে। তাই প্রয়োজনের সময়ে কৃত্রিম উপায়ে জলসেচ করলে ফসল ভাল হয়। ভারতে জলসেচ কৃষির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখানে জলসেচের সুবিধাও রয়েছে। বর্ষার জল জলাধারে ধরে রেখে শুখা সময়ে তা জমিতে দেওয়া যায়। নদী, হ্রদ, পুকুর, অন্যান্য জলাশয় থেকেও জল নেওয়া যায়। ভূ-গর্ভস্থ জলরাশি জলসেচের আরেকটি উৎস। সেচের জলের আরেকটি উৎস হল বরফগলা জল। হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদ-নদীগুলি গ্রীষ্মকালে প্রচুর বরফ গলা জল বয়ে আনে। সেই জল সহজেই সেচের কাজে ব্যবহার করা যায়।

পৃথিবীতে সেচযুক্ত জমির পরিমাণের দিক থেকে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। এখানে মোট কৃষি জমির শতকরা 33 ভাগ জমি সেচযুক্ত। সেচের সাহায্যে যেমন জমির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে তেমনি একই জমিতে বছরে দু তিনটি ফসল চাষ করা সম্ভব। খাদ্যে ভারত যে আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ তার একটি সেচব্যবস্থার অগ্রগতি, বিশেষ করে স্বাধীনতার পর থেকে।

এতদ্‌সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে যে ভারতে যতটা জমিতে জলসেচ দেওয়া সম্ভব ততটা জমিতে জলসেচ দেওয়া সম্ভব হয়না। এটি একটি সমস্যা। জলসেচের আরও একটি সমস্যা আছে তা হল পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত রাজ্যে অত্যধিক জলসেচের কারণে প্রধানত দুটি সমস্যা দেখা দিয়েছে, যথা— (১) ওই সকল রাজ্যে জমিতে লবণের পরিমাণ এতই বেড়ে গেছে যে শস্য চাষ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। (২) অত্যধিক জলসেচ করার ফলে ভূ-গর্ভস্থ জলের তল উত্থিত হয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে পড়েছে।

সমাধান ঃ জলসেচ সমস্যার সমাধান হিসাবে বলা যায় যে একদিকে যেমন চাষযোগ্য জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করতে হবে তেমনি জলসেচ করার ফলে জমি যাতে অনুর্বর হয়ে না পড়ে বা কৃষিজমি জলমগ্ন হয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ঃ ভারতের কয়েকটি রাজ্যে যেমন হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার হলেও ভারতের অধিকাংশ ক্ষেত্রে যন্ত্র ব্যবহারের চলন কম। যন্ত্র ব্যবহারের প্রধান অন্তরায় হল (ক) কৃষকের কম ক্রয়ক্ষমতা, (খ) কৃষি জমির কম আয়তন যেখানে যন্ত্র ব্যবহার অলাভজনক, (গ) টুকরো টুকরো ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কৃষিজমি, (ঘ) যন্ত্র ব্যবহারে অজ্ঞতা (ঙ) কৃষকের সাবেকী মানসিকতা ইত্যাদি। চাষের কাজে আজও কাঠের লাঙল ও সহজ যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে জমির উৎপাদনশীলতা কম। তথাপি বলতে হয় যে ভারতে কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার বহুগুণ বেড়ে গেছে। ট্রাক্টর, পাম্পসেট, ফসল ঝাড়াই করার যন্ত্রপাতি আজকাল হামেশাই চোখে পড়ে। হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে 1994 খ্রীষ্টাব্দে ভারতে 11 লক্ষের অধিক ট্রাক্টর ছিল; যন্ত্রচালিত লাঙল ছিল 53000 । তবে এদের শতকরা 70 ভাগই ছিল পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে। অবশ্য 1992-93 খ্রীষ্টাব্দে যে 8,642 টি যন্ত্রচালিত লাঙল বিক্রয় হয়েছে তার শতকরা 81 ভাগই হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, কর্নাটক, তামিলনাড়ু, কেরালা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে। স্বাধীনতার সময় এই সবের সংখ্যা ছিল নগণ্য।

কৃষি বাজার ঃ ফসলের উপযুক্ত দাম পাওয়া কৃষি উন্নতির একটি প্রধান শর্ত। কিন্তু ভারতের গ্রাম-গঞ্জে বিক্রয় ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। চাষীরা তাদের ফসল বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে স্থানীয় ব্যাপারী দালালদের

উপর নির্ভরশীল। ফসল তোলার সময় তারা কম দামে তাদের উৎপন্ন ফসল বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। কারণ এদের অধিকাংশই ফসল চাষের সময় চড়া সুদে ধার নেয়। আর ফসল তোলার সঙ্গে সঙ্গে সেই ধার শোধ করতে যে-কোন দামে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। ফসল ধরে রাখার যথেষ্ট সংস্থানও তাদের নেই। ফল হয় এই যে ঋণের দায়ে জর্জরিত চাষীরা চাষের কাজে যথেষ্ট লগ্নী করতে পারে না। উৎপাদন যায় কমে। কৃষির উন্নতি হয় ব্যাহত। উত্তরপ্রদেশের গম ও তৈলবীজ চাষে, পাঞ্জাবের তুলা চাষে, পশ্চিমবঙ্গের পাট চাষে এই অবস্থা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে মহাজন ফসল তোলার ঠিক আগে চাষীকে কিছু নগদ টাকা অগ্রিম হিসাবে দিল। পরিবর্তে পুরো ফসলটাই ওই মহাজন জমি থেকে তুলে নিলো। এই ব্যবস্থাকেই বলে দাদন। গবেষণায় দেখা গেছে ফসলের মোট মূল্যের শতকরা 48 থেকে 60 ভাগ এইভাবে দালালদের হাতে চলে গেছে। আরও দেখা গেছে যে যারা ভোগকারী তাদেরকেও বেশী দামে জিনিস কিনতে হচ্ছে।

কৃষকদের এই ব্যবস্থা দূরীকরণের জন্য সরকার কতকগুলি নিয়ন্ত্রিত বাজার খুলেছে যেখানে নির্দিষ্ট মূল্যে জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করা যায়। এই ব্যবস্থায় চাষীরা দালালদের শোষণের হাত থেকে কিছুটা হলেও রেহাই পায়। 1948 খ্রীষ্টাব্দে সারা দেশে এই ধরনের মূল বাজারের সংখ্যা ছিল 2045 টি এবং উপবাজারের সংখ্যা ছিল 3534 টি। সারা দেশে এই সংখ্যা অবশ্য মোট চাহিদার তুলনায় খুব কম। এদের কর্মপদ্ধতিও সন্তোষজনক নয়।

অপর্যাপ্ত মজুত ভাণ্ডার ঃ কেবলমাত্র ফসল মজুত করার ভাণ্ডারের অভাবে ফসল তোলার সময় চাষীরা ফসল কম দামে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। এমনকি নগদ মূল্যের তাগিদ না থাকলেও। এতে চাষীর লাভের পরিমাণ যায় কমে। পার্সে কমিটির রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে ফসল কাটার পরে ফসলের শতকরা 9.3 ভাগ ফসল নষ্ট হয়। তার মধ্যে মজুত ভাণ্ডারের অভাবে নষ্ট হয় শতকরা 6.6 ভাগ।

বর্তমানে কয়েকটি সংস্থা শস্য গুদামজাত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (F.C.I.) সেন্ট্রাল ওয়ারহাউসিং কর্পোরেশন (C.W.C), স্টেট ওয়ারহাউসিং কর্পোপেশন এইসকল কাজে নিযুক্ত। এরা উদ্বৃত্ত শস্য গুদামজাত করে রাখে যাতে করে অসময়ে ব্যবহার করা যায়। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার 1979-80 খ্রীস্টাব্দ থেকে ন্যাশনাল গ্রিড অফ রুরাল গোডাউন করেছে। এরা ছোট ও প্রান্তিক চাষীদের শস্য গুদামের কাজে নিয়োজিত। এই ভাবে গুদামজাত করার সমস্যার কিছুটা সামাল দিলেও এগুলি পর্যাপ্ত নয়। অর্থাৎ কৃষির উন্নতি অপর্যাপ্ত মজুত ভাণ্ডারের অভাবে মার খাচ্ছে।

পরিবহনের সমস্যা ঃ উদ্বৃত্ত কৃষি পণ্য গ্রাম থেকে বড় বড় বাজারে নিয়ে যাওয়ার জন্য উন্নত পরিবহনের প্রয়োজন। কিন্তু ভারতের গ্রামগুলির অধিকাংশই সড়কপথে যুক্ত নয়। পথগুলি কাঁচা। বর্ষাকালে যাতায়াতের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে পড়ে। ফলে চাষীরা তাদের ফসল স্থানীয় বাজারে বা হাটে কম দামে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। এতে চাষীদের লভ্যাংশ কমে যায়। কৃষিতে লগ্নী করার মতো মূলধন থাকে না। কৃষিব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিবহনের সমস্যার জন্য চাষীরা তাদের ভোগ্য পণ্যসমূহ চড়া দামে স্থানীয় বাজার বা হাট থেকে ক্রয় করতে বাধ্য হয়। এর ফলে তাদের মূলধন আরও কমে যায়। পরিবহন সমস্যা ভারতের একটি প্রধান সমস্যা।

মূলধনের অভাব ঃ বিশ্বায়নের যুগে সব কিছুতেই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যেতে হয়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে যথেষ্ট মূলধন বিনিয়োগ করতে হয়। সেই বিচারে কৃষি এখন একটি শিল্পের সমতুল্য। উন্নতমানের বীজ ক্রয়, যন্ত্রচালিত ট্রাক্টর, পাম্পসেট, রাসায়নিক সার, কীটনাশক দ্রব্য প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় খরচ বেড়ে গেছে। কিন্তু ভারতের অধিকাংশ চাষী দরিদ্র। দেনার দায়ে এমনিতেই জর্জরিত। কৃষিতে মূলধন লগ্নী করার ক্ষমতা তাদের সীমিত। বীজ বপন, পরিচর্যা এবং ফসল তুলতে কৃষককে চড়া সুদে ধার নিতে হয়। মোট লগ্নীর পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। ফলে লগ্নীর অভাবে জমির উৎপাদনশীতা খুব কম।

একজন চাষী প্রতি একর জমিতে যে পরিমাণ ফসল উৎপাদন করে, পশ্চিমী দেশগুলির তুলনায় তা অনেকগুণ কম।

স্বাধীনতার পরে গ্রামের স্থানীয় মহাজনরাই ঋণ দানের প্রধান উৎস ছিল অল ইণ্ডিয়া রুরাল ক্রেডিট সার্ভে কমিটি দেখিয়েছেন যে 1950-51 খ্রীষ্টাব্দে ঋণদানের শতকরা 680.6 ভাগই মহাজনরা দিয়েছিল। 1975-76 খ্রীষ্টাব্দে অবশ্য তা কমে দাঁড়ায় শতকরা 43 ভাগে। ঋণদানের এই অবস্থার অবশ্য আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, সওদাগরী ব্যাঙ্ক ও সমবায় ঋণদান সংস্থা এবং কিছু সরকারী সংস্থা সহজ কিস্তিতে চাষীদের ঋণদান করছে। এতে চাষীরা যথেষ্ট উপকৃত হচ্ছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় এটা খুবই কম। সরকারের আরও এগিয়ে আসা উচিত।

মৃত্তিকা ক্ষয় ঃ অবৈজ্ঞানিক ভাবে বৃক্ষছেদন বিশেষ করে ঢালু জমিতে, অতিরিক্ত পশুচারণ, ত্রুটিপূর্ণ ভূমি ব্যবহার, বেঠিক কৃষিপদ্ধতি অবলম্বন প্রভৃতি কারণে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে পাহাড়ী ও পার্বত্য অঞ্চলে মৃত্তিকার উপরিস্তর ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। অথচ ওই স্তরেই জৈবপদার্থ ও উদ্ভিদের খাদ্য মৌলের উৎস। এর ফলে জমির স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। কৃষি উন্নতির এটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধক বা সমস্যা।

3.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

A. বর্ণনামূলক প্রশ্ন ঃ

1. কৃষি ভূগোলের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।
2. কৃষি ভূগোলের ক্ষেত্র ও গুরুত্ব সম্বন্ধে যা জান বল।
3. কৃষি ভূগোলের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দাও।
4. ভারতে কৃষি ভূগোল পঠন-পাঠনের রূপরেখা বর্ণনা কর।
5. ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভন থুনেনের মতবাদ চিত্র সহযোগে সংক্ষেপে আলোচনা কর।
6. সিনক্লেয়ারের ভূমি ব্যবহার মডেলটি চিত্র সহকারে ব্যাখ্যা কর।
7. কৃষি উন্নতিতে ভৌত কারণসমূহ কি কি? এগুলি কৃষিকে কিভাবে প্রভাবিত করে?
8. কৃষিকার্যে জলবায়ুর প্রভাব কিভাবে অনুভূত হয়?
9. আর্থ সামাজিক কারণ বলতে কি বোঝ?
10. কৃষির উন্নতিতে আর্থ সামাজিক কারণগুলি কি কি? এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
11. জৈব রসায়ন ও কীটনাশক দ্রব্য প্রয়োগ কৃষিকে কিভাবে প্রভাবিত করে তার বিবরণ দাও।
12. ভূমি কাকে বলে? ভূমি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা হয় কেন? উদাহরণ দাও।
13. কৃষি অঞ্চলের ধারণা সম্বন্ধে যা জান লেখ।
14. কৃষি অঞ্চল নির্ধারণের যে-কোন দুটি কৌশলের বিবরণ দাও।

15. অভিজ্ঞতালব্ধ কৌশল কি? এর প্রধান প্রবক্তা কে? নীতিগুলি আলোচনা কর।
16. ভারতকে কয়টি কৃষি অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়? কি কি? অঞ্চলগুলির ধারণা দাও।
17. ভারতে কৃষির গুরুত্ব বর্ণনা কর।
18. ভারতের কৃষি সমস্যাগুলি কি কি? এদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
19. ভারতের কৃষিকার্যে প্রাকৃতিক সমস্যাগুলি কি কি? কিভাবে এগুলি কৃষিতে সমস্যা সৃষ্টি করে?
20. ভারতের ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত জমি কি ধরনের প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে? এগুলি সমাধানে কি ধরনের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে?

B. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

1. কৃষি ভূগোলের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি?
2. কৃষি ভূগোল পাঠের উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা কর।
3. কৃষি আজও মানব সভ্যতার মূল ভিত্তি কেন?
4. কৃষি ভূগোলের লক্ষ্য কি?
5. সভ্যতার প্রসারের সাথে সাথে কৃষি ভূগোল পাঠের ক্ষেত্র কিভাবে প্রসারিত হচ্ছে?
6. কৃষি ভূগোলে বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব কি?
7. পেরি আরবান অঞ্চলের ভূমি ব্যবহারের একটি প্রতিরূপ দাও।
8. শহরের ভূমি ব্যবহার সম্বন্ধে আলনসো'-এর মতবাদটি কি?
9. পেরি আরবান অঞ্চলে ভূমি অধিগ্রহণের সম্ভাবনা থাকলে কি কি ঘটনা ঘটবে?
10. এক উপাদান বৈশিষ্ট্য কৌশলের গুণাগুণ কি?
11. জে. সি. ওয়েভারের 'একত্রীভূত বিশ্লেষণ' (Combinational analysis) সম্বন্ধে যা জান লেখ।
12. ভারতকে কৃষি অঞ্চলে বিভক্ত করা সহজসাধ্য কেন?
13. কৃষি অঞ্চল নির্ধারণে আধুনিক পরিসংখ্যানগত কৌশল সম্বন্ধে যা জান লেখ।
14. কৃষিযন্ত্র ব্যবহারের সুফলগুলি কি কি?
15. কৃষিযন্ত্র ব্যবহারের সুবিধা অসুবিধাগুলি বর্ণনা কর।
16. কৃষিতে ট্রাক্টর ব্যবহারের সুফলগুলি কি কি?
17. পাঞ্জাব হরিয়ানা অঞ্চলে
18. সার ও কীটনাশক দ্রব্য ব্যবহার করে কৃষিতে কি ধরনের সাফল্য অর্জন করা গেছে?
19. উপযুক্ত বাজারের অভাব ভারতের কৃষিতে কি ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি করে। এর জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে?

20. কৃষিতে মজুত ভাণ্ডারের উপযোগিতা কি? মজুত ভাণ্ডার সমস্যা সমাধানের কাজে কারা এগিয়ে এসেছে?

21. কৃষিতে পরিবহনের সমস্যা সম্বন্ধে যা জান বল।

22. কি হিসাবে ভারতে আজ কৃষি একটি শিল্প?

23. ভারতে একক প্রতিফলন যে উন্নত দেশগুলির তুলনায় কম মূলধনের অভাব তার জন্য কতখানি দায়ী? মূলধনের অভাব দূর করার জন্য ভারতের কোন্ কোন্ সংস্থা এগিয়ে এসেছে?

24. পেরি আরবান অঞ্চল কাকে বলে?

25. পেরি আরবান অঞ্চলে জমি ব্যবহারের অবস্থা কেমন হয়?

26. পেরি আরবান অঞ্চল সম্বন্ধে তোমার মতামত কি?

27. সবুজ বলয় কি? এটি কতখানি চওড়া হতে পারে?

28. পেরি আরবান অঞ্চলের ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনশীল (dynamic) কি অর্থে?

29. কৃষির উন্নতিতে আমরা কি কি কারণের কথা চিন্তা করতে পারি?

30. নতিমাত্রা বলতে কি বোঝ? উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

31. উর্বর মৃত্তিকা কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

32. রায়তী স্বত্ব কী? এর গুণ—

33. রাষ্ট্রীয় মালিকানায় যে চাষ চলে তার সুফল ও কুফল বর্ণনা কর।

34. 'বর্তমানে কৃষি একটি মূলধনী কারবার' এ উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

35. সরকার কিভাবে কৃষিকে নিয়ন্ত্রণ করে?

36. জলসেচের সুবিধা থাকলে কৃষির উন্নতি কিরকম হয়?

37. পরিকল্পনা বলতে কি বোঝ? ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার প্রয়োজন কেন?

38. ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার ডাডলি স্ট্যাম্পের সংজ্ঞা কি?

BLOCK - 2

প্রাকৃতিক ভূগোল

একক 1 □ অঞ্চলের ধারণা ও পরিকল্পনার প্রকারভেদ

গঠন

1.1 অঞ্চলের ধারণা

1.2 অঞ্চলের ধারণায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী

1.3 অঞ্চলের প্রকারভেদ

1.4 বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনা

1.5 আঞ্চলিক পরিকল্পনার মূলনীতি

1.6 পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

1.7 পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

1.8 আঞ্চলিক পরিকল্পনার বিভিন্ন ধাপ

1.9 আঞ্চলিক পরিকল্পনা সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য তথ্য

1.10 স্থানিকতা তত্ত্ব

1.11 আলফ্রেড ওয়েবারের ন্যূনতম পরিবহণ ব্যয়তত্ত্ব **(Least Cost Location Theory of AlfredWeber)**

1.12 লসের পরিবর্তনশীল ক্রমপর্যায় তত্ত্ব **(Variable Hierarchy of Losch)**

1.13 ক্রিস্টলারের কেন্দ্রীয় স্থান তত্ত্ব **(Central Place Theory of Walter Christaller)**

1.14 বিকাশ মেরু তত্ত্ব **(Growth Pole Theory)**

1.0 অঞ্চলের ধারণা ও পরিকল্পনার প্রকারভেদ (Concept of regions and types of Planning.)

1.1 অঞ্চলের ধারণা ঃ ভূগোলে অঞ্চলের ধারণা একটি পরিবর্তনশীল ধারণা। নানা সময়ে বিভিন্ন ভূগোলবিদরা অঞ্চলের নানা রকমের সংজ্ঞা দিয়েছেন। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে Vidal de Lablache একই ধরণের ভূ-প্রকৃতি এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এলাকাকে পেজ (Pays) নামে চিহ্নিত করেন। Joerg অবশ্য কেবলমাত্র একইপ্রকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এলাকাকে অঞ্চল বলেছেন। A. J. Herbertson মনে করেছিলেন যে অঞ্চল হল একই প্রকার ভূমিরূপ, জলবায়ু, উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ সমৃদ্ধ এলাকা যেখানে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে একই ধরণের সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। B.A. Botkin মনে করতেন একই পরিবেশযুক্ত এলাকা যেখানে ভূগোলের বিভিন্ন উপাদানগুলি একটি নির্দিষ্ট সূত্রে আবদ্ধ থাকে।

অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ঃ উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে ভূগোলবিদ্‌রা যেভাবেই অঞ্চলকে সংজ্ঞায়িত করুন না কেন, অঞ্চলের নিম্নলিখিত কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে—

(i) অঞ্চলের নির্দিষ্ট অবস্থান থাকবে। সমবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান নির্দিষ্ট থাকবে।

(ii) অঞ্চলের সীমানা নির্দিষ্ট হবে। সমগ্র এলাকার মধ্যে মূল বৈশিষ্ট্যগুলি যে স্থান বরাবর ক্রমশঃ গুরুত্ব

হারাবে এবং তারপর থেকে অন্য বৈশিষ্ট্য প্রকট হতে থাকবে সেই স্থান বরাবর অঞ্চলের সীমানা চিহ্নিত করা যেতে পারে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমে দক্ষিণ গাঙ্গেয় সমভূমি শেষ হয়ে ছোটনাগপুর মালভূমির শুরু।

(iii) দুটি অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে পরিবর্তনশীল এলাকা থাকবে। পরিবর্তনশীল এলাকায় পার্শ্ববর্তী দুটি অঞ্চলেরই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকবে।

(iv) অঞ্চলগুলি বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব অনুযায়ী কয়েকটি ধাপে বিন্যস্ত থাকবে। যেমন গাঙ্গেয় সমভূমির একটি অংশ দক্ষিণ গাঙ্গেয় সমভূমি ; আর একটি অংশ হুগলী নদীর সমভূমি অঞ্চল ; তার মধ্যে হুগলী শিল্পাঞ্চল ইত্যাদি।

(v) অঞ্চলটির মধ্যে এক বা একাধিক ভৌগোলিক উপাদান সমান প্রাধান্য পাবে।

1.2 অঞ্চলের ধারণায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী

অঞ্চল সম্পর্কিত আলোচনায় দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটিশ ভূগোলবিদ্ John Glasson-এর মতে দুটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অঞ্চলকে আলোচনা করা যেতে পারে। অধ্যাত্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী (subjective view) এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী (objective view)। অধ্যাত্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী অঞ্চল হল ভৌগোলিকদের কাছে সমীক্ষায় সাহায্যকারী একটি ধারণা। বহুধা বিস্তৃত ভৌগোলিক উপাদানগুলিতে প্রয়োজনমত গুছিয়ে শ্রেণীবদ্ধ করার পদ্ধতি হল আঞ্চলিকীকরণ। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীপৃষ্ঠে এর কোন স্বাভাবিক অস্তিত্ব নেই। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে অঞ্চলের স্বাভাবিক অস্তিত্ব রয়েছে। অঞ্চল পরিবর্তনশীল এবং নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানা দ্বারা আবদ্ধ।

1750 সালে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে কিছু কিছু অঞ্চল সমীক্ষার কাজ শুরু হলেও এর প্রকৃত জন্মদাতা হলেন ফরাসী ভৌগোলিক Vidal de Lablache (1845-1918)। দক্ষিণ ফ্রান্সের পে নামক প্রদেশগুলির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিবেশে মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনধারা বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়ে উঠেছে। তিনি মনে করেন যে, অঞ্চলভিত্তিক এই বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করলেই মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক বিনিময়ের সম্পর্ক বোঝা যাবে। ব্রিটেনে Herbertson (1905), জার্মানীতে Alfred Hether (1927) আঞ্চলিক সমীক্ষার সমর্থক ছিলেন। হারবার্টসন ভূমিরূপ, জলবায়ু, উদ্ভিদ ও জনঘনত্বের উপর ভিত্তি করে পৃথিবীকে প্রধান পাঁচটি স্বাভাবিক অঞ্চলে বিভক্ত করেন। মেরু অঞ্চল, শীতল উপক্রান্তীয় অঞ্চল, উপক্রান্তীয় অঞ্চল, ক্রান্তীয় উষ্ণ অঞ্চল, নিরক্ষীয় অঞ্চল। এই পরিকল্পনায় জলবায়ু ও উদ্ভিদকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মানুষের ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপের ফলে বনভূমি ধ্বংস হয়ে কৃষিজমি বা পশুচারণভূমিতে পরিণত হয়েছে। উপরন্তু প্রতিটি স্বাভাবিক অঞ্চলের মধ্যে জীবনযাত্রার বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশ বর্তমানে আর মানুষের জীবনযাত্রাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে না। এই পরিস্থিতিতে অঞ্চলের আলোচনায় অধ্যাত্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী অধিক গুরুত্ব পেতে আরম্ভ করে।

এইভাবে স্বাভাবিক অঞ্চলের ধারণা বিতর্কের কেন্দ্র হয়ে পড়ায় অধ্যাত্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী চিন্তাধারার ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেতে থাকে। 1940 এ আমেরিকান ভূগোলবিদ Hartshorne বলেন যে পৃথিবীকে বোঝা ও ব্যাখ্যা করাই ভূগোলের মূল উদ্দেশ্য এবং এর জন্য আঞ্চলিক বিন্যাস প্রয়োজন হতে পারে। অর্থাৎ আঞ্চলিকীকরণ পৃথিবীপৃষ্ঠে বৈচিত্র্যকে বোঝা এবং ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মডেল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এর কোন

বাস্তব অস্তিত্ব নেই। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষ মাপকাঠি ব্যবহার করে আঞ্চলিকীকরণ করা যেতে পারে। যেমন, কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য মাপকাঠি হিসাবে মৃত্তিকা, জলবায়ু, কৃষিপদ্ধতি, কৃষকের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা, বাজারে কৃষিপণ্যের চাহিদা প্রভৃতিকে বেছে নেওয়া যেতে পারে। এইভাবে গঠিত অঞ্চলগুলির সীমানা স্থায়ী নয়। সময় এবং অবস্থাভেদে এইভাবে গঠিত অঞ্চলগুলি পরিবর্তিত হতে পারে। এমনকি একটি অঞ্চলের মধ্যে অপর একটি অঞ্চলের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

1.3 অঞ্চলের প্রকারভেদ

বিভিন্ন ভূগোলবিদ্ অঞ্চলকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। এজন্য অঞ্চলের শ্রেণীবিভাগ করার সময়ও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

R.P. Misra অঞ্চলের নিম্নরূপ শ্রেণীবিভাগ করেছেন—

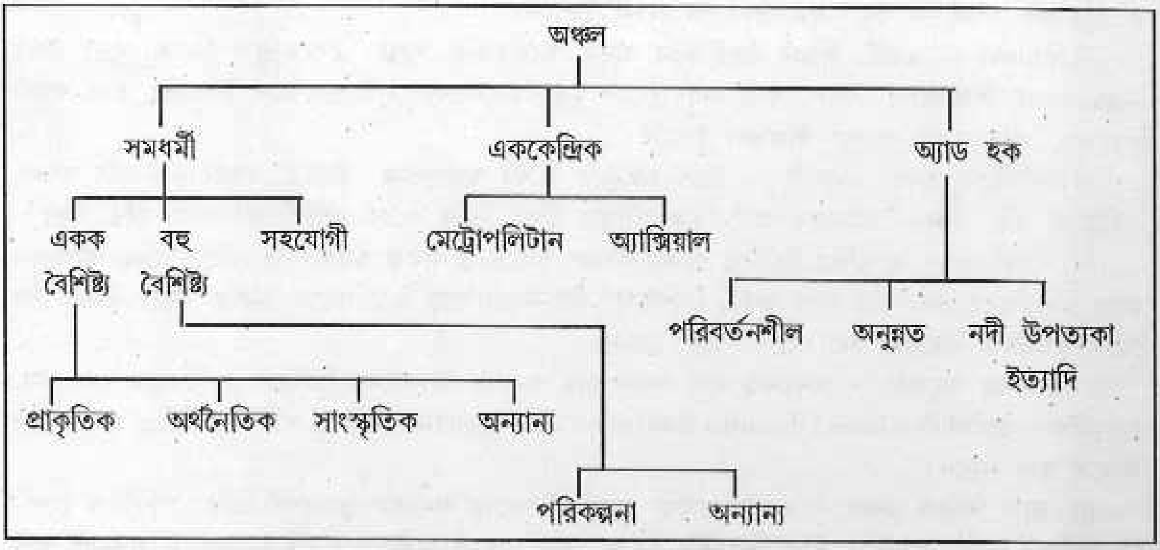

I সমধর্মী— অধিকাংশ ভূগোলবিদ্ অঞ্চলকে একটানা বিস্তৃত সমধর্মী স্থানগত একক (Spatial Unit) বলে বর্ণনা করেছেন। এই ধরণের অঞ্চল হল আকার বিশিষ্ট এবং এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যে সমতা আছে। এই প্রকার অঞ্চল আবার তিন ধরণের।

A. একক বৈশিষ্ট্য যুক্ত ঃ যখন কোন একটি বৈশিষ্ট্যের সমতার ভিত্তিতে আঞ্চলিক বিভাগ করা হয় তখন তাকে একক বৈশিষ্ট্য যুক্ত সমধর্মী অঞ্চল বলা হয়।

যেমন—

(i) প্রাকৃতিক অঞ্চল— যদি ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, স্বাভাবিক উদ্ভিদ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আঞ্চলিকীকরণ করা হয় তবে তাকে প্রাকৃতিক অঞ্চল বলে। যেমন জলবায়ুর ভিত্তিতে কোপেনের আঞ্চলিক বিভাগ। প্রাকৃতিক অঞ্চল নানা ধরণের হতে পারে।

a. ভূমিরূপের ভিত্তিতে— ভূমিরূপের গঠন, উচ্চতা, ভূ-প্রকৃতি, বয়স এবং উৎপত্তির ভিত্তিতে আঞ্চলিক বিভাজন করা যায়। যেমন, হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল। ভূমিরূপ অনেকসময় মানুষের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে।

b. জলবায়ু অঞ্চল— অক্ষাংশ নিয়ন্ত্রিত উষ্ণতার বণ্টন অনুযায়ী পৃথিবীকে উষ্ণ, নাতিশীতোষ্ণ এবং শীতল অঞ্চলে ভাগ করা যায়। আবার Koppen, Thorntwait এবং Miller উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত এবং তার প্রভাবের উপর ভিত্তি করে আঞ্চলিক বিভাজন করেছেন।

c. বায়ুপুঞ্জ ভিত্তিক— বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত বায়ুপুঞ্জ ও জলবায়ুর উপর তার প্রভাবের ভিত্তিতে পৃথিবীকে মেরু, মেরু-মহাদেশীয়, মেরু-সামুদ্রিক, ক্রান্তীয়-মহাদেশীয়, ক্রান্তীয়-সামুদ্রিক, নিরক্ষীয় এবং মৌসুমী অঞ্চলে ভাগ করা হয়।

(ii) অর্থনৈতিক — অর্থনীতির ভিত্তিতে অঞ্চল বিভাজনের পদ্ধতি ভূগোলে খুব জনপ্রিয়। এর মাধ্যমে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, প্রব্রজন, অনুন্নয়ন, অপুষ্টি প্রভৃতি সমস্যার উপর আলোকপাত করা সম্ভব হয়। বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল বিভাজন করা হয়।

(a) সম্পদের বণ্টন— প্রাকৃতিক সম্পদ সর্বত্র সমপরিমাণে পাওয়া যায় না। সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে এবং শিল্পোন্নয়নে তাদের ভূমিকা অনুযায়ী আঞ্চলিক বিভাগ করা যায়। যেমন মধ্যপ্রাচ্যের খনিজ তৈল উৎপাদক অঞ্চল।

(b) কৃষি অঞ্চল — ধান, গম উৎপাদক অঞ্চল ইত্যাদি।

(c) শিল্পাঞ্চল — একটি শিল্পের কেন্দ্রীভবন অথবা অনেকগুলি শিল্পের এককেন্দ্রিক বিকাশ দুয়ের উপর নির্ভর করেই শিল্পাঞ্চলের বিভাগ করা যায়। যেমন মুম্বই-আমেদাবাদ সুতীবস্ত্র বয়ন শিল্পাঞ্চল এবং হুগলী শিল্পাঞ্চল, আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল ইত্যাদি।

(d) অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী — উন্নত অর্থনীতি বিশিষ্ট অঞ্চলসমূহ, জীবিকা সত্বাভিত্তিক কৃষি অঞ্চল, বাণিজ্যিক কৃষি অঞ্চল— এইভাবে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করেও শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে।

(iii) সাংস্কৃতিক — সংস্কৃতির ভিত্তিতে আঞ্চলিকীকরণ চলতে যে সমস্ত জায়গায় সংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিকের মধ্যে মিল আছে এবং এর ফলে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবনযাত্রা গড়ে ওঠে তাকে চিহ্নিত করা। বিভিন্ন দিক থেকে আঞ্চলিক বিভাজন করা যেতে পারে। যেমন—

(a) জনঘনত্ব অনুযায়ী — জনঘনত্ব এবং জনসংখ্যার অন্যান্য উপাদানের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করা যায়। আমেরিকান ভূগোলবিদ্ Glenn Trewartha জনসংখ্যার বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে পৃথিবীকে বিভিন্ন মানবসম্পদ অঞ্চলে ভাগ করেন।

(b) ভাষা ভিত্তিক অঞ্চল — ভাষার পার্থক্য আঞ্চলিকীকরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। পৃথিবীকে ইন্দো-ইউরোপীয়, ইন্দো, ইরানীয়, চীনা-তিব্বতীয়-আফ্রো-এশীয়, অস্ট্রো-এশীয়, ভারতীয় এবং নিগ্রো—এই কটি প্রধান ভাষাভিত্তিক অঞ্চলে ভাগ করা যায়। ভারতের মধ্যে আবার গুজরাটি, পাঞ্জাবী, মারাঠী ইত্যাদি ভাষা অঞ্চল আছে।

(c) ধর্মীয় অঞ্চল — প্রধান ধর্মগুলি যেমন খ্রীস্টান, মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদির ভিত্তিতে আঞ্চলিক বিভাগ করা যায়।

(d) রাজনৈতিক — রাজনৈতিক সীমানা কোন স্বাভাবিক অঞ্চল না হলেও পরিকল্পনাকারদের এই আঞ্চলিক বিভাজন মানতেই হয়। অনেকসময় প্রাথমিকভাবে একই প্রকৃতি ও সম্পদের অংশীদার হয়ে এই প্রকার জীবনযাত্রা প্রণালী থাকলেও রাজনৈতিক সীমানা দুটি অংশের মানুষকে পৃথক করে দিতে পারে। ক্রমশঃ অর্থনৈতিক অবস্থা, সম্পদের বিভিন্নতা, সাংস্কৃতিক প্রসার প্রভৃতি নানা কারণে দুদেশের মানুষের জীবনযাত্রা ও কর্মধারা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। যেমন ভারতীয় উপমহাদেশে পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশ আছে। তাদের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মের মূলসূত্র এক হলেও রাজনৈতিক কারণে দেশগুলি পৃথক সত্বা হিসাবে গড়ে উঠেছে।

(iv) অন্যান্য — উপরোক্তগুলি ছাড়াও আরও অন্যান্য উপাদানের ভিত্তিতে আঞ্চলিক বিভাগ করা যায়। যেমন— মানসিক অঞ্চল। মানসিক গঠন, চিন্তাধারা অঞ্চল ভেদে পৃথক। একজন আমেরিকান যেভাবে চিন্তা করে একজন ভারতীয় সেভাবে করে না। আবার কোন দেশের পিতৃতান্ত্রিক কেউ বা মাতৃতান্ত্রিক ইত্যাদি।

B. বহু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে— অনেকগুলি উপাদানের সমন্বয়ে কোন অঞ্চলে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবনযাত্রা প্রণালী গড়ে উঠতে পারে। সুতরাং অনেকগুলি উপাদানের সমধর্মীতা আঞ্চলিকীকরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

(i) পরিকল্পনা অঞ্চল — আঞ্চলিক উন্নয়নের প্রয়োজনে অথবা আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার জন্য একটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আঞ্চলিক বিভাজন সবসময় যুক্তিযুক্ত হয় না। এক্ষেত্রে সমগ্র ক্ষেত্রটির প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থনৈতিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সবই অনুধাবন করা প্রয়োজন। কোন একটি বিশেষ লক্ষ্য পুরণের জন্য যে সকল বৈশিষ্ট্য জানা থাকা দরকার সেগুলির ভিত্তিতে আঞ্চলিক বিভাজন করলে তাকে পরিকল্পনা অঞ্চল বলে। যেমন, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা অঞ্চল প্রভৃতি।

(ii) বাস্তুতন্ত্রের ভিত্তিতে— পরিবেশের জড় পদার্থ ও প্রাণী এবং উদ্ভিদ পরস্পরের সঙ্গে অভিযোজনের মাধ্যমে যে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করে তার ভিত্তিতে আঞ্চলিক বিভাজন করা যায়। যেমন, জলাভূমি, বনভূমি প্রভৃতি। বাস্তুতান্ত্রিক আঞ্চলিক বিভাগের মাধ্যমে কোন অঞ্চলে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী তাদের পরিবেশের সঙ্গে যে জটিল সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে তা বোঝা যায়।

c. সহযোগী অঞ্চল (Compage)—Darwent Whittlesey 1956 সালে আফ্রিকার দঃ রোডেশিয়ায় গবেষণা করে দেখেন যে অঞ্চল প্রকৃতপক্ষে বহু বৈচিত্র্যে পূর্ণ বিভিন্ন উপাদানের জটিল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠে। তাই তিনি বহু বৈশিষ্ট্যযুক্ত পূর্ণাঙ্গ অঞ্চল চিহ্নিত করেন। একে তিনি Compage বা আঞ্চলিক সহযোগ নাম দেন। কোন অঞ্চলের বহু বৈশিষ্ট্যের একত্র অবস্থান এবং তাদের পারস্পরিক বিনিময় ভিন্ন ধরনের এক নতুন বৈশিষ্ট্যের জন্ম দেয়। একে তিনি আঞ্চলিক সহযোগ বলেছেন।

II এককেন্দ্রিক অঞ্চল — আঞ্চলিকীকরণের অন্যতম ভিত্তি হিসাবে ক্ষেত্র সংযোগ (areal linkage) বা পারস্পরিক যোগাযোগকে ধরা যেতে পারে। যোগাযোগ ব্যবস্থার গভীরতা এবং বিস্তারের ফলে বিভিন্ন স্থানের মধ্যে সংযোগ গড়ে ওঠে এবং সমগ্র স্থানটি একটি বা কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এককে পরিণত হয়। এই অঞ্চলের একটি কেন্দ্র থাকে যাকে ঘিরে অঞ্চলটির কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়। এককেন্দ্রিক অঞ্চল দু প্রকার।

(i) মেট্রোপলিটান অঞ্চল— যখন একটি প্রধান গ্রন্থিকে কেন্দ্র করে সমগ্র অঞ্চলটির কার্যকলাপ গড়ে ওঠে তখন তাকে মেট্রোপলিটান অঞ্চল বলে। একটি বড় শহর, শিল্পকেন্দ্র গ্রন্থিকেন্দ্র হিসাবে তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে। চারদিক থেকে বিভিন্ন রাস্তা এসে ঐ গ্রন্থিকেন্দ্রে মেশে এবং পৃথক বৈশিষ্ট্যযুক্ত অঞ্চলগুলির সঙ্গে কেন্দ্রে অবস্থিত শহরটির অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়। (ii) Axial— পরিবহণ পথের দুধারে এই অঞ্চল গড়ে ওঠে। C. ad hoc অঞ্চল — একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যেমন জল সম্পদ, খনিজ সম্পদ প্রভৃতি আহরণের জন্য সাময়িকভাবে অস্থায়ী ভিত্তিতে যে অঞ্চল বিভাজন করা হয় তাকে ad hoc অঞ্চল বলে। এক্ষেত্রে বিশেষ একটি বা একাধিক কার্য আঞ্চলিক সংযোগ হিসাবে কাজ করে।

(i) পরিবর্তনশীল অঞ্চল — পৃথিবীর এক অংশ থেকে অপর অংশে ভৌগোলিক তারতম্য আছে কিন্তু তা হঠাৎ করে বদলায় না। একটি বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে হ্রাস পায় এবং অন্য একটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মাঝখানে কোথাও এই পার্থক্য সুস্পষ্ট সীমারেখা দ্বারা আবদ্ধ নয়। সুতরাং অঞ্চলগুলির মধ্যে কোন স্বাভাবিক সীমানা নেই ভৌগোলিক তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ করেন। এইভাবে সব অঞ্চলই প্রকৃত অর্থে পরিবর্তনশীল।

(ii) অনুন্নত অঞ্চল — উন্নয়নের মাত্রাকে মাপকাঠি ধরে একটি অঞ্চলকে তার পারিপার্শ্বিক অঞ্চল থেকে পৃথক করা যায়। আঞ্চলিক উন্নয়নের স্বার্থে অথবা কোন বিশেষ লক্ষ্য পূরণের জন্য পরিকল্পনা করতে গেলে এভাবে আঞ্চলিকীকরণ করা যেতে পারে। যেমন, রেল লাইনের দুপাশের ঝুপড়ি অঞ্চল, খালপাড় সংলগ্ন বস্তি অঞ্চল ইত্যাদি।

(iii) নদী উপত্যকা ইত্যাদি — ফরাসী ভৌগোলিক Le Play দেখেন যে একটি পাহাড়ের ঢালে উচ্চতার পার্থক্যের জন্য ভূমি ব্যবহারের পার্থক্য ঘটে। পাহাড়ের চূড়ায় পশুচারণ, খাড়া ঢালে বনজ সম্পদ সংগ্রহ, নীচের অপেক্ষাকৃত কম ঢালে পশুচারণ ও কৃষি কাজ করা হয়। নদী উপত্যকার চওড়া অংশে কৃষিকার্য ও কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে ওঠে। এগুলির সংগ্রহ ও বন্টন কেন্দ্র হিসাবে শহর তৈরী হয়। অর্থাৎ ঢালের প্রতিটি অংশ অপরটির সাথে কার্যসূত্রে সম্পর্কিত। এইভাবে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে আঞ্চলিক বিভাজন করা যেতে পারে। (চিত্র 1.1)

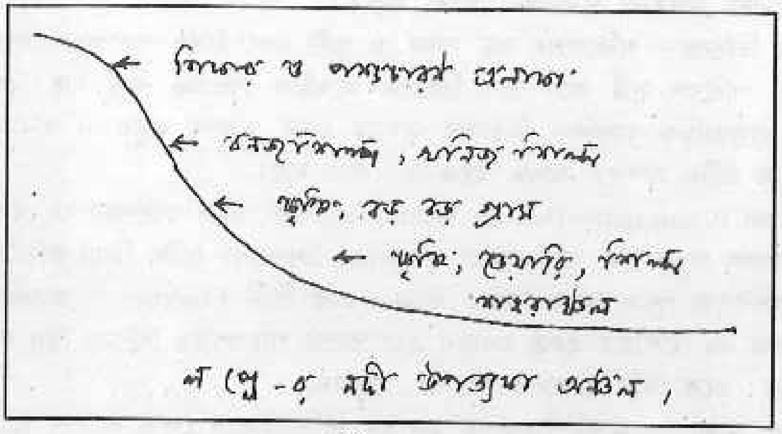

(চিত্র 1.1)

অঞ্চলকে আবার বাহ্যিক এবং ক্রিয়ামূলক এই দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। (চিত্র 1.2)

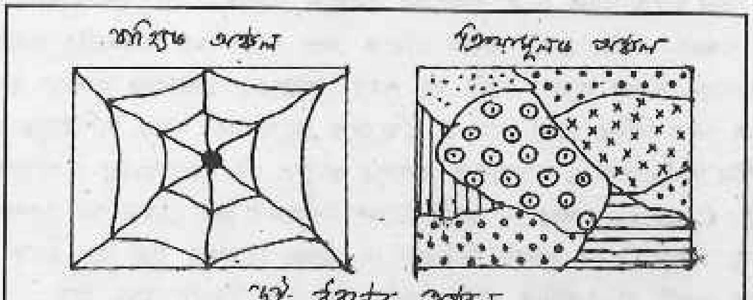

(চিত্র 1.2)

A. বাহ্যিক (Formal) অঞ্চল — যে অঞ্চলের সর্বত্র একই ধরণের বৈশিষ্ট্য সমানভাবে বিরাজ করে তাকে বাহ্যিক অঞ্চল বলা হয়। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক ও আর্থিক নির্ণায়ক বিষয়গুলি অঞ্চল চিহ্নিতকরণের ভিত্তি হিসাবে ধরা হয়। বাহ্যিক অঞ্চলের সীমানা নির্দিষ্ট এবং প্রতিটি অঞ্চল অপরটির থেকে সুনির্দিষ্টভাবে পৃথক, কোথাও পরস্পরকে অতিক্রম করে না। বাহ্যিক অঞ্চল নানা প্রকার—

(i) প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক অঞ্চল। যেমন, হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল।

(ii) কৃষি অঞ্চল — স্ট্যাম্প ও বীভার বৃটেনের উনিশটি কৃষি অঞ্চল নির্ধারণ করেছিলেন। যেমন, পশ্চিম ওয়েলস্-এর গম চাষ এলাকা ইত্যাদি।

(iii) শিল্পাঞ্চল — প্রাকৃতিক সম্পদগুলির উপর নির্ভর করে শিল্প গড়ে ওঠে— এই ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শিল্পাঞ্চলের ভাগগুলি করা হয়েছে। যেমন, আসানসোল-রাণীগঞ্জ শিল্পাঞ্চল (কয়লা নির্ভর), হুগলী শিল্পাঞ্চল (পাট ও বাণিজ্য নির্ভর) ইত্যাদি।

(iv) অর্থনৈতিক — পরবর্তীকালে ক্রমশঃ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নির্ধারকগুলি প্রাধান্য পেতে থাকে। যেমন, আয়ের স্তর, অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার প্রভৃতি। স্মিথ বৃটেনকে অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য অঞ্চলে ভাগ করেছেন। যেমন, উন্নত অঞ্চল ও উন্নয়নশীল অঞ্চল ইত্যাদি।

(v) রাজনৈতিক — রাজনৈতিক মতাদর্শ, ভোটদানের প্রবণতা প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে আঞ্চলিক বিভাজন করা হয়েছে। যেমন, সমাজতান্ত্রিক অঞ্চল, গণতান্ত্রিক অঞ্চল ইত্যাদি।

কিন্তু এভাবে বাহ্যিক অঞ্চল বিভাজন সমস্যার উর্দ্ধে নয়। প্রথমতঃ, বিভিন্ন মাপকাঠির ভিত্তিতে চিহ্নিত বাহ্যিক অঞ্চলের সর্বত্র ঐ সকল বৈশিষ্ট্য সর্বত্র সমানভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। স্থানীয় স্তরে পার্থক্য থাকে। যেমন মালভূমি অঞ্চলের মধ্যে উচ্চতার পার্থক্য ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ, বাহ্যিক অঞ্চলের সীমানা যেহেতু নির্দিষ্ট, সেহেতু পাশাপাশি অবস্থিত দুটি বাহ্যিক অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্যগুলিকে প্রকট করে দেখানো হয়। যেমন, Spate-এর ভারতীয় উপমহাদেশের আঞ্চলিক বিভাজনে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি অঞ্চল উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি এবং পাঞ্জাব সমভূমির মধ্যে পার্থক্যগুলিকেই তুলে ধরা হয়েছে।

B. ক্রিয়ামূলক — এই সকল সমস্যা এড়াতে সাম্প্রতিক কালে ক্রিয়ামূলক অঞ্চল গঠনের উপরই জোর দেওয়া হয়। অনেকগুলি ছোটবড় এলাকা নিয়ে একটি ক্রিয়ামূলক অঞ্চল গড়ে তোলা হয় যার মধ্যে এলাকাগুলি বিভিন্ন কাজকর্মের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। ক্রিয়ামূলক অঞ্চলের মধ্যে যে নানা ধরণের ভিন্নধর্মী এলাকাগুলি রয়েছে সেগুলির মধ্যে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য থাকার দরুণ তারা প্রয়োজনে একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। রাস্তাঘাটের সংযোগ এই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত এলাকাগুলির মধ্যে সম্পদের সংবাহী হিসাবে কাজ করে। ক্রিয়ামূলক অঞ্চলে অনেকক্ষেত্রে একটি প্রধান শহর বা বাণিজ্যকেন্দ্র গ্রন্থিকেন্দ্র অঞ্চলের (nodal region) ভূমিকা পালন করে। ওই শহরটির মাধ্যমে সমগ্র অঞ্চলটির ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হয়।

Von Thunen-এর ভূমিব্যবহার সংক্রান্ত মডেল এই ধরণের ক্রিয়ামূলক অঞ্চলের উদাহরণ। কেন্দ্রে থাকে একটি শহর যাকে ঘিরে বিভিন্ন বলয়ের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজকর্ম গড়ে ওঠে। বলয়গুলির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আলাদা হলেও কার্যসূত্রে তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ প্রতিটি বলয় একেকটি বাহ্যিক অঞ্চল কিন্তু সামগ্রিকভাবে সবকটি মিলে একটি ক্রিয়ামূলক অঞ্চল গড়ে তুলেছে। (চিত্র 1.3)

(চিত্র 1.3)

ক্রিয়ামূলক অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য— ক্রিয়ামূলক অঞ্চলে প্রাকৃতিক পরিবেশ আর্থসামাজিক ক্রিয়াকলাপের আধার এবং প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগানদার হিসাবে বিবেচিত হয়। ফলে বাহ্যিক অঞ্চলগুলি যেমন নির্দিষ্ট সীমা দ্বারা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন ক্রিয়ামূলক অঞ্চল তেমনি পরস্পরের সঙ্গে কার্য সম্পর্কে সংযুক্ত। এমনকি একটি আরেকটিকে অধিক্রমণ করে যেতে পারে। তবে ক্রিয়ামূলক অঞ্চল চিহ্নিতকরণেরও সমস্যা রয়েছে। এর সীমানা নির্দেশ করা কঠিন। একটি ক্রিয়ামূলক অঞ্চলের অন্তর্গত সব বাহ্যিক অঞ্চলের পরস্পর নির্ভরতার মাত্রাও এক নয়।

তা সত্ত্বেও বর্তমানে ক্রিয়ামূলক অঞ্চলের ধারণাই অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। বৃটিশ পরিকল্পনাকার Ebeneczer Howard ক্রিয়ামূলক অঞ্চলের উপর জোর দিয়েছেন। Patrick Geddes স্থান, ক্রিয়া ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক একটি ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দুর উপর প্রতিস্থাপন করেছেন। বৃটিশ ভৌগোলিক Dickinson তাঁর গবেষণায় লীডস শহর থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র কতদূর পর্যন্ত প্রচারিত হয় তার মাধ্যমে ক্রিয়ামূলক অঞ্চল চিহ্নিত করেছেন। এইভাবে নানা সময়ে টেলিফোন সংযোগের বিস্তার, বাস সার্ভিসের সংখ্যা ও সময়ের ব্যবধান ইত্যাদি নানা মাপকাঠির ভিত্তিতে ক্রিয়ামূলক অঞ্চল চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা হয়েছে।

অঞ্চলকে আবার আয়তনের ভিত্তিতে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—Macro, Meso এবং Micro region. কোন অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিধি অনুযায়ী নানা ধরণের উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা নেওয়া হয়। তাই অঞ্চল বিভাজনের ক্ষেত্রে আয়তন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারক।

A. Macro region—একটি বৃহৎ বা মুখ্য ভৌগোলিক অঞ্চলকে Macro region বলে। এই অঞ্চলের মধ্যে স্থানীয় ভিত্তিতে বৈষম্য থাকলেও প্রধান প্রাকৃতিক আর্থ সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি একই প্রকার থাকে। সাধারণতঃ পরস্পর সংলগ্ন এক ধরণের পরিবেশ ও সমস্যা যুক্ত কয়েকটি রাজ্য নিয়ে Macro অঞ্চল গঠন করা হয়।

যেমন, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ—এই তিনটি পার্শ্ববর্তী রাজ্য নিয়ে গঠিত গঙ্গা সমভূমি। এর প্রাকৃতিক পরিবেশের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি একই প্রকার। মানুষের জীবনধারা কমবেশী এক, সমস্যাও একই রকম।

B. Meso region— কিন্তু এই মুখ্য ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিতর বহু অমিলও রয়েছে। অমিলগুলির ভিত্তিতে Macro অঞ্চলটিকে কয়েকটি উপমুখ্য অঞ্চলে ভাগ করলে তাকে Meso অঞ্চল বলে। আভ্যন্তরীণ সম্পদ ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন ঘটানোর জন্যই Macro অঞ্চলকে Meso অঞ্চলে ভাগ করা হয়। যেমন, গঙ্গা সমভূমিকে আবার উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন গঙ্গা অংশে ভাগ করা হয়েছে। সাধারণতঃ কয়েকটি পার্শ্ববর্তী জেলা নিয়ে Meso অঞ্চল গঠিত হয়। জেলাগুলি এক রাজ্যের অথবা পার্শ্ববর্তী রাজ্যেরও হতে পারে।

C. Micro region— স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের তারতম্যের ভিত্তিতে Meso অঞ্চলকে ক্ষুদ্রতর উপবিভাগে ভাগ করা হয়। Micro অঞ্চলের মধ্যে সমধর্মীতা বজায় থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। এর সমস্যাও একই প্রকার এবং সার্বজনীন হবে। এই অঞ্চলগুলি তৃণমূল স্তরের এবং উন্নয়নমুখী পরিকল্পনাগুলি এই স্তর থেকেই শুরু হয়। Micro অঞ্চল তিন ধরণের— গ্রন্থিকেন্দ্রিক (nodal), গ্রামীণ (rural) এবং সমস্যা সংকুল অঞ্চল (Problem area)। উদাহরণস্বরূপ যথাক্রমে— মেট্রোপলিটান অঞ্চল, পঞ্চায়েত এলাকা এবং খরা প্রবণ অথবা বন্যা প্রবণ অঞ্চল ইত্যাদি।

1.4 বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনা

পরিকল্পনা হল এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে সমাজ পূর্বনির্ধারিত উন্নয়নের লক্ষ্যে ধাবিত হয়। পরিকল্পনা নানা লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত হতে পারে। তার জন্য প্রথমেই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য স্থির করে তারপর তার অধীনে এলাকা এবং জনসংখ্যা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এর পরবর্তী পর্যায়ে রয়েছে পরিকল্পনা রূপায়ণের পদ্ধতি নির্ধারণ ও তার প্রয়োগ। এই সবগুলিকে একত্রে ভিত্তি ধরে পরিকল্পনাগুলিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়।

(i) আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা

(ii) অন্তর্দেশীয় পরিকল্পনা এবং

(iii) অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা

(i) আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা (Global International Planning)—বর্তমানে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোন দেশের পক্ষেই স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন প্রকার সম্পদের জন্য বিভিন্ন দেশকে পরস্পরের উপর নির্ভর করতে হয়। শুধু তাই নয়, উৎপাদিত পণ্য, কারিগরি বিদ্যা, মেধাসত্বের আদান প্রদান প্রভৃতি কারণে পরস্পর নির্ভরশীলতা ক্রমবর্ধমান। অধিকাংশ আন্তর্জাতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হল সম্পদ সংগ্রহ, বণ্টন ব্যবস্থা, কৃষি, শিল্প, পরিকাঠামোর উন্নতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং মানবসম্পদের বিনিময়। উদাহরণস্বরূপ ASEAN, SAARC, COMMONWEALTH COUNTRIES, EUROPEAN UNION প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই ধরণের বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক সংস্থা অনেক সময় যৌথ স্বার্থও ভালভাবে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু যদি এজাতীয় সঙ্ঘের নির্দিষ্ট সাধারণ উদ্দেশ্য না থাকে তবে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। যেমন, UAR (মিশর ও সিরিয়ার মিলিত প্রয়াস) পরিকল্পনার লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার জন্য জোট ব্যর্থ হয়ে গেছে।

(ii) অন্তর্দেশীয় পরিকল্পনা—একটি দেশের অভ্যন্তরে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার জন্য এই ধরণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সাধারণত ; Macro অঞ্চলের জন্য যেমন, পাকিস্তানের ক্ষেত্রে প্রভিন্স, ভারতের

ক্ষেত্রে রাজ্য ভিত্তিক পরিকল্পনা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই প্রকার পরিকল্পনায় অগ্রগতি কিছুটা ধীর হলেও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে।

(iii) অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা—অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা দুধরণের—

a. একটি গোষ্ঠী অথবা অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা—একটি অঞ্চল অথবা একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গোষ্ঠীর জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। এই ধরণের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে জীবনযাত্রার মানের উন্নতি। পরিবেশের উন্নয়নের পরিকল্পনাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

b. স্থানীয় Micro অঞ্চল ভিত্তিক পরিকল্পনা—এই ধরণের পরিকল্পনা মূলতঃ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। স্বনির্ভরতা এবং স্থানীয় সম্পদের উন্নয়ন ও সুষ্ঠ বন্টন এজাতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

1. অঞ্চল কাকে বলে? কি কি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অঞ্চল বিভাজন করা যায়?
2. অঞ্চলের ধারণায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা কর।
3. অঞ্চলের ধারণায় অধ্যাত্মীয় ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনামূলক আলোচনা কর।
4. বিভিন্ন প্রকার অঞ্চল সম্বন্ধে উদাহরণসহ আলোচনা কর।
5. বাহ্যিক ও ক্রিয়ামূলক অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।
6. পরিকল্পনার প্রকারভেদ সম্বন্ধে উদাহরণসহ আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1. সমধর্মী অঞ্চল কাকে বলে? কি কি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সমধর্মী অঞ্চল বিভাজন করা হয়?
2. অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অঞ্চল বিভাজনের পদ্ধতিগুলি উদাহরণসহ আলোচনা কর।
3. আয়তনের ভিত্তিতে অঞ্চলকে কিভাবে ভাগ করা যায় উদাহরণসহ আলোচনা কর।
4. পরিকল্পনা কি?
5. আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা গ্রহণকারী এজেন্সীগুলির নাম কর।

উত্তরমালা ঃ

1. 1.1. অংশ দেখুন।
2. 1.2 অংশ দেখুন।
3. 1.2 অংশ দেখুন।
4. 1.3 অংশ দেখুন।
5. 1.3 এর বাহ্যিক ও ক্রিয়ামূলক অঞ্চলের অংশ দেখুন।
6. 1.4 অংশ দেখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ

1. 1.3-এর সমধর্মী অঞ্চলের অংশ দেখুন।
2. 1.3-এর অংশ দেখুন।
3. 1.3-এর অংশ দেখুন।
4. 1.4-এর অংশ দেখুন।
5. 1.4-এর অংশ দেখুন।

1.5 আঞ্চলিক পরিকল্পনার মূল নীতি

পরিকল্পনা বলতে আমরা একটি সুপরিকল্পিত পদ্ধতিকে বুঝি যার ফলে দেশ ও সমাজ উপকৃত ও উন্নত হয়। প্রকৃত পক্ষে পরিকল্পনা হল উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছনোর উপায়। অভীষ্ট সাধনের জন্য সমগ্র বিষয়টি অনেকগুলি ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে প্রতিটির জন্য এক বা একাধিক লক্ষ্য স্থির করা হয়। এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর কি কি উপায় থাকতে পারে এবং সেগুলির মধ্যে কোনগুলি সবচেয়ে উপযুক্ত তা বাছাই করা হয়। অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কি কি রসদ প্রয়োজন এবং সেগুলি কোথা থেকে, কিভাবে সংগৃহীত হবে তাও পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট করতে হয়। লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা, লক্ষ্যে পৌঁছনোর উপায় স্থির করা এবং শেষপর্যন্ত পরিকল্পনা রূপায়ণের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটির তদারক করা— এগুলি সবই আঞ্চলিক পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়ক্রমের অন্তর্ভুক্ত। আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনার চিন্তাধারা একটি সুনির্দিষ্ট বিষয় হিসাবে নতুন আত্মপ্রকাশ করলেও এর মূল সূত্র ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ভন থুনেন ও ওয়েবারের অবস্থান তত্ত্বের মধ্যে নিহিত আছে। তার পর থেকে বিংশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত বহু চিন্তাবিদ্ যেমন, ক্রিস্টলার, গলপিন, ওডাম, ভাইডাল ভি লা ব্লাশ, হওয়ার্ড, প্যাট্রিক গেডেস, মামফোর্ড, লশ তাঁদের তত্ত্বের মাধ্যমে আঞ্চলিক উন্নয়নের চিন্তাধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ওয়ালটার ইসরাড, জে. এল. ব্রায়ান, জন ফ্রিডম্যান, এডসার এম. হুভার, হ্যাগরা স্ট্রান্ড, কুলক্রিনস্কি প্রমুখের লেখায় আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনার চিন্তাধারা সুনির্দিষ্ট রূপ পেতে আরম্ভ করে। সকলের চিন্তাধারার মধ্যে ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নগর পরিকল্পনা, পরিবেশ বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ের সমন্বয় ঘটেছে।

আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা মূলতঃ একটি চতুষ্কোণ ডিসিপ্লিন যাকে চারটি বিষয়ের উপর নজর রাখতে হয়— অঞ্চল, উন্নয়নের লক্ষ্য, উন্নয়নের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সাধনের উপায়। অঞ্চলের ধারণা এগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। চার প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে দেখা হয়েছে এবং এর ফলে চার ধরনের তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। প্রথম যে তত্ত্বগুলি সামনে এসেছে সেগুলি হল বিভিন্ন অবস্থান তত্ত্ব। এগুলি মূলতঃ বাজারের সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার অবস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ, উৎপাদন কেন্দ্রগুলি কোথায় অবস্থিত হলে লাভ তথা উন্নয়ন সবচেয়ে বেশী হবে। পরবর্তী সময়ে প্রথমে আমরা পাই Patrick Geddes এবং উপত্যকা—ব্যবচ্ছেদ তত্ত্ব (Valley Section Concept)। পরবর্তীকালে তাঁর ধারণা অনুসরণ করে নদী উপত্যকা পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় চিন্তাধারাটিকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাদ (Cultural ethnocentrism) বলা যেতে পারে। দক্ষিণ USA, রাশিয়ার এশিয় অংশ, চীন এমনকি ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অভিব্যক্তি দেখা যায়। তৃতীয় ভাবধারাটি হল ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ধারণা (Small community Concept)। পরবর্তীকালে যার প্রকাশ ঘটেছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির গোষ্ঠী উন্নয়ন প্রকল্পগুলি (Community Development Programme)-র মধ্যে।

আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনার আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গী হল নগর পরিকল্পনা। নগর সভ্যতার গোড়াপত্তনের সময় থেকেই নগর পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। নগরায়ণের প্রসার যত বেড়েছে, ততই নগর পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে এই প্রয়োজনীয়তা অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। স্থাপত্যবিদ্যা ছাড়াও পরিবেশবিদ্যা, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নগর পরিকল্পনাকে দেখা হতে থাকে। নগরায়ণ যত বৃদ্ধি পায় ততই দেখা যায় যে এর সমস্যাগুলি প্রকৃতপক্ষে শহরতলি অঞ্চলের মধ্যে নিহিত

আছে। ফলে কেবলমাত্র নগর পরিকল্পনার জায়গায় নগরায়ণ ও আঞ্চলিক পরিকল্পনার (Urban and Regional Planning) কথা ভাবা হতে থাকে।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেও আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিকে দেখা হয়েছে। আঞ্চলিক অর্থনীতি অনুধাবন করার জন্য পরিবহণ ব্যয়, উৎপাদন কেন্দ্রের অবস্থান, আঞ্চলিক ব্যবসায়িক চক্র, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধি প্রভৃতি জানা প্রয়োজন। যেহেতু অর্থনৈতিক অগ্রসরতা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়ন অনেকটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে তাই আঞ্চলিক উন্নয়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন। যে তত্ত্বগুলি এসেছে যেমন, বিকাশ মেরু তত্ত্ব, সেগুলি আগের অবস্থান তত্ত্বের থেকে কিছুটা উন্নত। পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অপরিবর্তিত রেখে উৎপাদক কিভাবে নিজেকে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে নিয়ে যেতে পারেন পূর্বের তত্ত্বগুলি ছিল সেই প্রকার। কিন্তু পরবর্তীকালে যে তত্ত্বগুলি আসে সেগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে কিভাবে বাস্তবোচিত ভাবে পরিবর্তন করা যায় তার কিছুটা দিক নির্দেশ করে।

তৃতীয় ধাপে যে তত্ত্বগুলি আসে সেগুলি আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে এক নতুন রূপ দেয়। ইসাইয়া বোম্যান, স্ট্যানবেরি, বটকিন প্রমুখ তাত্ত্বিকরা আঞ্চলিক উন্নয়নকে আরও বড় পটভূমিকার উপর এনে দাঁড় করান। তাঁরা কেবলমাত্র বাজারের চাহিদা, সর্বোচ্চ মুনাফা ইত্যাদির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে আঞ্চলিক উন্নয়নকে অনেক বৃহত্তর পরিমণ্ডলে দেখার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে প্রাকৃতিক ঘটনাবলী এবং ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের আচরণ এবং পারস্পরিক আদান প্রদান, সকলই বিবেচ্য হওয়া উচিত। মার্শাল. ই. ডিসক জাতীয় পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এই ধরনের বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতের কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন পরিবেশগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রশাসনিক উপাদানগুলি একত্রে মিলে যখন একটি নির্দিষ্ট সত্ত্বা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে তখন সেই পৃথক সত্ত্বাকে একক ধরে পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। সেই পরিকল্পনা হবে স্বশাসিত এবং তাতে ঐ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও নিজস্বতা প্রকাশিত হবে।

চতুর্থ ধাপে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক উভয় বৈশিষ্ট্যই মিলেমিশে পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতা আরও বেশী করে দেখা যায়। তিনটি প্রধান ধারায় এই প্রবণতা আত্মপ্রকাশ করে।

পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য কতকগুলি মূলনীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ যাদের জন্য পরিকল্পনা করা হচ্ছে, তাদের মতামত নেওয়া দরকার। পরিকল্পনাকার যতই প্রয়োজন অনুভব করুন না কেন, প্রাপকদের ইচ্ছা ও চাহিদাকে মূল্য না দিলে পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ পরিকল্পনার সুবিধাভোগী জনসাধারণকে পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজে এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে। পরিকল্পনাকার কেবলমাত্র উপযুক্ত উপায় ও পদ্ধতির সন্ধান দেবেন, মূল কাজে সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আনতে হবে। তাদের অংশগ্রহণ করাতে না পারলে পরিকল্পনার সামগ্রিক সাফল্য অধরাই থেকে যাবে।

1.6 পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

Mackaye আঞ্চলিক পরিকল্পনার সম্বন্ধে বলেছেন—"Regional planning consists in the attempt at discoveving the plans of the Nature for the attainment of man's ends upon the earth" পৃথিবীতে

মানুষের জন্য প্রকৃতি কি কি পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা নিয়ে রেখেছে তা খুঁজে বার করা। তিনি আরও বলেন যে পরিকল্পনার কাজ হল কোন অঞ্চলে সভ্যতার অগ্রগতিতে সাহায্য করা। Mamford ও এ প্রসঙ্গে প্রায় একই দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে ''Regional planning asks not how wide an area can be brought under the aegis of the metropolis, but how the poulation and civic facilities can be distributed so as to promote and stimulate a vivid and creative life throughout a whole region' আঞ্চলিক পরিকল্পনা বলতে কত বড় এলাকা ও মানুষজন একটি বড় শহরের সুযোগ সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা গেল তাকে বোঝায় না বরঞ্চ সমগ্র অঞ্চলে জনসংখ্যা এবং নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের বণ্টন কি ভাবে হলে অঞ্চলটির জীবনযাত্রা উন্নত ও সক্রিয় হতে পারে তাই দেখা।

কোন অঞ্চলে অজৈব এবং সজীব সম্পদগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক। এবং নির্ভরশীলতা আঞ্চলিক পরিকল্পনার প্রধান উপজীব্য। আঞ্চলিক পরিকল্পনা স্বীকার করে নেয় যে কোন অঞ্চলের উন্নয়ন নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে :

a. মানুষের পরিবেশের সকল পণ্য সম্পদ।

b. সামাজিক সম্পদ।

c. মানব সম্পদ যা উপরোক্ত দু ধরনের সম্পদকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালনা করে।

আঞ্চলিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সবচেয়ে উপযুক্ত এবং দক্ষ শ্রমবিভাজন করা যায়। পরিকল্পনার দ্বারা কোন অঞ্চলে অর্থনৈতিক কাজকর্মের বিস্তারিত পটভূমি তৈরী করা সম্ভব যার ফলে ঐ অঞ্চলের সম্পদগুলির স্থায়ী উন্নয়ন হবে।

1.7 পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

প্রাকৃতিক পরিবেশের উপরই মানুষের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ গড়ে ওঠে। একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হলেও সবসময় পারস্পরিক নির্ভরতার মাত্রা সমান থাকে না। আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনায় এই সম্পর্কের প্রকৃতি ভালোভাবে জানা দরকার। ভূ-প্রকৃতিতে যেমন কোথাও পাহাড়, কোথাও সমভূমি রয়েছে তেমনি সাংস্কৃতির অঙ্গনেও উচ্চনীচ পার্থক্য রয়েছে। কোথাও মানুষ সুখ ও ঐশ্বর্যের মধ্যে বসবাস করছে, কোথাও আবার অন্তহীন দারিদ্র্য। আর্থিক অবস্থার এই প্রকার স্থানগত বৈষম্য দূর করা আবশ্যক। বিশেষ করে ভারতের মত প্রাচীন অথচ পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক অবস্থা যুক্ত দেশে উন্নয়নের কাজ কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছে। কয়েকটি মেট্রোপলিটান শহরকে আর্থিক কর্মকাণ্ড কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে ঐ অঞ্চলগুলি অনাবশ্যক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মত থেকে গিয়েছে বস্তি, নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব, অশিক্ষা, সমাজ বিরোধী আচরণ এবং সীমাহীন দারিদ্র্য। যথাযথ সুযোগের অভাবে যোগ্য ব্যক্তিরা কাজের খোঁজে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। যারা থেকে যায় তারা অনেক সময় স্বাস্থ্য ও দক্ষতার অভাবে উচ্চমানের কাজের উপযুক্ত হয় না। গুণার মিরডাল তাঁর Theory of Cumulatre Causation তত্ত্বে সঠিকভাবে বলেছেন যে কোন অঞ্চল তার দারিদ্র্যের জন্যই চিরকাল দরিদ্র থেকে যায়। মূলধন, ও দক্ষ মানব সম্পদের অভাবে দারিদ্র্যের কবল থেকে মুক্ত হবার পথ খুঁজে পায় না। যদি বা কোন সময় মূলধনের যোগান

আসে কিন্তু কোন খাতে বিনিয়োগ করলে সর্বাধিক লোকের কাছে তার সুফল পৌঁছতে পারে তারও সঠিক নির্দেশ করা দরকার। সুতরাং শুধুমাত্র সম্পদ সংগ্রহ নয়, তার সুষ্ঠ বণ্টন, এবং সর্বাধিক মানুষের কল্যাণের লক্ষ্য পূরণের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন। আঞ্চলিক বৈষম্য এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে বৈষম্য উভয়ই দূর করা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

1.8 আঞ্চলিক পরিকল্পনার বিভিন্ন ধাপ

আঞ্চলিক পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে কতকগুলি বিষয় পর্যালোচনা করা দরকার।

a. আঞ্চলিকতাবাদের উপস্থিতি ও প্রকৃতি অনুধাবন যে সকল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অঞ্চলটিকে সমগ্র দেশের থেকে পৃথক করা যায় সেগুলি চিহ্নিত করতে হবে। আবার অঞ্চলটিকে সমগ্র দেশের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলবে না, দেশের একটি অংশ বলে বিবেচনা করে তবেই পরিকল্পনা করতে হবে। তা না হলে পরিকল্পনার মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর হবে না।

b. অঞ্চলটিকে চিহ্নিত করা—কোন অঞ্চলের জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হবে এবং পরিকল্পনার সুফলের প্রাপক কারা সেগুলি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে।

c. জনসাধারণের প্রয়োজন মাফিক পরিকল্পনার রূপরেখা স্থির করতে হবে। শুধু তাই নয় পরিকল্পনা যাতে স্থায়ী উন্নয়নের পথ নির্দেশ করতে পারে তা চিহ্নিত করা দরকার। অর্থাৎ একটি বিশেষ অভীষ্ট পূরণ করতে গিয়ে বাকিগুলিকে অবহেলা করা চলবে না। যেমন, বেকারত্ব দূর করতে গিয়ে শিল্পোন্নয়ন করা হল এমন ভাবে যে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে গেল। সেটা ত্রুটিমুক্ত পরিকল্পনা নয়।

d. ভারসাম্য যুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ—পরিকল্পনাটি যাতে সর্বাঙ্গীণ হয় এবং ঐ অঞ্চলের পরিবেশ, সম্পদ জীবজগৎ ও মানুষ সকলেই তার সুফল পায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

পরিকল্পনা গ্রহণের পর সেটি রূপায়ণেরও বিভিন্ন পর্যায় আছে :

a. পরিকল্পনা রূপায়ণের পটভূমি তৈরী করা—পরিকল্পনা রচনা করেন বিজ্ঞানীরা কিন্তু রূপায়ণ করেন মূলত: রাজনৈতিকরা। এর জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক পটভূমি তৈরী থাকা প্রয়োজন। তা না হলে রাজনৈতিক বিরোধিতা অথবা অযথা আমলাতান্ত্রিক ঢিলেমর জন্য পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। যেমন, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার জন্য বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যে রাজনৈতিক বোঝাপড়া থাকা দরকার।

b. জনসাধারণকে পরিকল্পনার অংশীদার করা—যেহেতু পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য জনসাধারণ তাই তাদের অংশীদারী না থাকলে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। যত বেশী সংখ্যক লোককে পরিকল্পনার কাজে নিয়োগ করা যায় ততই ভালো। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং এর ফলে তাদের প্রাপ্তি সম্বন্ধে অঞ্চলের মানুষজনকে ভালোভাবে অবহিত করা দরকার।

c. পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা— রূপায়ণের মধ্যপথে দফায় দফায় পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা এবং প্রয়োজন মাফিক তার সংশোধন করা দরকার।

1.9 আঞ্চলিক পরিকল্পনা সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য তথ্য

আঞ্চলিক পরিকল্পনা রচনার পূর্বে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর জেনে নেওয়া প্রয়োজন। প্রশ্নগুলি নিম্নরূপ—

(1) কোন অঞ্চলের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে ?

(2) পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কি ? অর্থনৈতিক, সামাজিক না পরিবেশগত ?

(3) পরিকল্পনার লক্ষ্য কি ? উন্নয়ন বৈষম্য দূরীকরণ, বেকারত্ব দূরীকরণ, কৃষির উন্নতি কোনটি নাকি সব ?

(4) পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য প্রাপ্য প্রাকৃতিক সম্পদ, মানব সম্পদ ও মূলধন কি কি পাওয়া যেতে পারে ?

(5) লক্ষ্যে পৌছনোর জন্য কি কি পথ বেছে নেওয়ার সুযোগ আছে ?

(6) প্রতিটি পথ অবলম্বন করলে তার কি কি সুবিধা অসুবিধা রয়েছে ?

(7) কি ধরনের বিনিয়োগ দরকার ?

(8) কখন ও কোথায় এই বিনিয়োগগুলি করতে হবে ?

(9) এর জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট কত ?

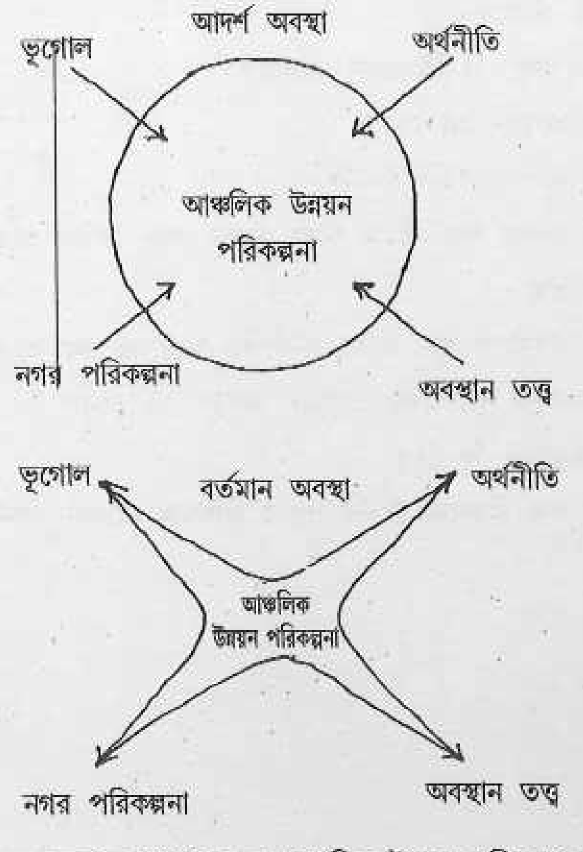

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সঙ্গে আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সম্পর্ক

(10) পরিকল্পনা বহুমুখী হলেও কোন লক্ষ্যগুলি অগ্রাধিকার পাবে ?

(11) পরিকল্পনার অনেকগুলি রূপরেখার মধ্যে চূড়ান্ত কোনটি ?

(12) কোন মডেলটি অঞ্চলের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ?

(13) মডেলটির যাবতীয় পরিসংখ্যানগত তথ্য কিভাবে সংগৃহীত হবে ?

(14) মডেলটি রূপায়ণের ক্ষেত্রে কাজের অগ্রগতি কতদূর হল এবং মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে কিনা তার সম্বন্ধে তথ্য কিভাবে সংগৃহীত হবে ?

(15) পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত রূপায়ণের দায়িত্ব কে নেবে ?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর তখনই দেওয়া সম্ভব যখন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা সম্মিলিত ভাবে একযোগে পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করবে। তাই আঞ্চলিক পরিকল্পনা একটি বহুধা বিভক্ত বিষয় যাতে ভৌগোলিক, অর্থনীতিবিদ্, সমাজতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, কারিগরিবিদ সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী :

1. পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায় ?
2. আঞ্চলিক পরিকল্পনার লক্ষ্য কি কি হওয়া দরকার ?
3. আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রয়োজন হয় কেন ?
4. পরিকল্পনা গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়গুলি কি কি ?
5. আঞ্চলিক পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে কি কি বিষয় সম্বন্ধে জেনে নেওয়া প্রয়োজন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন :

1. আঞ্চলিক পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য স্থানীয় জনগণকে অংশীদার করা প্রয়োজন কেন ?
2. উন্নয়নশীল দেশে আঞ্চলিক পরিকল্পনার প্রয়োজন অনুভূত হয় কেন ?
3. পরিকল্পনার প্রধান কাজগুলি কি কি ?
4. পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন কেন ?

উত্তরমালা

1. 1.5 অংশ দেখুন।
2. 1.6 অংশ দেখুন।
3. 1.7 অংশ দেখুন।
4. 1.8 অংশ দেখুন।
5. 1.9 অংশ দেখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

1. 1.8 এর পরিকল্পনা রূপায়ণের বিভিন্ন পর্যায়ের (b) অংশ দেখুন।

2. 1.6 এবং 1.7 অংশ দেখুন।

3. 1.6 অংশ দেখুন।

4. 1.9 অংশ দেখুন।

1.10 স্থানিকতা তত্ত্ব : আঞ্চলিক উন্নয়নের মডেল হিসাবে ওয়েবার, লস, ক্রিস্টলার-এর তত্ত্ব এবং বিকাশ মেরু কেন্দ্র তত্ত্ব

আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধি অর্থনীতিবিদ্ ও ভূগোলবিদ্ উভয়েরই আলোচনার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। বিশেষ করে শিল্পের স্থানিকতা অর্থাৎ শিল্প কেন্দ্রের আদর্শ অবস্থান কোথায় হওয়া উচিত এই আলোচনা আঞ্চলিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বারবারই গুরুত্ব পেয়েছে। কারণ, প্রধান শিল্প কেন্দ্রের অবস্থান দ্বারা কোন অঞ্চলের পরিবহন, বাজারের চাহিদা, জমির দাম, সম্ভাব্য অর্থনৈতিক অবস্থা সবই কমবেশী নিয়ন্ত্রিত হয়। শিল্পের স্থানিকতার যে সব মডেলগুলি রয়েছে সেগুলি সাধারণতঃ তিনটি দৃষ্টিকোণ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

(a) উৎপাদন ব্যয়।

(b) বাজারের চাহিদা।

(c) পারস্পরিক নির্ভরশীলতা।

স্থানিকতা তত্ত্ব হিসাবে প্রথম উল্লেখযোগ্য হল 1826 সালে প্রকাশিত ভন থুনেনের গ্রন্থ "The Isolated State" এই গ্রন্থে তিনি বলেন, কোন সমতল কৃষি অঞ্চলের কেন্দ্রে থাকবে একটি বড় শহর। শহরটির চারপাশে এককেন্দ্রিক একেকটি বৃত্ত একেক ধরণের কাজে নিযুক্ত থাকবে। শহরের কেন্দ্র থেকে যত দূরে যাবে পরিবহণ ব্যয় তত বাড়বে। সুতরাং কোন দ্রব্যের বাজার মূল্য কত তার উপর নির্ভর করবে সেই পণ্যটি শহর থেকে কত দূরে উৎপাদিত হবে। কিন্তু ভন থুনেনের তত্ত্ব মূলতঃ কৃষিপণ্যের উৎপাদন ব্যবস্থার আলোচনায় সীমিত এবং পরিবহণ ব্যয় ছাড়া উৎপাদন ব্যবস্থার অন্য কোন শর্ত নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয় নি।

শিল্পস্থানিকতা নিয়ে প্রথম আলোচনা করেন আলফ্রেড ওয়েবার। 1909 সালে তাঁর প্রকাশিত "Theory of Industrial location" গ্রন্থে তিনি শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের জন্য এমন জায়গাকেই বেছে নিতে বলেছেন যেখানে উৎপাদন ব্যয় সবচেয়ে কম হবে। তিনি মনে করেন যে প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের উপর উৎপাদকের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। সুতরাং শিল্পটিকে টিকিয়ে রাখতে গেলে এবং সেখান থেকে লাভ করতে গেলে সবার আগে উৎপাদন ব্যয় সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। এই জন্য তিনি কাঁচামালের পরিবহণ ব্যয়, কাঁচামালের ওজন, শ্রমমূল্য এই তিনটি উপাদানের ভিত্তিতে প্রতিটি শিল্পকেন্দ্রের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করার কথা বলেছেন।

কিন্তু বাজারের চাহিদাও যে কোন শিল্পকেন্দ্রের উপযুক্ত স্থানের নির্ণায়ক হতে পারে, ওয়েবারের তত্ত্বে তার কোন উল্লেখ নেই। অগষ্ট লস তাঁর তত্ত্বে বলেন যে, সর্বাধিক বিস্তৃত বাজার যে স্থান থেকে দখল করা যাবে সেটিই শিল্পকেন্দ্রের সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হবে কারণ এর মাধ্যমে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ বিক্রয়মূল্য সংগ্রহ

করা সম্ভব হবে। সর্বাধিক লাভের সন্ধান করতে গিয়ে লস বাজারের চাহিদার ওপর এতই গুরুত্ব দিয়েছেন যে কাঁচামালের যোগানের কথা অনুল্লেখিত থেকে গিয়েছে।

1933 সালে দক্ষিণ জার্মানীতে ক্রিস্টলার লক্ষ্য করেন যে, সমগ্র অঞ্চলের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় স্থান থাকে যা সমগ্র অঞ্চলটির প্রয়োজন মেটায়। অর্থাৎ সেখান থেকে জনসাধারণ তাদের পণ্য, সেবা এবং প্রশাসনিক চাহিদা পূরণ করে। ক্রিস্টলারের তত্ত্বে একটি শিল্পকেন্দ্রের পরিবর্তে ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র, আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলি কোথায় অবস্থিত হলে সর্বাধিক বিস্তৃত অঞ্চল তার সুবিধা ভোগ করতে পারে তাই দেখানো হয়েছে।

তারও পরে 1955 সালে Schumpeter এবং Francis Perroux দেখান যে কোন অঞ্চলের সর্বত্র সমান ভাবে উন্নয়ন হয় না। একটি অথবা কয়েকটি বিকাশ কেন্দ্রে উন্নয়ন শুরু হয়। একেকটি কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন মাত্রায় বিকাশের সুফল ছড়িয়ে পড়ে এবং সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থা তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই তত্ত্বগুলি পরবর্তী কয়েকটি পাতায় বিশদে আলোচনা করা হল—

1.11 আলফ্রেড ওয়েবারের ন্যূনতম পরিবহণ ব্যয় তত্ত্ব (Least-Cost Location Theory of Alfred Weber)

ওয়েবার 1909 সালে Uleer den Standurt der Industrien নামক পুস্তকে তাঁর তত্ত্বটি প্রকাশ করেন। একটি শিল্পকেন্দ্র কোথায় অবস্থিত হবে ওয়েবারের তত্ত্বে প্রকৃতপক্ষে সেটিই আলোচিত হয়েছে। এই তত্ত্বের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হল, পরিবহণ ব্যয়ের উপর নির্ভর করে শিল্পকেন্দ্র কোথায় স্থাপন করা লাভজনক হবে। পরিবহণ ব্যয় ছাড়াও মজুরি এবং অনেকগুলি শিল্পের একত্রীকরণের ফলে উদ্ভূত সুবিধার ফলে কোন অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত বিশেষ একটি স্থান শিল্প স্থাপনের পক্ষে অধিক উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

ওয়েবারের তত্ত্বের পূর্বশর্তগুলি নিম্নরূপ —

(ক) যে অঞ্চলে শিল্পকেন্দ্রটি স্থাপিত হবে সেখানে স্বনির্ভর অর্থব্যবস্থা থাকতে হবে।

(খ) সমগ্র অঞ্চলটির ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, এবং স্থানীয় অধিবাসীদের ক্ষমতা, দক্ষতা ও অর্থনৈতিক অবস্থা একই প্রকার হবে।

(গ) বাজারের চাহিদা উর্ধ্বমুখী হবে এবং পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা থাকবে।

(ঘ) শ্রমিকের সরবরাহ নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে থেকেই আসবে এবং মজুরির হারও ঐ অঞ্চলের সর্বত্র সমান থাকবে।

(ঙ) কিছু কাঁচামাল সর্বত্র লভ্য। ওয়েবার তাদের নাম দিয়েছেন bliquitono ; যেমন—জল, বালি ইত্যাদি। কিছু কাঁচামাল একটি বা দুটি বিশেষ অঞ্চলেই কেবল পাওয়া যায় অর্থাৎ স্থানীয়। ওয়েবার সেগুলিকে বলেছেন Localised ; যেমন—খনিজ পদার্থ।

(চ) পরিবহণ ব্যয় ওজন ও দূরত্বের সঙ্গে সমানুপাতিক।

কোন একটি শিল্পকেন্দ্রের অবস্থান তিনটি উপাদানের উপর নির্ভরশীল :

I পরিবহণ ব্যয়।

II শ্রমের মজুরি।

III অনেকগুলি শিল্প উপাদানের একত্রীকরণ।

ওয়েবার প্রথম দুটি উপাদানকে আঞ্চলিক উপাদান ও তৃতীয় উপাদানটিকে স্থানীয় উপাদান বলেছেন।

I পরিবহণ ব্যয়ের প্রভাব—ওয়েবারের তত্ত্বটি যেহেতু ন্যূনতম পরিবহণ ব্যয় তত্ত্ব সেকারণে কাঁচামাল ও পণ্যের ওজন এবং মোট পরিবহণ ব্যয় যেখানে সবেচেয় কম হবে সেখানেই শিল্পকেন্দ্রটি স্থাপিত হবে। ওয়েবারের তত্ত্ব অনুসারে কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের ওজনের দ্বারা মোট পরিবহণ ব্যয় নির্ধারিত হয়।

এই তত্ত্ব অনুসারে কাঁচামাল দু প্রকার—

ওজন হ্রাসকারী বা অবিশুদ্ধ কাঁচামাল, যেমন— লৌহ আকরিক, এবং বিশুদ্ধ কাঁচামাল যা থেকে উৎপাদিত পণ্যের ও কাঁচামালের ওজন একই থাকে, যেমন—তুলা। কাঁচামালের প্রকৃতি বিশুদ্ধ না অবিশুদ্ধ তা জানবার জন্য ওয়েবার একটি সূচক নির্ধারণ করেছেন যা, পণ্যসূচক (material index) নামে বিখ্যাত। কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের ওজনের অনুপাতকে পণ্যসূচক বলে। যদি পণ্য সূচকের মান 1 হয় তবে কাঁচামালটি বিশুদ্ধ এবং 1-এর বেশী হলে সেটি অবিশুদ্ধ প্রকৃতির হবে। শুধু কাঁচামালের প্রকৃতিই নয়, একটি পণ্যের উৎপাদনের জন্য কয়টি কাঁচামাল ব্যবহৃত হবে এবং তাদের মিলিত পরিবহণ ব্যয় শিল্প কেন্দ্রের অবস্থানের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যদি একটি কাঁমাচাল ব্যবহৃত হয় তবে কাঁচামাল ও বাজারের মধ্যবর্তী রৈখিক অবস্থানে শিল্প কেন্দ্রটি স্থাপিত হবে। সেক্ষেত্রে শিল্প কেন্দ্রটি বাজারের নিকটে, কাঁচামালের উৎসের নিকটে কিম্বা দুইয়ের মধ্যবর্তী কোন স্থানে অবস্থিত হবে। যদি কাঁচামালটি বিশুদ্ধ প্রকৃতির হয় তবে উপরোক্ত যে কোন স্থানে এবং কাঁচামালটি অবিশুদ্ধ প্রকৃতির হলে শিল্পকেন্দ্রটি কাঁচামালের উৎসের নিকটে স্থাপন করা সবচেয়ে উপযুক্ত হবে। বস্ত্রবয়ন শিল্প এর উদাহরণ।

কোন শিল্প যদি দুটি কাঁচামাল ব্যবহার করে তবে অবস্থানের প্যাটার্ন ত্রিভুজাকৃতি হবে কারণ ত্রিভুজের দুটি শীর্ষবিন্দুতে দুটি কাঁচামাল ও তৃতীয়টিতে ভোগকেন্দ্র বা বাজার অবস্থান করবে। এইভাবে কাঁচামালের সংখ্যার উপর নির্ভর করে অবস্থানের প্যাটার্ন চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ, ষড়ভুজ প্রভৃতি নানা প্রকার হতে পারে। সম্ভাব্য কয়েকটি অবস্থানের প্যাটার্ন নীচে আলোচনা করা হল। (চিত্র 1.4)

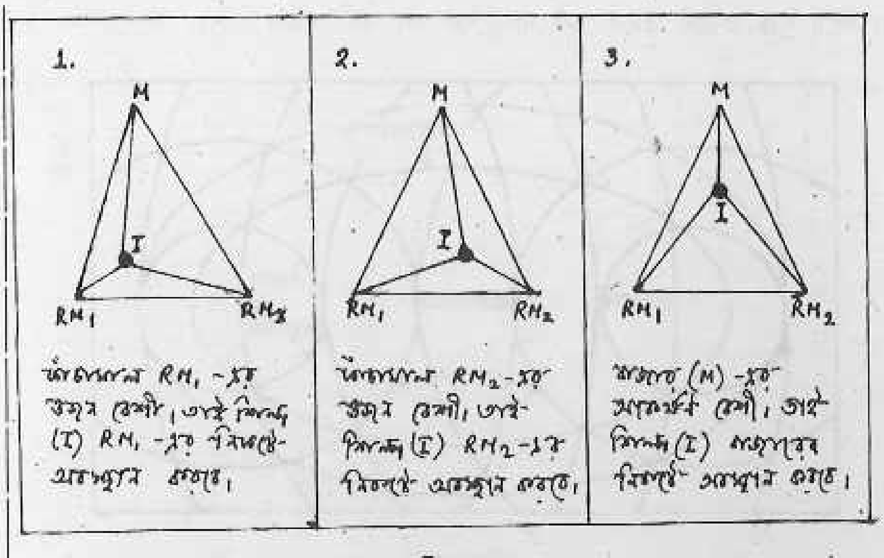

(চিত্র 1.4)

(ক) একটি কাঁচামাল বিশুদ্ধ ও অপরটি অবিশুদ্ধ—শিল্পকেন্দ্র অবিশুদ্ধ কাঁচামালের নিকটে অবস্থিত হবে।

(খ) দুটি কাঁচামাল বিশুদ্ধ—শিল্পকেন্দ্রটি বাজারের নিকট অবস্থিত হবে।

(গ) দুটি কাঁচামাল অবিশুদ্ধ— কাঁচামাল দুটির ওজন কত এবং কি পরিমাণে লাগছে তার ওপর নির্ভর করবে শিল্পকেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত হবে। এই প্রসঙ্গে ওয়েবার তাঁর বিখ্যাত অবস্থান ত্রিকোণের (Locational Triangle) মাধ্যমে শিল্পকেন্দ্রটি কোথায় স্থাপিত হলে সবচেয়ে লাভজনক হবে তা দেখিয়েছেন। যে কাঁচামালের ওজন বেশী তার আকর্ষণও বেশী ও অবস্থান ত্রিকোণের সেই শীর্ষবিন্দুটির দিকে হেলে শিল্পকেন্দ্রটি অবস্থিত হবে। এর ফলে ভারী কাঁচামালটি বেশীদূর পরিবহণ করতে হবে না। উৎপাদিত পণ্যটির ওজন কম হওয়ায় ভোগকেন্দ্রে নিয়ে যেতে কম পরিবহণ ব্যয় লাগবে। এইভাবে মোট পরিবহণ ব্যয়ের উপর নির্ভর করে উৎপাদন কেন্দ্রের অবস্থান নির্ধারিত হবে।

II মজুরির প্রভাব — শ্রমমূল্য এবং শ্রমিকের দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা সর্বত্র সমান নয়। ধরা যাক, দুটি অঞ্চলের একটিতে শিল্পস্থাপন করলে পরিবহণ ব্যয় কম কিন্তু মজুরি বেশী ও অপরটিতে মজুরি কম অথচ পরিবহণ ব্যয় বেশী লাগে। সেক্ষেত্রে যে অঞ্চলের মোট ব্যয় কম হবে সেই স্থানেই উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হবে। একইভাবে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বেশী হওয়ার ফলে যদি মোট ব্যয়ে সাশ্রয় হয় তবে সেই স্থানেই উৎপাদন কেন্দ্রটি অবস্থিত হবে।

পরিবহণ ব্যয় ও মজুরির যুগ্ম প্রভাব কিভাবে কোন শিল্পকেন্দ্রের অবস্থান নির্ধারণ করে তা বোঝানোর জন্য ওয়েবার কয়েকটি নতুন ধারণা উত্থাপন করেছেন। (ক) আইসোটিম (Isotim)—কাঁচামালের পরিবহণ ব্যয় এবং শিল্পকেন্দ্র থেকে উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে প্রেরণ করার পরিবহণ ব্যয় আলাদা হয়। এই দুই প্রকার পরিবহণ ব্যয়কে পৃথকভাবে বোঝানোর জন্য তিনি সম পরিবহণ ব্যয় রেখা বা আইসোটিম নামে এক কাল্পনিক রেখা অঙ্কন করেছেন।

(খ) আইসোডাপেন (Isodapane)—ন্যূনতম পরিবহণ ব্যয় যুক্ত স্থানের বাইরে কোন শিল্প কেন্দ্র অবস্থান করলে অতিরিক্ত পরিবহন ব্যয় করতে হয়। কাঁচামাল ও উৎপন্ন দ্রব্যের অতিরিক্ত মোট পরিবহণ ব্যয় একটি কাল্পনিক রেখা দিয়ে যুক্ত করলে তাকে আইসোডাপেন বলা হয়। (চিত্র 1.5)

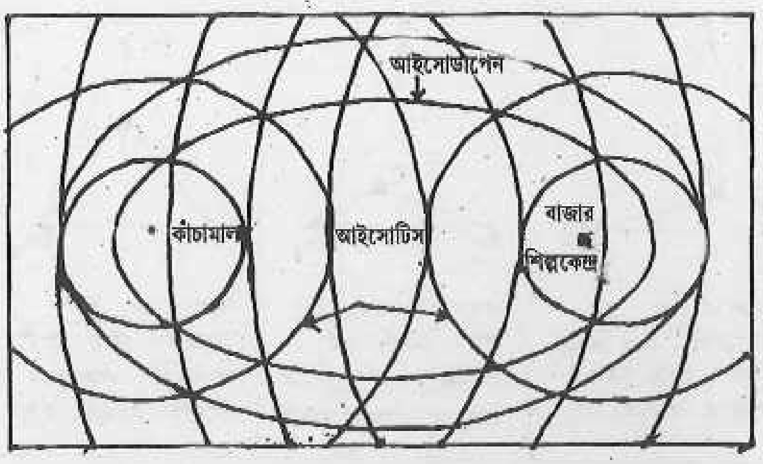

(চিত্র 1.5)

(iii) শ্রমগুণক (Labour Coefficient) — উৎপন্ন দ্রব্যের একক পিছু মজুরি এবং পরিবহণযোগ্য কাঁচামাল ও উৎপন্ন দ্রব্যের মোট পরিবহণ ব্যয়ের অনুপাত।

(iv) ক্রিটিকাল আইসোডাপেন (Critical Isodapane) ঃ শ্রমিকের কম মজুরি বাবদ ব্যয় সাশ্রয়ের পরিমাণ এবং কাঁচামাল ও উৎপন্ন দ্রব্যের মোট ব্যয়ের পরিমাণ যে রেখা বরাবর সমান থাকে তাকে ক্রিটিকাল আইসোডাপেন বলে।

ন্যূনতম পরিবহণ ব্যয় কেন্দ্র শিল্প স্থাপনের পক্ষে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলেও অন্য কোন স্থানের শ্রমগুণক যদি বেশী আকর্ষণীয় হয় সেক্ষেত্রে শিল্পকেন্দ্রের অবস্থান শ্রমিকের ধনাত্মক ভূমিকা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। (চিত্র 1.6)

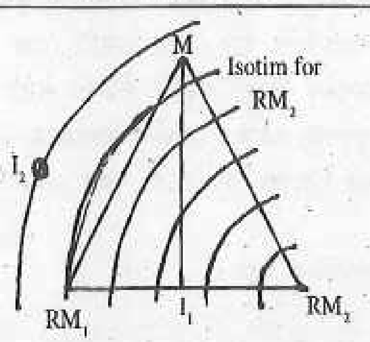

যদি শ্রমমূল্য I_2 অবস্থানে I_1 অবস্থানের তুলনায় এত কম হয় যে বাড়তি পরিবহন ব্যয়ের তুলনায় লাভজনক, তবে শিল্পকেন্দ্রটি I_2 অবস্থানে স্থাপিত হবে।

(চিত্র 1.6)

III অনেকগুলি উৎপাদন কেন্দ্রের একত্রীকরণের প্রভাব — একই স্থানে অনেকগুলি শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হলে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তারা মোট পরিবহণ ব্যয় কিছুটা ভাগাভাগি করে নিতে পারে। একারণে শিল্প কেন্দ্রগুলি বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান না করে এককেন্দ্রিক ভাবে অবস্থান করলে পরিবহণ ও আনুষাঙ্গিক খরচ ভাগ করে নেওয়ার সুবিধা পাবে। এই সুবিধার জন্য একটি স্থানে একাধিক উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে উঠবে ও ঐ স্থানটির গুরুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে।

একটি শিল্পসম্ভাবনাময় অঞ্চলে উৎপাদন কেন্দ্র কোথায় স্থাপন করা উচিত, ওয়েবারের তত্ত্বে সে কথাই আলোচিত হয়েছে। শিল্প স্থানিকতা তত্ত্বে পরিবহণ ব্যয়ের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার বাইরে থেকে গিয়েছে। প্রথমতঃ, একটি অঞ্চলের সর্বত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানব সম্পদ একই প্রকার থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ, ওয়েবার তাঁর তত্ত্বে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যকে অবহেলা করেছেন।

তৃতীয়তঃ, পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় শিল্পের একদেশীভবনের জায়গায় বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়ে থাকে।

চতুর্থতঃ, কাঁচামাল অপেক্ষা উৎপাদিত পণ্যের পরিবহণ ব্যয় বেশী। পরিবহণ ব্যয় দূরত্বের সঙ্গে সমানুপাতিক নয়। দূরত্ব যত বাড়ে পরিবহণ ব্যয় একই অনুপাতে বাড়ে না।

পঞ্চমতঃ, ওয়েবারের তত্ত্বে পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে অর্থনীতির ওঠাপড়া ও কোন কোন পণ্যের একচেটিয়া বাজার শিল্প ব্যবস্থার অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ।

নানা সমালোচনা সত্ত্বেও ওয়েবার তাঁর স্থানিকতা তত্ত্বে উৎপাদন ব্যবস্থার বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের যে বিশ্লেষণ করেছেন তা পৃথক উল্লেখের দাবী রাখে।

1.12 লসের পরিবর্তনশীল ক্রমপর্যায় তত্ত্ব (Variable Hierarchy of Losch)

1954 সালে জার্মান অর্থনীতিবিদ্ August Losch তাঁর মুনাফা সর্বাধিকীকরণ (Profit Maximisation) তত্ত্বটি প্রকাশ করেন যার মূল বক্তব্য হল কোন একটি পরিষেবাকেন্দ্র সেখানেই অবস্থিত হবে যেখানে তার অর্জিত মুনাফা সর্বাধিক হয়। উৎপাদন কেন্দ্র অথবা বাজার থেকে পণ্য যতদূরে নিয়ে যাওয়া হবে ততই পরিবহণ ব্যয় বাড়বে এবং মুনাফা কমবে। এইভাবে যতদূর পর্যন্ত নিয়ে গেলে মুনাফা সবচেয়ে কম হয় সেটিই ঐ কেন্দ্রের প্রভাব বলয়ের সীমানা হবে। লস্ তাঁর তত্ত্বে উৎপাদন ও বাজারের অনেকাংশে মুক্ত পরিবেশের ধারণা দিয়েছেন যেখানে উৎপাদন ব্যবস্থা চাহিদা অনুযায়ী পরিচালিত হবে এবং একটি কেন্দ্র নানা প্রকার পণ্যের উৎপাদনের সাথে জড়িত থাকতে পারে আবার উৎপাদনের বিশেষীকরণও ঘটতে পারে।

অন্যান্য তত্ত্বের মত অগাষ্ট লসের তত্ত্বেরও কতকগুলি পূর্বশর্ত আছে। সেগুলি যথাক্রমে—

(ক) অঞ্চলটির ভূমিরূপ সমতল প্রকৃতির এবং উৎপাদনের উপযুক্ত কাঁচামাল সর্বত্র সমানভাবে পাওয়া যাবে।

(খ) পরিবহণ ব্যয় সর্বত্র সমান এবং দূরত্বের সঙ্গে সমানুপাতিক হবে।

(গ) অঞ্চলটির অধিবাসীদের চাহিদা, পছন্দ একই প্রকার হবে।

(ঘ) উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা একই প্রকার থাকবে।

(ঙ) অঞ্চলটিতে জনসংখ্যার সুষম বণ্টন দেখা যাবে।

(চ) অঞ্চলটি কৃষিতে স্বনির্ভর হবে এবং সকলের ক্রয়ক্ষমতা কমবেশী একই প্রকার থাকবে।

অগাষ্ট লসের তত্ত্বে একটি অঞ্চলের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ তিনটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ হয়। পর্যায়গুলি নিম্নরূপ —

I. প্রথম পর্যায়ে লস দেখিয়েছেন যে যথেষ্ট পরিমাণে এবং সুষম চাহিদা থাকলে কোন পণ্যের বাজারী অবস্থান

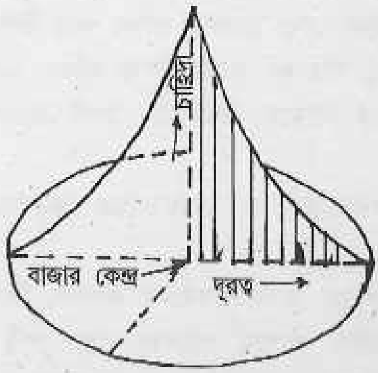

চাহিদা শঙ্কু : চাহিদা যেখানে সর্বাধিক, সেখানে শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হবে।
দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা কমতে থাকে।

(চিত্র 1.7)

একটি চাহিদা শঙ্কুর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। অনুভূমিক অক্ষে দূরত্ব এবং উল্লম্ব অক্ষে চাহিদার পরিমাণ ধরলে সর্বাধিক চাহিদার স্থানটিতেই উৎপাদন কেন্দ্র ও বাজার অবস্থিত হবে কারণ, ঐ স্থানে মুনাফা সর্বোচ্চ হবে। ঐ কেন্দ্র থেকে পণ্য যতদূরে নিয়ে যাওয়া হবে ততই পরিবহণ ব্যয় বাড়বে ও চাহিদা কমবে। চাহিদা কমতে কমতে একসময় নিম্নমুখী চাহিদা রেখা ভূমি স্পর্শ করবে। উৎপাদন কেন্দ্রের উপর শীর্ষবিন্দু থেকে চাহিদা রেখাটিকে বৃত্তাকারে ঘোরালে যে বৃত্তাকার এলাকাটি নির্দিষ্ট হবে সেটি হবে বাজারের পরিসীমা। (চিত্র 1.7)

II. দ্বিতীয় পর্যায়ে ঐ চাহিদা এলাকার মধ্যে একাধিক উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হবে। এরপর সর্বোচ্চ সংখ্যক ক্রেতার নিকট পৌঁছনোর জন্য উৎপাদন সংস্থাগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হবে। সব সংস্থা সমানভাবে সব ক্রেতার নিকট পৌঁছতে না পারার দরুণ সীমানা বরাবর কিছু অঞ্চল অসেবিত থেকে যাবে। এই অবস্থায় উৎপাদন কেন্দ্রের প্রভাব বলয়ের আকৃতি গোলাকার থেকে পরিবর্তিত হতে থাকে। যে অঞ্চলগুলি অসেবিত থাকবে সেগুলিতে পৌঁছনোর জন্য নতুন নতুন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার কেন্দ্র স্থাপিত হবে। একটি প্রধান বাজারী এলাকার মধ্যে এভাবে নতুন দ্বিতীয় ধাপের কেন্দ্র গড়ে উঠবে। (চিত্র 1.8)

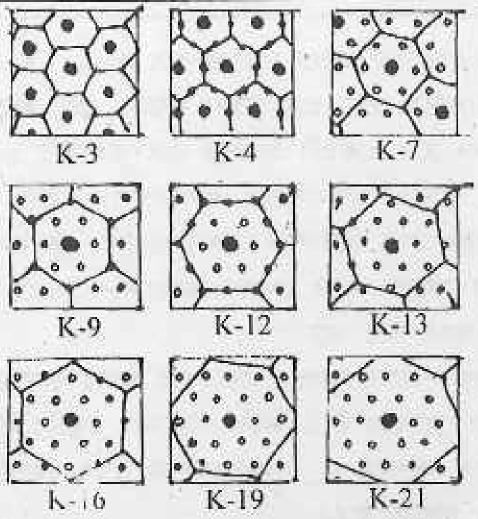

লসের মতে K-এর সংখ্যা এবং বাজার এলাকা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।

(চিত্র 1.8)

III. তৃতীয় পর্যায়ে দুটি বাজার এলাকার মধ্যবর্তী ফাঁক ক্রমশঃ ভরাট হতে থাকবে এবং নতুন নতুন সংস্থা ঐ ফাঁক ভরাট করার জন্য এগিয়ে আসবে। যত নতুন বাজার এলাকা তৈরী হবে তত বৃত্তাকার বাজার এলাকার আকৃতি ষড়ভুজে পরিণত হবে। লস একটি অঞ্চলে একসাথে উচ্চতর ধাপের ছয়টি উৎপাদন কেন্দ্র ও নিম্নতর ধাপের আরও ছয়টি উৎপাদন কেন্দ্র থাকতে পারে বলে দেখিয়েছেন যাদের তিনি যথাক্রমে city rich centre এবং city poor centre নামে অভিহিত করেছেন। লসের মতে, যখন একটি অঞ্চলে অনেকগুলি প্রভাব ষড়ভুজ তৈরী হয় এবং একটি প্রধান কেন্দ্রকে ঘিরে প্রভাব বলয়গুলি একটি আরেকটির ওপর আরোপিত হতে থাকে তখন প্রধান কেন্দ্রটি একটি মেট্রোপলিস-এ পরিণত হয়। অর্থাৎ একটি মেট্রোপলিসের চারপাশে তাকে কেন্দ্র করে অনেক বাজারী ষড়ভুজ গড়ে উঠতে থাকে।

ক্রিস্টলার এবং লসের তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য হল যদিও দুজনেই K ধ্রুবকের কথা বলেছেন, কিন্তু ক্রিস্টলারের মত লসের ধ্রুবকের মান নির্দিষ্ট নয়। লসের তত্ত্বে K-এর মান বাজারের আয়তন, পণ্যের সংখ্যা ও মান, প্রধান কেন্দ্র থেকে অন্যান্য বসতির দূরত্বের উপর নির্ভর করে। শহরের অবস্থান সম্বন্ধীয় অন্যান্য তত্ত্বগুলির তুলনায় লসের তত্ত্ব অনেক নমনীয় হলেও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। তাঁর প্রাক শর্ত অনুযায়ী আদর্শ এলাকা বাস্তবে খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবুও তাত্ত্বিক আলোচনা হিসাবে এই তত্ত্বের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই তত্ত্বে শহর এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার পরস্পর নির্ভরতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রের মধ্যে যে তার নিজস্ব প্রভাব বলয়ের আয়তন বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা রয়েছে এবং তার ফলেই যে কেন্দ্রগুলির কার্যাবলীর জটিলতা বৃদ্ধি পায় তাও এই তত্ত্বে স্বীকার করা হয়েছে।

1.13 ক্রিস্টলারের কেন্দ্রীয় স্থান তত্ত্ব (Central Place Theory of Walter Christaller)

1933 সালে দক্ষিণ জার্মানীর বাভোরিয়া অঞ্চলে সমীক্ষা করে Walter Christaller "Die Zentralen Oric Suddentschland" গ্রন্থে তাঁর কেন্দ্রীয় স্থান তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এই তত্ত্বে তিনি একটি শহরকে সেবা দানকারী (service provider) এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে সেবা গ্রহণকারী (service receiver) বলে চিহ্নিত করেছেন। একটি শহর যেমন স্থানীয় অধিবাসীদের কার্যকলাপের কেন্দ্র তেমনি পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের মানুষজনও নানা প্রয়োজনে শহরের উপর নির্ভরশীল। কোন এলাকায় ক্ষুদ্রতম বসতিগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পরিষেবা কেন্দ্রের উপর, সেগুলি আবার বৃহত্তর কেন্দ্রের উপর নানা কারণে নির্ভর করে। এইভাবে প্রতিটি পরিষেবা কেন্দ্রের নিজস্ব প্রভাব বলয় গড়ে ওঠে।

ক্রিস্টলারের তত্ত্বটিতে পরিষেবা কেন্দ্রের অবস্থান এবং তার প্রভাব বলয়ের ব্যাপ্তি নির্ধারণের জন্য তিনি কোন বসতির টেলিফোন সংযোগের সংখ্যার উপর নির্ভর করেছেন। তত্ত্বটির সুষ্ঠ প্রয়োগের জন্য তিনি তিনটি পূর্বশর্ত আরোপ করেছেন। সেগুলি যথাক্রমে— (i) সমগ্র এলাকায় একই ধরণের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদান বজায় থাকতে হবে।

(ii) সমগ্র এলাকায় জমির দাম একই প্রকার থাকবে ; এবং

(iii) যাতায়াত ব্যবস্থা সড়ক পথের উপর নির্ভর করবে এবং মানুষজন হাঁটাপথেই যাতায়াত করবে। ক্রিস্টলারের তত্ত্বে ক্রমউচ্চ পরিষেবা কেন্দ্রের তালিকায় প্রথমে ক্ষুদ্র গ্রাম, তারপর বড় গ্রাম, শহর, নগর ও শেষে মেট্রোপলিস অবস্থান করছে।

ক্রিস্টলারের তত্ত্বে কোন পরিষেবা কেন্দ্রের প্রভাব বলয়ের ব্যাপ্তি ও গভীরতা বৃহত্তম কেন্দ্র থেকে ক্ষুদ্রতম কেন্দ্রের দিকে কিভাবে প্রসারিত হবে তা তিনটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত—

(i) $K = 3$ Marketing Principle (বাণিজ্যিক সূত্র)—এই নীতি অনুসারে গ্রামাঞ্চলের উৎপাদিত দ্রব্য পরবর্তী ধাপের বসতি হয়ে উচ্চতর ধাপের বসতির দিকে বিক্রয়ের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। বিপরীত ক্রমে উচ্চতম ধাপের শহর থেকে নিম্নতর ধাপের বসতি হয়ে ভোগ্যপণ্য গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে যায়। এইভাবে দেখা যায় প্রতিটি পরিষেবা কেন্দ্রের প্রভাব বলয়ের ব্যাপ্তি ও তার অন্তর্গত বসতির সংখ্যা নিম্নতর কেন্দ্রটির থেকে 3 গুণ বেশী

হয়। এই মানকে ক্রিস্টলার K বা ধ্রুবক এবং এই বৃদ্ধির হারকে K-3 সংখ্যা দ্বারা নির্দেশ করেছেন। এই সূত্র অনুযায়ী, প্রথম পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চতর পর্যায়ে অবস্থিত শহরের প্রভাব বলয়ের অন্তর্গত বসতির সংখ্যা বৃদ্ধির হার নিম্নরূপ :

1 – প্রথম পর্যায়ে বসতির সংখ্যা

1×3 — দ্বিতীয় পর্যায়ে বসতির সংখ্যা

3×3 — তৃতীয় পর্যায়ে বসতির সংখ্যা

9×3 — চতুর্থ পর্যায়ে বসতির সংখ্যা ইত্যাদি।

অর্থাৎ এই নীতি অনুসারে প্রতিটি বসতির প্রভাব বলয়ের অন্তর্ভুক্ত বসতির সংখ্যা আগের পর্যায়ের থেকে জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাবে।

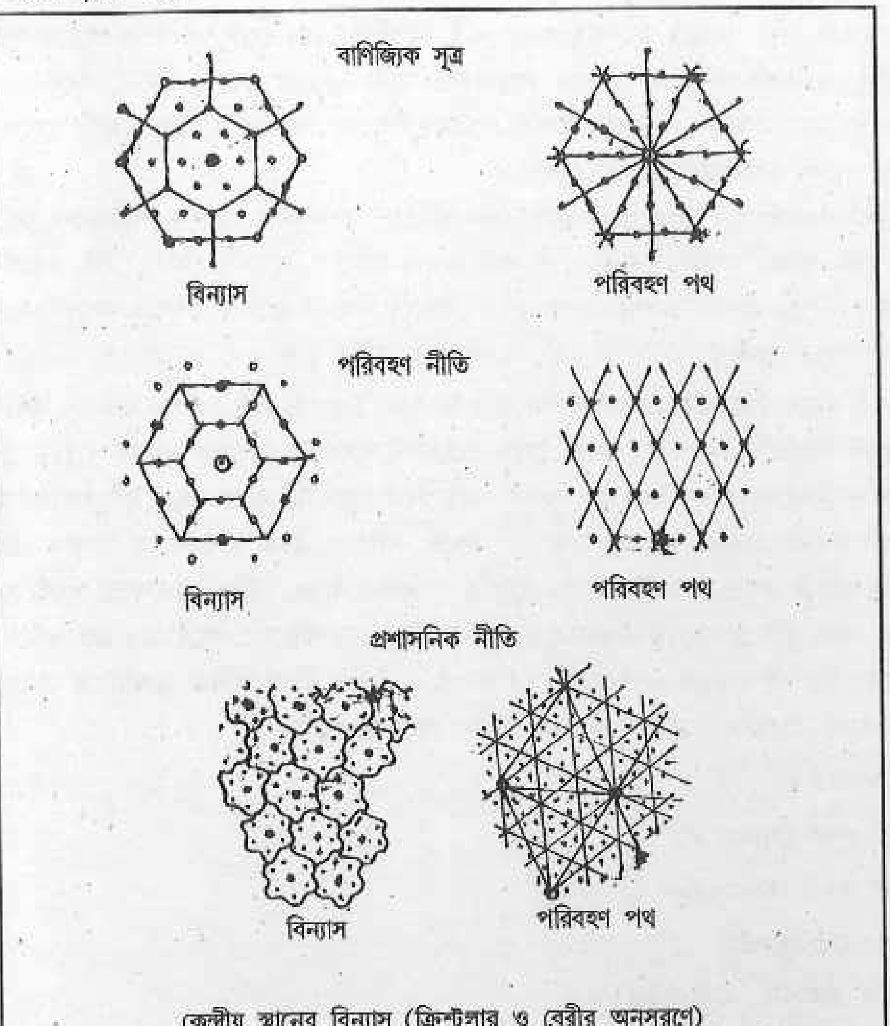

কেন্দ্রীয় স্থানের বিন্যাস (ক্রিস্টলার ও বেরীর অনুসরণে)

(চিত্র 1.9)

(ii) K - 4 Transport Principle (পরিবহণ নীতি) — বাণিজ্যের জন্য পরিবহণ সুগম হওয়া প্রয়োজন। ক্রিশ্টলার সড়ক পরিবহণের কথাই কেবলমাত্র উল্লেখ করেছেন। উন্নততর শহরগুলি থেকে সড়ক পথ জালের মত চতুর্দিকে বিস্তৃত থাকবে এবং বসতিগুলি একটি আরেকটির থেকে সমদূরত্বে অবস্থান করবে। আদর্শ পরিস্থিতিতে সর্ববৃহৎ পরিষেবা কেন্দ্র থেকে রাস্তাগুলি চতুর্দিকে সমান কৌণিক দূরত্বে সাইকেলের চাকার রডের মত বিন্যস্ত থাকবে। যে সড়ক পথ সবচেয়ে বেশী সংখ্যক বসতিকে সবচেয়ে কম দূরত্ব অতিক্রম করে যুক্ত করবে বাণিজ্যিক পরিষেবার ক্ষেত্রে সেই কেন্দ্রের গুরুত্ব তত বেশী। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একটি বড় শহর ক্ষুদ্রতর 4টি শহরকে বাণিজ্যিক পরিষেবা দেবে। এইভাবে পরবর্তী পর্যায়ের বসতি 4×4=16টি বসতিকে যোগান দেবে। ক্রিশ্টলার তাঁর পরিবহণ নীতিকে তাই K-4 হিসাবে নির্দেশ করেছেন। পরিবহণ নীতির তিনটি ধাপ বর্তমান—

প্রথমে, গ্রামগুলি ছোট শহরকে সরবরাহ করবে এবং বিপরীত ক্রমে ছোট শহরগুলি গ্রামকে সুবিধা দেবে।

দ্বিতীয় ধাপে ছোট শহরগুলি ও অপ্রধান নগরগুলির মধ্যে সুবিধার আদান প্রদান ঘটবে।

এবং শেষ পর্যায়ে, অপ্রধান নগরগুলি প্রধান নগরকে যোগান দেবে এবং প্রধান নগর থেকে বাণিজ্যিক সুবিধা নিম্নতর ধাপের নগরগুলিতে বণ্টিত হবে।

(iii) K-7 Administrative Principle (প্রশাসনিক নীতি)— প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করাও শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। একটি প্রধান নগর তার প্রভাব বলয়ের অন্তর্গত আরও 7টি অপ্রধান শহরের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনায় সাহায্য করতে পারে। এভাবে নিম্নতর ধাপের অন্তর্গত বসতির সংখ্যা 7 গুণ হারে বাড়তে থাকবে। যেমন— 1, 7, 49, 343........ইত্যাদি। (চিত্র 1.9)

ক্রিশ্টলার যে সময়ে তাঁর তত্ত্ব প্রণয়ন করেন সেই সময় যান্ত্রিক পরিবহণ ব্যবস্থার প্রচলন কম ছিল। তাই তাঁর তত্ত্বে আদর্শ পরিস্থিতিতে প্রতিটি বসতি থেকে আরেকটি বসতিতে যাওয়ার সময়কাল তিনি 2 ঘণ্টা ধার্য করেছেন। একজন মানুষের হাঁটার গতি যদি ঘণ্টায় সাড়ে তিন কিলোমিটার হয় তবে দুটি বসতির মধ্যে দূরত্ব হবে 7 কি.মি.। সুতরাং প্রতিটি বসতির প্রায় 3.5 কি.মি. ব্যাসের একটি পশ্চাদভূমি থাকবে। তাত্ত্বিক দিক থেকে সেক্ষেত্রে প্রতিটি কেন্দ্রের প্রভাব বলয়ের আকৃতি গোলাকার হওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে একটি আরেকটিকে অধিক্রম করবে অথচ দুটি গোলাকৃতি এলাকার মধ্যবর্তী অংশ কোন পরিষেবা পাবে না। এই কারণে ক্রিশ্টলার গোলাকৃতি প্রভাব বলয়কে ষড়ভুজ এলাকা হিসাবে ধরেছেন। তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানীতে ক্রমানুসারে 7টি শ্রেণীর বসতি লক্ষ্য করেছেন। সেগুলি নিম্নতম পর্যায় থেকে যথাক্রমে—

ক্ষুদ্রপল্লী (Marktort)

গ্রামীণ ছোট শহর (Amstort)

গ্রামীণ কেন্দ্র শহর (Kreesstat)

জেলা শহর (Bezirkstadt)

ছোট রাজ্যের রাজধানী (Ganstadt)

প্রাদেশিক মুখ্য রাজধানী (Provinzstadt)

আঞ্চলিক রাজধানী (Landstadt)

ক্রিশ্টলারের কেন্দ্রীয় স্থান তত্ত্ব তাঁর নিজের দেশ জার্মানী এবং অন্যত্র নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে। প্রথমতঃ, তিনি কেবলমাত্র একটি উপাদান টেলিফোন সংযোগের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় স্থান নির্বাচন করেছেন, যা তথ্য হিসাবে অপ্রতুল।

দ্বিতীয়তঃ, তাঁর বর্ণিত তিনটি নীতির সুষ্ঠ প্রয়োগ জনসংখ্যার আয়তন ও বৈশিষ্ট্য এবং স্থানটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে। বাণিজ্যিক সূত্র সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হওয়ার জন্য স্থানটির জনসংখ্যার বন্টন ও অর্থনৈতিক অবস্থা এক হওয়া বাঞ্ছনীয়। পরিবহণ নীতি সুপ্রযুক্ত হতে গেলে ঐ অঞ্চলের জনবসতি পথের ধারে রৈখিক আকারে বিন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। বসতি স্থাপিত হওয়ার পূর্বেই যদি প্রশাসনিক স্তরবিন্যাস সম্পূর্ণ করা থাকে তবেই প্রশাসনিক নীতির সঠিক রূপায়ণ সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে এরূপ আদর্শ পরিস্থিতি খুঁজে পাওয়া যায় না।

সমালোচনা সত্ত্বেও ক্রিশ্টলারের তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। গত পঞ্চাশ বছর ধরে আঞ্চলিক উন্নয়নের আলোচনায় কেন্দ্রীয় স্থান চিহ্নিতকরণ গুরুত্ব পেয়েছে। নগর পরিকল্পনা, সমাজ পরিকল্পনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্থানের মূল্য স্বীকৃত হয়েছে। জার্মানীতে লস, ফ্রান্সে পনসার্ড, সুইডেনে হ্যাগার স্ট্র্যান্ড, U.S.A.-তে ইসরাড, বেরী প্রমুখ 'আঞ্চলিক বিজ্ঞানের' বিভিন্ন শাখায় এই তত্ত্বটিকে আরও সুসংহত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

1.14 বিকাশ মেরু তত্ত্ব (Growth Pole Theory)

কোন অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নের সঙ্গে নগরায়ণের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। নগরায়ণের প্রাথমিক অবস্থায় জীবনযাত্রার মান ও প্রাত্যহিক ব্যয় শহরগুলিতে বেশী থাকার ফলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ কম ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে মাথাপিছু আয় বাড়ার ফলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু সামাজিক পরিষেবা ক্ষেত্রগুলি, যেমন, আইন-আদালত, শিক্ষা, চিকিৎসা, পরিবহণ, বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ প্রভৃতি থেকে আয় বাড়তে থাকে ফলে বিনিয়োগের মাত্রাও বাড়ে। এইভাবে ক্রমাগত কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের তুলনায় পরিকাঠামো ও সেবামূলক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়তে থাকে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে সামগ্রিক উন্নয়ন ও কর্মনিযুক্তিতে বৈষম্য সৃষ্টি হয়। অপরদিকে ভিন্নতর ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ায় কৃষিক্ষেত্র থেকে শ্রমিকের একটা অংশ শিল্প, পরিকাঠামো ও সেবাক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়। এভাবে কিছু দিনের মধ্যে নতুন ভারসাম্য স্থাপিত হয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন ঘটে।

আঞ্চলিক উন্নয়নকে এক বা একাধিক উৎকর্ষ কেন্দ্রের বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত করে যে তত্ত্বের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে সেটি Growth Pole Theory বা বিকাশ মেরু তত্ত্ব নামে পরিচিত। ফরাসী পরিকল্পনাকার Francis Perroux প্রথম এই তত্ত্বের উল্লেখ করেন। তাঁর মতে কোন অঞ্চলের সর্বত্র একই সময়ে বৃদ্ধি ও উন্নতি ঘটে না, কোন কোন স্থানে অন্যান্য স্থানের তুলনায় দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। ঐ বিকাশ মেরু থেকে নানা পথে বিভিন্ন মাত্রায় উন্নয়নের সুফল অন্যত্র ছড়িয়ে যায় ও শেষপর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলটির উন্নতি ঘটে। বিকাশ মেরু বলতে Perroux কোন শিল্প কারখানা, শিল্পাঞ্চল বা বাণিজ্যিক অঞ্চলকে বোঝান নি, বরঞ্চ তিনি অর্থনৈতিক ও বহুমুখী কর্মধারাকে বুঝিয়েছেন।

ফরাসী পরিকল্পনাকারদের আলোচনায় এই বিকাশ মেরুর ধারণা প্রথম দেখা যায়। কোন বড় অঞ্চলের মধ্যে একটি বা একাধিক নির্দিষ্ট স্থান যত উন্নতি করে ততই অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে ঐ অংশের অসাম্য তৈরী হয়। এই অসাম্যের ফলে অন্যান্য অঞ্চলের ঐ বিশেষ বিকাশ মেরুর উপর নির্ভরতা তৈরী হয় এবং বিকাশ মেরু ক্রমশঃ বড় ও বহুমুখী কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ক্রমশঃ এর ফলে সমগ্র অঞ্চল উপকৃত হয় ও উন্নয়ন ঘটে।

ভারতে R. P. Misra বিকাশ কেন্দ্রের চারটি ধাপ দেখিয়েছেন।

(i) স্থানীয় সেবা কেন্দ্র (Local service Centre) — কোন গোষ্ঠীবদ্ধ জনবসতি যার জনসংখ্যা 5,000 - 10,000 জনের মধ্যে থাকে সেগুলি পার্শ্ববর্তী ছোট হ্যামলেট (Hamlet) গুলির সেবাকেন্দ্রের কাজ করে। এগুলিতে মুদীখানা, খাবারের দোকান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের স্কুল, দর্জির দোকান, পোস্ট অফিস, কো-অপারেটিভ প্রভৃতি থাকে। এখানে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি এবং পঞ্চায়েত ভবন প্রভৃতি স্থানীয় প্রশাসনিক কেন্দ্র থাকে।

(ii) বৃদ্ধি কেন্দ্র (Growth Points) – এগুলি দ্বিতীয় ধাপের কেন্দ্র। এদের জনসংখ্যা 50,000 – 100,0000। এগুলি অন্ততঃপক্ষে 10 থেকে 20টি স্থানীয় সেবা কেন্দ্রের উচ্চতর প্রয়োজন মেটায়। এগুলিই মূলতঃ বাণিজ্যকেন্দ্র এবং কৃষিজাত পণ্যের প্রধান সংগ্রহ ও বণ্টন কেন্দ্র।

(iii) বিকাশ কেন্দ্র (Growth Centre)—এগুলি মুখ্যতঃ শিল্পোৎপাদন কেন্দ্র এবং কমপক্ষে 1,00,000 থেকে 2,00,000 জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটায়। এগুলিতে শস্য সংগ্রহ ও গুদামজাত করণ, সার, কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রভৃতির যোগান, কলেজ স্তরের শিক্ষাকেন্দ্র, কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র, হাসপাতাল প্রভৃতি থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রের কার্যকলাপই এই কেন্দ্রগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।

(iv) বিকাশ মেরু—উন্নয়নের একেবারে চূড়ান্ত ধাপে রয়েছে বিকাশ মেরু। এগুলির জনসংখ্যা 5,00,000 থেকে 25,00,000। তৃতীয় ক্ষেত্রের সেবামূলক কার্যই প্রাধান্য পায়। কোন অঞ্চলের অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাণকেন্দ্র হল এই বিকাশ মেরু।

গত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বিকাশ মেরু তত্ত্ব পৃথিবীর সর্বত্র গুরুত্ব পেতে শুরু করে। প্রথমতঃ মেট্রোপলিটান শহরগুলি এত দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে যে সেগুলি থেকে শিল্প ও প্রশাসনিক কাজকর্ম বিকেন্দ্রীকরণ অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ বড় বড় শহর ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের মধ্যে জীবনযাত্রা ও অর্থনীতির মানের বৈষম্য অতি মাত্রায় প্রকট হয়ে ওঠে। সুতরাং এই এককেন্দ্রীকরণ ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার জন্য গ্রামাঞ্চলে প্রথম ধাপের ছোট ছোট বিকাশ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। এগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাঁচামালের উৎপাদন কেন্দ্রে অথবা তার নিকটেই শিল্প কারখানা গড়ে তোলা যাতে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর হয়ে সমগ্র অঞ্চলটি উন্নত হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ ভারতে ভিলাই, রৌরকেল্লার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

1. ওয়েবারের শিল্পস্থানিকতার ন্যূনতম ব্যয় তত্ত্ব বিশ্লেষণ করুন।

2. বাজারী অবস্থান বা মুনাফা সর্বাধিকীকরণ তত্ত্ব বলতে কি বোঝেন ?

3. ওয়েবারের তত্ত্বের নীরিখে বাজার ও কাঁচামালের অবস্থান কিভাবে শিল্পের অবস্থানকে প্রভাবিত করে লিখুন।

4. ক্রিশ্টলারের কেন্দ্রীয় স্থান তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করুন।

5. ক্রিশ্টলারের মতে কেন্দ্রীয় স্থানের অবস্থান ও তার প্রভাব বলয়ের বিস্তৃতি কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

6. বিকাশ মেরু তত্ত্বের দ্বারা সমগ্র অঞ্চলের উন্নয়ন কিভাবে হওয়া সম্ভব তা আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

1. ওয়েবারের অবস্থান ত্রিভুজ ব্যাখ্যা করুন।
2. চাহিদা শঙ্কু কি?
3. আইসোটিম ও আইসোডাপেন বলতে কি বোঝায়?
4. ক্রিশ্টলারের তত্ত্বে বাজার নীতি কি?
5. পরিবহণ নীতি বলতে কি বোঝায়?
6. K-7 কি?
7. বিকাশ কেন্দ্রগুলির পর্যায়ক্রম আলোচনা করুন।

উত্তরমালা :

1. 1.11 অংশ দেখুন।
2. 1.12 অংশ দেখুন।
3. 1.11 অংশ দেখুন।
4. 1.13 অংশ দেখুন।
5. 1.13 অংশ দেখুন।
6. 1.14 অংশ দেখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর :

1. 1.11 অংশ দেখুন।
2. 1.12 অংশ দেখুন।
3. 1.11 অংশ দেখুন।
4. 1.13 অংশ দেখুন।
5. 1.13 অংশ দেখুন।
6. 1.13 অংশ দেখুন।
7. 1.14 অংশ দেখুন।

একক 2 ❑ শহরের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ (Definition of Towns and its classification)

গঠন

2.1 শহরের সংজ্ঞা

2.2 শহরের শ্রেণীবিভাগ

2.3 মহানগর তত্ত্ব ও মহানগর এলাকা সম্বন্ধে ধারণা

2.4 মেট্রোপলিটান এলাকার সীমা নির্ধারণ

2.5 মহানগরের সমস্যা

2.6 মেট্রোপলিটান পরিকল্পনা

2.7 গ্রাম—নগরের যোগাযোগ

2.8 গ্রাম—নগরের সম্পর্কের ক্ষেত্রসমূহ

2.0 শহরের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ

2.1 শহরের সংজ্ঞা ঃ শহরের গঠনগত বৈচিত্র্য, কর্মকাণ্ডের বহুমুখীতা, সামাজিক জীবনচর্চার বহুমাত্রিকতা এত বিস্তৃত যে কোন একটি সাধারণ সংজ্ঞায় শহরকে বর্ণনা করা কঠিন। তাই বিভিন্ন ভূগোলবিদ্ বিভিন্ন সময়ে শহরের নানান সংজ্ঞা দিয়েছেন। Emrys Jones তাঁর 'Towns and Cities' গ্রন্থে শহরকে রাস্তা ও অট্টালিকার সমারোহ, শাসন ব্যবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কেন্দ্র, শহরে আধুনিক মনস্ক সমাজের প্রাণকেন্দ্র বলে বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে শহরের আয়তন, জনসংখ্যা, রাস্তাঘাট বাড়িঘরের বিন্যাস, কর্মধারা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। যে সকল বৃহদাকৃতি গোষ্ঠীবদ্ধ জনবসতির প্রধান কর্মধারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্র কেন্দ্রিক, যেখানের মানুষজন নাগরিক জীবনধারায় অভ্যস্ত এবং প্রশাসনব্যবস্থা মিউনিসিপ্যালিটি অথবা নোটিফায়েড এরিয়া কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হয় তাকে শহর বলে।

শহরকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। যেমন— বাহ্যিক জনসংখ্যা অনুযায়ী, সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ইত্যাদি।

(ক) বাহ্যিক সংজ্ঞা — যে গোষ্ঠীবদ্ধ জনবসতি আকারে বৃহৎ, যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত, বড় বড় অট্টালিকা দ্বারা সুসজ্জিত তাকে শহর বলে। এছাড়াও শহরে নাগরিক সুযোগসুবিধা অর্থাৎ সুগঠিত নিকাশী ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহ, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, আমোদপ্রমোদের জন্য নানাবিধ আয়োজন, উন্নতমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি থাকতে হবে। শহর থেকেই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রশাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

(খ) জনসংখ্যা অনুযায়ী — অনেক দেশে জনসংখ্যাকে শহর বসতির সংজ্ঞা হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

যেমন, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে কোন জনপদের জনসংখ্যা 250-এর বেশি হলে তাকে শহর বলা হয়। অনুরূপভাবে কানাডায় 1000 ; ফ্রান্স, পর্তুগাল, আর্জেন্টিনাতে 2000 ; যুক্তরাষ্ট্রে 2500 ; জাপানে 3000 ; গ্রীস ও স্পেনে 10,000 ; নেদারল্যান্ডে 20,000 জনসংখ্যা বিশিষ্ট জনপদকে শহর বলা হয়।

(গ) সমাজতাত্ত্বিক সংজ্ঞা — সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা মনে করেন যে, নাগরিক মনন ও চিন্তাধারা গ্রামীণ চিন্তাধারার থেকে পৃথক। বহু ভিন্ন জাতি, ধর্ম, ভাষা, আর্থসামাজিক অবস্থার মানুষ শহরে পাশাপাশি বাস করে। বহুদিন ধরে একসাথে থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধন শিথিল যা কখনও কখনও সামাজিক অস্থিরতার সৃষ্টি করে। শহুরে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মানুষ এক ভিন্ন জীবন পদ্ধতি (Way of life) অনুসরণ করে।

শহরকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য উপরোক্ত কোন পদ্ধতিই ত্রুটিমুক্ত নয়। শহরে যেমন অনুপম স্থাপত্য থাকে তেমনি বস্তি, ঝুপড়ি, দুর্গন্ধময়, অস্বাস্থ্যকর নিম্নমানের আবাসনও পাশাপাশি অবস্থান করে। শহরের সর্বত্র নাগরিক সুযোগ সুবিধা সমানভাবে পৌঁছয় না। শহরের সঙ্গে শহরতলি এলাকাও সংযুক্ত থাকে যার গঠনগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গ্রামীণ বসতির অনেক সাদৃশ্য আছে। আবার জনসংখ্যাকে শহরের সংজ্ঞার মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করলে দেশ ভেদে বিশাল পার্থক্য দেখা যাবে। জনবহুল উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এমন বহু গ্রাম আছে যাদের জনসংখ্যা 10,000 বা তার চেয়েও বেশী। শহরের সংজ্ঞায় এই সব সমস্যার দরুণ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (U.N.O.) আয়তন অনুযায়ী শহরের সংজ্ঞা নির্ধারণ করার পরামর্শ দিয়েছে। ভারতে তিনটি উপাদানের উপর নির্ভর করে শহরের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। কোন জনবসতির (i) লোকসংখ্যা 5,000 জন বা তার বেশী হতে হবে ; (ii) প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব কমপক্ষে 386 জন হতে হবে ; এবং (iii) মোট কর্মনিযুক্ত জনসংখ্যার অন্ততঃ 75 শতাংশের বেশী লোককে অ-কৃষি কর্মে নিযুক্ত থাকতে হবে। ভারতের জনগণনা সমীক্ষা অনুযায়ী 50,000 -এর কম জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরগুলিকে ক্ষুদ্র শহর ; 50,000 থেকে 100,000 জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরগুলিকে প্রধান শহর ; 100,000-এর অধিক জনসংখ্যা হলে তাকে নগর ও 10,000,000-এর বেশী জনসংখ্যা বাস করলে শহরগুলিকে মেট্রোপলিস বলা হয়।

বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক Lewis Mumford শহরকে এভাবে বর্ণনা করেছেন— ''It is art, culture and political purpose, not numbers, that define a city''. Mumford-এর মতে শহর একটি চুম্বকের মত যার আধারটি হল শহরের কায়িক গঠন অর্থাৎ, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট প্রভৃতি বিভিন্ন নির্মাণ। শহরের জীবনযাত্রা, জীবিকার সুযোগ, বিনোদনের হাতছানি তার চৌম্বকীয় গুণ যা একদিক থেকে মানুষজন ও অপরদিক থেকে নানা ধরণের প্রতিষ্ঠানকে শহরের দিকে আকর্ষণ করে। এভাবে পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের সাথে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে শহর ক্রমশঃ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করে।

একটি শহরের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে Griffith Taylor চারটি পর্যায় লক্ষ্য করেন।

শৈশব অবস্থা— ছোট শহরগুলিকে টেলর শহরের শৈশব অবস্থা বলে অভিহিত করেন। শহরের এই অবস্থায় বাণিজ্যিক এলাকাগুলি পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় না। আবাসিক এলাকা ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র একসাথে অবস্থান করে। রাস্তাঘাট এবং বাড়িঘরের বিন্যাস বিশৃঙ্খল ও শহরটি অপরিকল্পিতভাবে বাড়তে থাকে।

কৈশোর অবস্থা— শহর বিকাশের এই পর্যায়ে আকাশরেখা ক্রমশও উঁচু হতে থাকে। কলকারখানা গড়ে ওঠে। স্থানাভাবের ফলে বাড়িগুলির উচ্চতা বাড়তে থাকে, জমির দাম বাড়ে।

পরিণত অবস্থা— নগরের বিকাশের পরিণত অবস্থায় বাণিজ্যিক এলাকাগুলি আবাসিক এলাকা থেকে পৃথকভাবে গড়ে ওঠে। শহরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন এলাকাগুলি কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী বিন্যস্ত হতে থাকে। নতুন নতুন আবাসিক এলাকা সংযোজিত হয় এবং শহরতলি অঞ্চল বিস্তৃত হতে থাকে। নগরের বিকাশের এটি চূড়ান্ত পর্যায়। এই অবস্থায় একটি শহর সবচেয়ে গতিশীল ও সম্ভাবনা পূর্ণ থাকে।

বার্ধক্য— নগরের বিকাশ যখন স্তব্ধ হয়ে যায় তখন তার বার্ধক্য অবস্থা। অর্থনৈতিক কাজকর্মের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। নতুন করে আর কোন শিল্প কেন্দ্র বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে না। নাগরিক পরিষেবার মানের অবনমন ঘটে। নগরের বিকাশের এটি শেষ অবস্থা। এই অবস্থায় এলে তখন পার্শ্ববর্তী অন্য কোন পরিষেবা কেন্দ্র তার গুরুত্ব বাড়াতে থাকে।

2.2 শহরের শ্রেণীবিভাগ

শহর বসতির গঠনগত বিন্যাস, রাস্তাঘাটের বিস্তার, নির্মাণ ও স্থাপত্য, কর্মকাণ্ডের বৈচিত্র্য, সাংস্কৃতিক বিনিময় সময় যত অগ্রসর হয় ততই জটিল থেকে জটিলতর আকার ধারণ করে। প্রতিটি শহর বসতির ক্রমবিস্তারের নিজস্ব ইতিহাস আছে। তাই শহরের শ্রেণীবিভাগ করার সময়ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলি আলোচনা করা প্রয়োজন। যেহেতু শহরের বিকাশ এবং কর্মধারা ইতিহাস বিচ্যুত নয় তাই শহরের উৎপত্তিগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটু সাধারণ ধারণা থাকা প্রয়োজন।

শহরের উৎপত্তির বিভিন্ন কারণ ঃ প্রায় 4000 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মিশরের নীল নদের ধারে মেমফিস থেবস নগর সভ্যতার সন্ধান পাওয়া যায়। সিন্ধু নদের তীরে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোতে প্রায় সমসাময়িক কালের নগর সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। উত্তর আমেরিকা ও মেক্সিকোর মায়া ও ইনকা সভ্যতাতেও শহরের অস্তিত্ব ছিল। 600 খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে 400 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপে গ্রীক-রোমান শাসনকালে অনেক শহরের দ্রুত বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটে। এর মধ্যে গ্রীসের ব্যবিলন, স্পেনের গোরডোবা ও গোরাভা, ইতালির রোম, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রায় ঐ একই সময়ে ভারতে পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী, কান্বকুব্জ, বারাণসী, মথুরা প্রভৃতি শহরের পত্তন হয়। 1000 থেকে 1600 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইউরোপে লন্ডন, ভেনিস, ফ্রাঙ্কফুর্ট, প্রভৃতি অনেগুলি বড় বড় শহর গড়ে ওঠে। ঐ একই সময়ের মধ্যে দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর, উত্তর ভারতে দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্মৌ, পেশোয়ার প্রভৃতি শহরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। পরবর্তীকালে ইউরোপীয় উপনিবেশগুলির পত্তন ও ক্রমউত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় নতুন নতুন শহর গড়ে উঠতে থাকে ও প্রাচীন শহরগুলির মধ্যে অনেকেই তাদের পুরনো গৌরব হারাতে থাকে। G. Taylor-এর মতে শহরের বিকাশের একটি চক্রাকার বৈশিষ্ট্য আছে। শাসক গোষ্ঠীর উত্থান-পতন, কর্মপদ্ধতির গুরুত্বের পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে একটি শহর তার গুরুত্ব হারায় ও আরেকটি শহর ক্রমশঃ উন্নতি করে পুরনো শহরটির স্থান অধিকার করে।

কোন শহরের কায়িক গঠন, কর্মকাণ্ড, নাগরিক মনস্তত্ত্ব ও সমাজতাত্ত্বিক গঠন সবই তার উৎপত্তি ও বিকাশের সাথে জড়িত। তাই শহরের উৎপত্তির বিভিন্ন কারণ সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা থাকা প্রয়োজন। শহরের উৎপত্তির নিম্নলিখিত কারণগুলি উল্লেখযোগ্য—

(i) রাজনৈতিক কারণ — রাজধানী শহরগুলি সারা পৃথিবীতেই ঐতিহাসিক কাল থেকেই প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য গড়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

(ii) অতিবৃহৎ গ্রাম — অনেক সময় গ্রামগুলি আয়তনে বাড়তে বাড়তে ছোট শহরে রূপান্তরিত হয়। অধিক সংখ্যক মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নাগরিক সুবিধার বন্দোবস্ত করতে হয়। প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য পঞ্চায়েতের পরিবর্তে মিউনিসিপ্যালিটির উপর দায়িত্বভার অর্পণ করতে হয়। এইভাবে ক্রমশঃ একটি গ্রাম ধীরে ধীরে শহর হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ কলকাতার উপকণ্ঠে রাজারহাট গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজারহাট মিউনিসিপ্যালিটি ও বর্তমানে রাজারহাট নিউটাউনে রূপান্তর।

(iii) ধর্মীয় কারণ — কোন কোন ক্ষেত্রে বড় মন্দির, মসজিদ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে শহর গড়ে ওঠে। যেমন পুরী, মাদুরাই, গয়া, হরিদ্বার প্রভৃতি।

(iv) শিল্পকেন্দ্রিক— বৃহৎ শিল্পোদ্যোগকে কেন্দ্র করে শহর গড়ে ওঠে। যেমন—সাক্‌চি নামের ছোট্ট গ্রাম TISCO লৌহ-ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার পর জামসেদপুর নামের বড় শহরে রূপান্তরিত হয়েছে।

(v) বাণিজ্যকেন্দ্রিক — মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ ও ঔপনিবেশিক সময়কালে স্থাপিত অধিকাংশ শহরই বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে উৎপত্তি লাভ করেছে। যেমন— কলকাতা, মুম্বাই ইত্যাদি।

(vi) যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকেন্দ্রিক—যাতায়াত ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে কোন আপাত অখ্যাত জায়গা ধীরে ধীরে বড় শহরে রূপান্তরিত হয়। যেমন বন্দর শহর পারাদ্বীপ, মার্মাগাঁও প্রভৃতি। শিলিগুড়ি, নিউ জলপাইগুড়ি প্রভৃতি উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে দেশের বাকি অংশের যোগাযোগের কেন্দ্র হিসাবে ক্রমশঃ অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

(vii) বিনোদন কেন্দ্রিক— মুসৌরি, নৈনিতাল, দার্জিলিং প্রভৃতি শৈলশহর; পানাজি, দীঘা প্রভৃতি সৈকতশহর বিনোদন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে।

(viii) পুনর্বাসন — সাধারণতঃ বাধ্যতামূলক প্রব্রজনের ক্ষেত্রে মানুষকে যখন এক স্থান থেকে অন্যত্র চলে যেতে হয় তখন যেখানে সে তার নতুন বসতি গড়ে তোলে সেখানে শহরের পত্তন হয়। দেশ ভাগের পরে দিল্লীর নিকট ফরিদাবাদ, কলকাতার উপকণ্ঠে দমদম অঞ্চল এভাবেই গ্রাম থেকে শহরে ক্রমবিবর্তিত হয়েছে।

(ix) পরিকল্পিত — বর্তমান সময়ে পুরনো শহরগুলি অতি জনাকীর্ণ হয়ে যাওয়ার ফলে নাগরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য যুক্ত দূষণমুক্ত পরিবেশে নতুন ভাবে পরিকল্পিত শহর গড়ে তোলা হচ্ছে। চণ্ডীগড়, ভুবনেশ্বর, নয়ডা প্রমুখ পরিকল্পিত ভাবে স্থাপিত শহরের উদাহরণ।

শহরের শ্রেণীবিভাগ ঃ প্রথমদিকে যদিও কোন শহর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই স্থাপিত হয় কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কর্মকাণ্ডের বিভিন্নতা, জনবসতি ও রাস্তাঘাটের বিন্যাস, সামাজিক ও নাগরিক চাহিদা ক্রমশঃ জটিল আকার ধারণ করতে থাকে, তাই সব শহরকে কোন একটি বা দুটি উপাদানের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় না। এজন্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শহরের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। এগুলি যথাক্রমে—

(I) কায়িক গঠন

(II) অবস্থান

(II) কর্মধারার বিভিন্নতা

(I) কায়িক গঠনের উপর ভিত্তি করে শহরের শ্রেণীবিভাগ (Physical classification of towns) :

শহরের কায়িক গঠনে প্রচুর বৈচিত্র্য রয়েছে। যে স্থানে শহরটি গড়ে উঠেছে তার প্রাকৃতিক অবস্থান, ঐ এলাকার সাংস্কৃতিক উপাদান এবং শহরের কর্মধারার উপর নির্ভর করে কোন শহরের কায়িক গঠন কি প্রকার হবে। শহরের আকৃতি, অবস্থান এগুলি হল কোন শহরের ভৌত বৈশিষ্ট্য যার ভিত্তিতে শহরের নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে।

(i) রৈখিক শহর — নদী তীরবর্তী স্থানে, পার্বত্য উপত্যকায়, দুটি নদীর মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে যেখানে বসতিগুলি চতুর্দিকে ছড়ানো সম্ভব নয়। সেই সব স্থানে কোন একটি অভিমুখে বসতিগুলি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে রৈখিক আকৃতির শহর গঠিত হয়। চিত্র (2.1)

কেলং উপত্যকা পৌরপুঞ্জ—রৈখিক শহরের উদাহরণ

(চিত্র 2.1)

(ii) ত্রিকোণাকার — দুটি রাস্তা রেলপথ বা দুটি নদীর মিলনস্থানে গড়ে ওঠা শহরের আকৃতি ত্রিকোণাকার। যেমন, গঙ্গা নদী, হাওড়াগামী রেলপথ ও রোহতাসগামী রাস্তার সংযোগস্থলে ত্রিকোণাকৃতি শহর ডালমিয়ানগর গড়ে উঠেছে। (চিত্র 2.2)

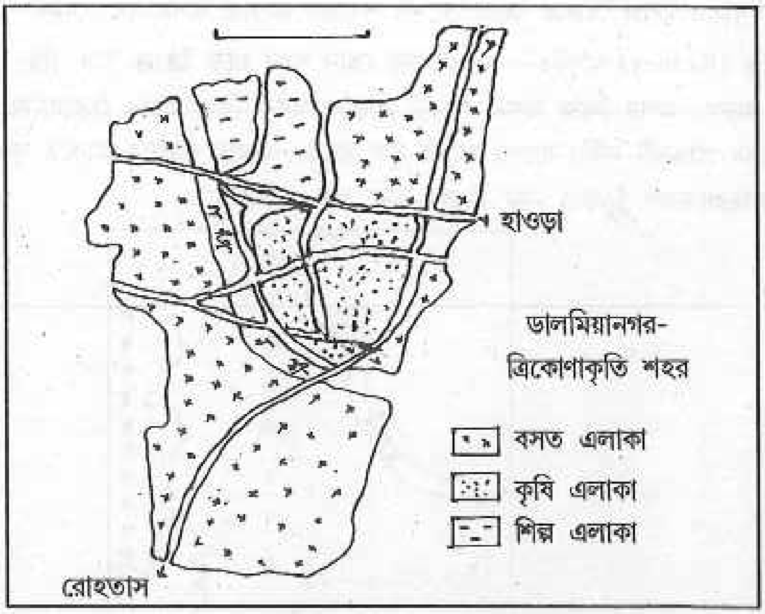

(চিত্র 2.2)

(iii) আয়তাকার—অনেকগুলি যোগাযোগ পথের কেন্দ্রস্থলে অথবা কোন দুর্গ, প্রশাসনিক কেন্দ্রকে ঘিরে গড়ে ওঠা শহরের আকৃতি আয়তাকার হয়। যেমন— সাসারাম, মুঙ্গের ইত্যাদি।

(চিত্র 2.3)

(iv) অসম আকৃতি বিশিষ্ট-যে সব শহরের বৃদ্ধি দীর্ঘ সময় ধরে পর্যায়ক্রমে ঘটে এবং কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে

এবং জনবসতির গঠনে বৈচিত্র্য থাকে সে সব শহরের আকৃতি অসম হয়। যেমন— আমেদাবাদ, আরা প্রভৃতি।

(v) বৃক্ক (Kidney) আকৃতি— নদীর ধারে কোন শহর গড়ে উঠলে তার বৃদ্ধি নদীর তীর বরাবর একদিকে সীমাবদ্ধ থাকে। অপর দিকে তখন শহরটি বাড়তে থাকে কিন্তু প্রধান যোগাযোগ পথ নদী হওয়ায় শহরটির শুরু ও শেষ প্রান্তদুটি নদীর ধারের স্বার্থেই যুক্ত থাকে। এভাবে শহরের আকৃতি বৃক্ক বা কিডনির আকার ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ চুঁচুড়ার নাম উল্লেখ করা যায়। (চিত্র 2.4)

কিডনি আকৃতির পৌরক্ষেত্র

(চিত্র 2.4)

(vi) বৃত্তাকার — সাধারণ কোন বৃহৎ শিল্পকেন্দ্রকে ঘিরে শহর গড়ে উঠলে তার আকৃতি বৃত্তাকার হয়। শহরের সব প্রান্ত থেকে যাতায়াত ব্যবস্থা কেন্দ্রাভিমুখী থাকে যাতে মূল কর্মকেন্দ্রের সঙ্গে সবার যোগাযোগ রাখার সুবিধা হয়। জামসেদপুর এই জাতীয় শহরের উদাহরণ। (চিত্র 2.5)

বৃত্তাকার শহর জামসেদপুর

(চিত্র 2.5)

(vii) ষড়ভুজাকৃতি — আধুনিক পরিকল্পিত শহরের গঠন ষড়ভুজাকৃতি হয়। ভিলাই এই প্রকার পরিকল্পিত শহরের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

II. অবস্থান : পারিপার্শ্বিক এলাকার সঙ্গে শহরের সম্পর্কের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করলে তাকে অবস্থানগত প্রকারভেদ বলা যেতে পারে।

(i) নদীগত অবস্থান — যে সব নদীগুলি নৌ-পরিবহণের জন্য উপযুক্ত তার ধারে শহর গড়ে ওঠে। এরকম উল্লেখযোগ্য দুটি শহর প্যারিস ও লন্ডন। আবার নদী চওড়া হলে তার দুধারে দুটি শহর গড়ে উঠতে দেখা যায়। যেমন, কলকাতা ও হাওড়া হুগলী নদীর দুধারে দ্বৈতশহর হিসাবে গড়ে উঠেছে। দুটি নদীসঙ্গম স্থলে নৌ-পরিবহণের সুবিধা এবং মালপত্র ওঠানামার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। যেমন, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে এলাহাবাদ শহর। নদী যেখানে সমুদ্রে এসে মেশে সেই মোহনার মুখে বন্দর তৈরির সুবিধা থাকায় ঐ বন্দরকে কেন্দ্র করে শহর গড়ে ওঠে। যেমন, লন্ডন টেমস্ নদীর মোহনায়, কলকতা হুগলী নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে গড়ে উঠেছে।

(ii) পরিবহণ পথের ধারে — যোগাযোগের পথ যত বিস্তৃত হবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ তত বাড়বে এবং শহরের পত্তন ও বিকাশ তত ত্বরান্বিত হবে। বড় হ্রদের প্রবেশ ও প্রস্থান পথের মুখে শহর গড়ে ওঠে। কারণ, এখান থেকে জলপথের শেষ হয়ে স্থলপথের শুরু। দুধরনের যোগাযোগ পথের মিলনকেন্দ্র বাণিজ্যিক ও শিল্পশহর গড়ে তোলার পক্ষে অনুকূল। উত্তর আমেরিকার হ্রদ অঞ্চলে শিকাগো, ক্লিভল্যান্ড, টরন্টো প্রভৃতি

যোগাযোগ পথের সংযোগস্থলে শহরের অবস্থান

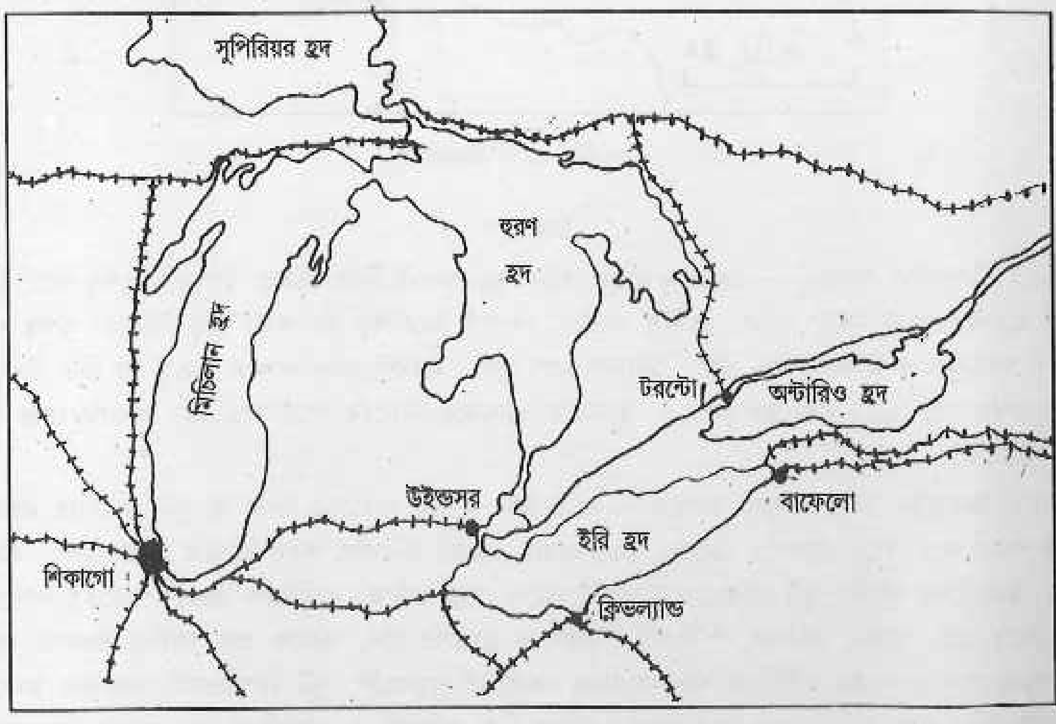

(চিত্র 2.6)

শহর গড়ে উঠেছে। (চিত্র 2.6) কৃত্রিম জলপথ বা খালপথের ধারে বাণিজ্যপথ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে শহর গড়ে ওঠে। যেমন, সুয়েজখালের দুইমুখে পোর্ট সুয়েজ এবং পোর্ট সৈয়দ। ক্ষুদ্র প্রণালীর মুখে জাহাজ পারাপারের সুবিধা করে দেওয়া এবং যাত্রী ও পরিবহণে সাহায্যের জন্য শহর তৈরি হয়। যেমন, জিব্রাল্টার প্রণালীর ধারে জিব্রাল্টার, ডোভার ও কালাইস শহরদুটি ইংলিশ চ্যানেলের দুধারে গড়ে উঠেছে। নানা দিক থেকে আসা রেলপথের জংশন স্টেশনে শহর গড়ে ওঠে। যাত্রী ও পণ্য নামা ওঠাকে ঘিরে যে ব্যবসায়িক কাজকর্ম প্রসারিত হয় তার ফলে শহর গড়ে ওঠে। যেমন, নাগপুর, খড়গপুর প্রভৃতি। (চিত্র 2.7)

প্রণালীর প্রান্তে জিব্রালটার

(চিত্র 2.7)

(iii) উপকূলীয় অবস্থান — প্রধান ভূখণ্ডের থেকে ক্ষুদ্র প্রণালী দিয়ে বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলি বন্দর গড়ে ওঠার পক্ষে আদর্শ। যেমন মুম্বই, হংকং, ভেনিস প্রভৃতি। বন্দরকে ঘিরে বড় বড় শহর গড়ে উঠেছে। প্রশস্ত সমুদ্র সৈকত পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ পুরী। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ফিয়র্ড বা রিয়া উপকূলে মৎস্য বন্দর গড়ে ওঠে। নরওয়ের অসলো, কানাডার ভ্যাঙ্কুভার ফিয়র্ডের ধারে গড়ে ওঠা বন্দরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

(iv) উচ্চভূমির উপর শহরের অবস্থান — প্রতিরক্ষার কারণে পাহাড়ের উপর বা দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকে শহর গড়ে ওঠে। যোধপুর, এথেন্স, জেরুসালেম এগুলি প্রতিরক্ষা শহর হিসাবে উল্লেখযোগ্য। আবার দিল্লী, ইংল্যাণ্ডের স্টার্লিং দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকে গড়ে উঠেছে। বাণিজ্যিক কারণে পর্বতের পাদদেশে শহর গড়ে ওঠে। যেমন, হরিদ্বার, শিলিগুড়ি, তরাই ও ডুয়ার্সের ধান, তামাক এবং পার্বত্য অঞ্চলের আলু, চা, কমলালেবু ও কাঠের বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের কেন্দ্র এই শহরগুলি। দুটি বিপরীতধর্মী প্রাকৃতিক অঞ্চলের সীমানায় শহর গড়ে ওঠে, যেমন হেগ শহর একদিকে নিম্ন জলাভূমি ও অপরদিকে শুষ্ক স্থানের সংযোগস্থলে গড়ে উঠেছে। (চিত্র 2.8)

প্রতিরক্ষার গুরুত্ব অনুযায়ী শহরের অবস্থান

(চিত্র 2.8)

III. শহরের কর্মধারা ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ ঃ

বিভিন্ন সময়ে শহরকে বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়েছে— যেমন, বয়স, জনসংখ্যা, অবস্থান, আয়তন, আকৃতি প্রভৃতি। কিন্তু শহরের শ্রেণীবিভাগের উপাদানগুলির মধ্যে তার কর্মধারা সর্বাপেক্ষা আলোচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ। শহরের কার্যাবলী মূলতঃ অ-কৃষি। তৃতীয় ক্ষেত্রের কার্য এবং অধিকাংশ সময়েই বিশেষীকরণের দিকে ঝোঁক দেখা যায়। যদিও বেশীর ভাগ শহরই বহু ধরণের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে। তবুও কোন একটি বা দুটি কার্যই অধিক গুরুত্ব পায়। তাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যের ভিত্তিতে শহরগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

(i) প্রশাসনিক শহর — দেশের রাজধানী, রাজ্যের রাজধানী, জেলা সদর, মহকুমা সদর প্রভৃতি ছোট বড় সব প্রশাসনিক কেন্দ্রের মূল কার্যই হল প্রশাসন পরিচালনা। ঐতিহাসিক কালে বিভিন্ন সময়ে রাজার ইচ্ছায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রশাসনিক শহর গড়ে উঠেছে। এভাবে দিল্লী, আগ্রা, ঔরঙ্গাবাদ প্রভৃতি শহর গড়ে ওঠে। পাকিস্তানের রাজধানী ইস্‌লামাবাদ, কানাডার রাজধানী অটোয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন। শহরের উদাহরণ। চণ্ডীগড়, ভুবনেশ্বর, সেকেন্দ্রাবাদ প্রভৃতি শহর প্রধানতঃ রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে সংযুক্ত। সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রশাসনিক কার্যের সদর দফতর রয়েছে। প্রশাসনিক কার্যকলাপ গড়ে ওঠার জন্য রষ্ট্রায়ত্ত ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিও তাদের প্রধান কার্যালয়গুলি রাজধানীতে গড়ে তোলে যাতে তাদের কার্য পরিচালনা করতে সুবিধা হয়। প্রাচীন প্রশাসনিক শহরগুলিতে রাজকীয় প্রাসাদ, বৃহৎ মন্দির, মসজিদ, চার্চ প্রভৃতি গড়ে ওঠে। লন্ডন, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক শহরে মধ্যযুগীয় স্থাপত্যশৈলীর অনেক অনুপম নিদর্শন আছে। পরবর্তীকালে নির্মিত পরিকল্পিত রাজধানী শহরের চারপাশে দূষণমুক্ত খোলামেলা পরিবেশ বজায় রাখার দিকে বেশী নজর দেওয়া হয়। বড় বড় চওড়া রাস্তা, পার্ক, ল্যান্ডস্কেপ গার্ডেন প্রভৃতি এ জাতীয় শহরের বৈশিষ্ট্য।

(ii) বাণিজ্যিক শহর (Commrcial town) : যেসব শহরের প্রধান কর্মকাণ্ড ব্যবসা বাণিজ্য, আমদানী রপ্তানীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় তাদের বাণিজ্যিক শহর বলা যেতে পারে। বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানি, অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান তাদের প্রধান কার্যালয়গুলি এই সব শহরে গড়ে তোলে। ব্যবসার স্বার্থে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে। এই শ্রেণীতে আবার নানান ধরণের শহরের অস্তিত্ব আছে যাদের মূল বৃত্তি বাণিজ্য হলেও পদ্ধতিগত পার্থক্য রয়েছে।

(ক) বাজার শহর (Market town) : উৎপাদন কেন্দ্র থেকে পণ্য যে শহরে নিয়ে এসে গুদামজাত করা হয় এবং পাইকারি ও খুচরা কেনাবেচনার ব্যবস্থা থাকে তাকে বাজার শহর বলে। যেহেতু এসব শহরের প্রধান আর্থিক কর্মকাণ্ড বিনিময় ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম হওয়া প্রয়োজন। বাজার শহরগুলি আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় প্রকার বাণিজ্যের সাথেই যুক্ত থাকে। মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর প্রাকৃতিক রবার ও কাঠ, ঘানার কুসাসি কোকোর বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ।

(খ) বন্দর শহর (Port town) : বন্দর শহরের মাধ্যমে অধিকাংশ বাণিজ্যিক আদান-প্রদান পরিচালিত হয়। কলকাতা, মুম্বই, সিঙ্গাপুর, টোকিও, নিউইয়র্ক, লন্ডন প্রভৃতি অসংখ্য শহরের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে যেগুলি প্রথমে বন্দর হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং পরবর্তী সময়ে পণ্যদ্রব্যের বিপণনের মাধ্যমে উন্নতি লাভ করে। শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলে শিল্প স্থাপিত হয় ও আর্থিক কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটে। অনেক সময় প্রধানতঃ যাত্রী পরিবহণের জন্যও বন্দর শহর গড়ে ওঠে। যেমন, আন্দামানের পোর্টব্লেয়ার।

(গ) প্যাকেট স্টেশন— অপ্রশস্ত খাঁড়ি বা নদীমুখের ধারে গড়ে ওঠা পরিবহণ কেন্দ্রিক ছোট শহরগুলিকে প্যাকেট স্টেশন বলে। এদের সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে ভালো যাতায়াত ব্যবস্থা থাকে। ইংলিশ চ্যানেলের ধারে ডোভার, ফ্রান্সের কালাইস, সুইডেনের হেলসিনবার্গ এর উদাহরণ।

(ঘ) আউটপোর্ট (Outport) : যেসব বড় বড় জাহাজ নাব্যতার অভাবের দরুণ মূল বন্দরে প্রবেশ করতে পারে না, তাদের সাহায্যকারী বন্দর হিসাবে আউটপোর্টগুলি কাজ করে। অধিকাংশ মালপত্র ভারী হওয়ার দরুণ এবং জাহাজ থেকে পণ্য নামানো-ওঠানো সময়সাপেক্ষ বলে গুদামঘর তৈরী করতে হয়। অনেক সময় আবার ঐ স্থানেই কাঁচামালকে শিল্পে ব্যবহারের উপযুক্ত করে তোলার ব্যবস্থা থাকে। কলকাতা বন্দরের ক্ষেত্রে হলদিয়া, জার্মানীর হামবুর্গের ক্ষেত্রে কক্সহ্যাডেন আউটপোর্টের কাজ করে।

(ঙ) এন্ট্রিপট (Entripot) : এক দেশ থেকে মালপত্র আমদানী করে অন্যদেশে যে বন্দরগুলি রপ্তানী করে তাদের এন্ট্রিপট বলে। যাতায়াতের পথে মালপত্র মজুত করার জন্য বড় বড় গুদামঘর, প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণের উপযোগী শিল্প কেন্দ্র, জাহাজ মেরামত প্রভৃতির উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে। সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কার কলম্বো, নেদারল্যান্ডের রটারডাম মূলতঃ এজাতীয় বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত। সিঙ্গাপুর আশোধিত পেট্রোলিয়াম আমদানী করে ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম দ্রব্য রপ্তানী করে। অনেক সময় স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত কোন দেশ পণ্য দ্রব্য আমাদানী রপ্তানীর জন্য অন্য দেশের বন্দর ব্যবহার করে। যেমন নেপাল ও ভুটানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মুখ্যতঃ কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

(iii) সংগ্রাহক শহর (Collection Centre) : সংগ্রাহক শহরের মুখ্য বৃত্তি হল প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং প্রয়োজনমত তার পরিশোধন, প্রক্রিয়াকরণ, ও রপ্তানী। সংগ্রাহক শহরের আয়তন খুব ছোট থেকে বৃহৎ নানা প্রকার হতে পারে। কাষ্ঠশিল্পভিত্তিক শহর উত্তরাঞ্চলের কাঠগোদাম খুব ছোট শহর আবার কয়লা ও সোনার খনি কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পশ্চিমবঙ্গের রাণীগঞ্জ ও দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গ বৃহৎ শহর। সংগ্রাহক শহর নানা প্রকার—

(ক) খনি কেন্দ্রিক — সোনা, হীরা প্রভৃতি মূল্যবান খনিজ, লৌহ আকরিক, তামা, বক্সাইট, টিন প্রভৃতি ধাতু, কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতি গ্যাসের মত জ্বালানী, পটাশ, সালফার, চায়না ক্লে প্রভৃতি অধাতব খনিজ পদার্থ—সবই আহরণ করার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র ছোট-বড় নানা আকারের শহর গড়ে উঠেছে। যেসব খনি শহরের সঙ্গে সংলগ্ন পরিশোধন কেন্দ্র থাকে সেগুলি আয়তনে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয়। খনিজদ্রব্য উত্তোলন করে, পরিশোধনের পর সেগুলি সরাসরি শিল্পকেন্দ্রে অথবা রপ্তানীর উদ্দেশ্যে বন্দরে পাঠানো এই শহরগুলির কাজ।

(খ) মৎস্য সংগ্রাহক শহর — মৎস্য বন্দরগুলিকে ঘিরে শহর গড়ে ওঠে। মৎস্য সংগ্রহের পরিমাণের উপর নির্ভর করে বন্দরে মাছ ধরার জন্য ছোট ট্রলার থেকে বড় জাহাজ পর্যন্ত সব ধরণের সমুদ্রগামী জলযান রাখার ব্যবস্থা থাকে। এই ধরনের শহরগুলিতে চাহিদা অনুপাতে হিমায়ন ব্যবস্থা, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, সার কারখানা ও পুনরায় রপ্তানীর উপযুক্ত বন্দোবস্ত থাকে। কানাডার ভ্যাঙ্কুভার, সুইডেনের মালমো, জাপানের সিমোনোসেকি মৎস্য সংগ্রাহক শহর। পশ্চিমবঙ্গের শঙ্করপুর, গুজরাটের ভেরাবল ছোট আকারের মৎস্য সংগ্রাহক শহর।

(গ) কাষ্ঠশিল্প কেন্দ্রিক শহর — এই শহরগুলির মূল কাজ হল নিকটবর্তী বনভূমি থেকে কাষ্ঠ সংগ্রহ করে আংশিকভাবে ব্যবহারের উপযোগী করে শিল্প শহরে পাঠিয়ে দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে চেরাই কল, নদীর তীরে লগ্ঘাট, কাষ্ঠমণ্ড তৈরীর কারখানা থাকে। কানাডার কর্ণার ব্রুক, মালয়েশিয়ার সান্ডাকান কাষ্ঠশিল্প কেন্দ্রিক শহরের উদাহরণ।

(iv) উৎপাদন কেন্দ্র (Production centre) : যে সব শহরের প্রধান কর্মধারা যন্ত্রশিল্পের সাথে যুক্ত তাদের এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। অনেক সময় একটি প্রধান শিল্পকেন্দ্রকে ঘিরে শহর গড়ে ওঠে। যেমন, জামসেদপুর, ভিলাই প্রভৃতি স্থানে লৌহ-ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রটি শহর গড়ে ওঠার একমাত্র কারণ। অনেক সময় আবার এক জাতীয় নাতিবৃহৎ উৎপাদনকেন্দ্র এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়ে শহর গড়ে তোলে। সেই সমস্ত শহরে একটি পণ্যের উৎপাদনের বিশেষীকরণ ঘটে। যেমন— আমেদাবাদে সুতী বস্ত্র বয়ন শিল্প, লুধিয়ানায় পশম বয়ন শিল্প ইত্যাদি। উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে সহযোগী শিল্প গড়ে উঠলে শহর আয়তনে বাড়তে থাকে। সাহায্যকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, বীমা, যোগাযোগ সংস্থা পণ্য পরিবহণের সাথে যুক্ত সংস্থাগুলি একে একে এসে জড়ো হয়। উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃতি ও উৎপাদনের পদ্ধতির উপর নির্ভর করে শহরটির বাহ্যিক চেহারা কেমন হবে। ধাতুশিল্পের সাথে জড়িত শহরগুলিতে বায়ুদূষণ, বস্ত্র, কাগজ, পেট্রোকেমিকাল শিল্পের সাথে যুক্ত থাকলে জলদূষণ সমস্যার সৃষ্টি করে।

(v) সাংস্কৃতিক কেন্দ্র— যে শহরগুলির মুখ্য কার্যাবলী কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কিম্বা কর্মকাণ্ডকে ঘিরে আবর্তিত হয় সেই শহরগুলিকে সাংস্কৃতিক শহর বলে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সাংস্কৃতিক কার্যধারা বিভিন্ন প্রকার—

(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক — কোন বৃহৎ আন্তর্জাতিক গুণমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শহর গড়ে ওঠে। যেমন, ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, ইউনিভার্সিটি, কলেজের বাড়ি, বিভিন্ন বিষয়ের ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি প্রভৃতির অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রীদের হস্টেল, খেলার মাঠ, বই ও খেলার সরঞ্জামের দোকান এই শহরের বাড়তি বৈশিষ্ট্য।

(খ) ধর্মীয় শহর — কোন মন্দির, মসজিদ, চার্চকে ঘিরে অথবা তীর্থক্ষেত্র কিম্বা কোন পবিত্র স্থানকে কেন্দ্র করে, কোন ধর্মগুরুর জন্মস্থান বা তাঁর স্মৃতিচিহ্নকে আশ্রয় করে শহর গড়ে উঠতে দেখা যায়। ইহুদিদের

নিকট জেরুসালেম খ্রীষ্টানদের কাছে রোম অতি পবিত্র স্থান। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে হজরত মহম্মদের জন্মস্থান মক্কা, বৌদ্ধদের নিকট গৌতম বুদ্ধের বোধিলাভের স্থান বুদ্ধগয়া অতি পবিত্র। জগন্নাথ দেবের মন্দিরকে ঘিরে পুরী, শিখদের পবিত্র স্বর্ণমন্দিরকে ঘিরে অমৃতসর শহর গড়ে উঠেছে। এইসব শহরে বিভিন্ন উৎসব ছাড়াও সারা বছরই ধর্ম পিপাসু বহু মানুষের সমাগম ঘটে। ফলে যাত্রীদের সুবিধার জন্য হোটেল রেস্টুরান্ট, ধর্মশালা, দোকান-পাট প্রভৃতি গড়ে ওঠে।

(গ) বিনোদন শহর — কোন কোন শহর বিনোদন কেন্দ্রের জন্য বিখ্যাত। যেমন— আমেরিকার হলিউড, ডিজনিল্যাণ্ড চলচ্চিত্র ও অ্যানিমেশানের জন্য, পৃথক উল্লেখের দাবী রাখে।

(vi) পর্যটন কেন্দ্র — কোন সুরম্য প্রাকৃতিক স্থানে ভ্রমণবিলাসীদের জন্য পর্যটন কেন্দ্র গড়ে ওঠে। পর্যটকদের জন্য হোটেল, খেলাধূলার জন্য পোলো মাঠ, গল্ফ কোর্স, সুইমিং পুল, বিনোদনের সিনেমা হল, নাইট ক্লাব, শিশুদের জন্য পার্ক, কেনা কাটার জন্য দোকান পাট থাকে। পর্যটন কেন্দ্রিক শহরগুলির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে শহরের এক অংশে স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্য ঘরবাড়ি ও সেখান থেকে কিছুটা পৃথকভাবে পর্যটক আবাসগুলি গড়ে ওঠে। পর্যটন কেন্দ্রের নানা রকম প্রকারভেদ আছে—

(ক) সমুদ্র সৈকতে পর্যটন কেন্দ্র— মিয়ামি, গোয়ার পানাজি, প্রভৃতি অসংখ্য সমুদ্র তীরবর্তী পর্যটন কেন্দ্রে নানা ধরণের জলক্রীড়ার ব্যবস্থা থাকে।

(খ) শৈল শহর— পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, মনোরম আবহাওয়া বহু পর্যটককে আকর্ষণ করে। এছাড়াও পর্বতারোহণ, র‍্যাফটিং, রক ক্লাইম্বিং প্রভৃতি অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস, স্কী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রভৃতির আয়োজন থাকে। মুসৌরি, নৈনিতাল, সিমলা, দার্জিলিং পৃথকভাবে উল্লেখযোগ্য।

(গ) স্বাস্থ্যকেন্দ্র— হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য অথবা বার্ধক্যজনিত অবসর সময় কাটানোর জন্য বিনোদন কেন্দ্র গড়ে ওঠে। একসময় ছোটনাগপুর অঞ্চলের শিমূলতলা, কারমাটার প্রভৃতি ছোট শহরগুলি স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য আসা মানুষজনে সরগরম হয়ে উঠত। বৃটেনের উপকূলে ইস্টবোর্ণ, রেক্সহিল প্রভৃতি ছোট শহরগুলি প্রধানতঃ বয়স্কদের অবকাশকালীন বাসস্থান হিসাবে গড়ে উঠেছে।

(vii) প্রতিরক্ষা শহর — বহু ঐতিহাসিক শহর প্রতিরক্ষার কারণে সৃষ্টি হয়েছিল। বৃটেনের এডিনবার্গ, ফ্রান্সের স্ট্রাসবার্গ, ভারতের আগ্রা, গোয়ালিয়র, চিতোর প্রভৃতি দুর্গ শহর। অনেক সময় আবার নিরাপত্তার প্রয়োজনে শহরগুলিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখা হত। জয়পুর, জয়শলমীর, আমেদাবাদ এই ধরণের প্রাচীর বেষ্টিত শহরের উদাহরণ। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য স্বাভাবিক ভাবে উঁচু পাহাড়ের ওপর নতুবা নদীর খাড়া পাড়ের ওপর শহর নির্মাণ করা হত। যেমন, এথেন্স এডিনবার্গ, আজমীরের তারাগড় দুর্গ পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত। বৃটেনের ডারহাম, জার্মানীর বার্লিন, ফ্রাঙ্কফুর্ট, ভারতের চুণার শহর নদীর খাড়া পাড়ের ওপর অবস্থিত। প্রতিরক্ষা ছাড়াও শহরগুলিতে শস্য গুদামজাত করার ব্যবস্থা, যুদ্ধের সময় শহরবাসীদের আপতৎকালীন আশ্রয় দেবার ব্যবস্থাও ছিল।

বর্তমানে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে, সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ক্যান্টনমেন্ট শহর গড়ে ওঠে। যেমন, স্থলসেনার জন্য আম্বালা, নৌসেনার জন্য কোচি, প্রভৃতি ক্যান্টনমেন্ট শহর গড়ে উঠেছে।

(viii) বসত শহর (Residential towns) : আধুনিক সময়ে গড়ে ওঠা বহু শহরই মূলতঃ বসত শহর যাদের কাজ হল নিকটবর্তী বৃহৎ জনাকীর্ণ শহরগুলির বাসিন্দাদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করা। কলকাতার লাগোয়া সল্টলেক সিটি এরূপ বসত শহর।

আলোচনার শেষে একথা বলা যেতে পারে যে, যদিও কোন শহরের একটি প্রধান কাজকে ধরে উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে তবুও সাধারণতঃ সব শহরের কর্মধারাই বহুমুখী। একটি উদ্দেশ্যে নির্মিত হওয়ার পর পরবর্তী সময়ে ঐ কাজটি গুরুত্ব হারিয়ে অন্য কোন একটি কাজ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। অনেকসময় একটি কাজের সাথে যুক্ত সহায়ক কাজগুলিও সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী :

1. শহর কি? বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শহরের সংজ্ঞা আলোচনা করুন।
2. শহরের উৎপত্তির বিভিন্ন কারণগুলি আলোচনা করুন।
3. কায়িক গঠনের উপর ভিত্তি করে শহরের শ্রেণীবিভাগগুলি আলোচনা করুন।
4. কর্মধারার ভিত্তিতে শহরের শ্রেণীবিভাগগুলি আলোচনা করুন।
5. শহরের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়গুলি কি কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

1. সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে শহরকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়?
2. অবস্থানের প্রকারভেদ অনুযায়ী শহরের শ্রেণীবিভাগ করুন।
3. বাণিজ্যিক শহরগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
4. আউটপোর্ট কি?
5. এন্ট্রিপট বলতে কি বোঝায়?
6. সাংস্কৃতিক কার্যের মাধ্যমে শহর কি ভাবে গড়ে ওঠে?

উত্তরমালা :

1. 2.1 অংশ দেখুন।
2. 2.2 অংশে শহরের উৎপত্তির বিভিন্ন কারণ অংশটি দেখুন।
3. 2.2 অংশে শহরের শ্রেণীবিভাগের কায়িক গঠন ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ অংশ দেখুন।
4. 2.2 অংশে কর্মধারা ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ দেখুন।
5. 2.1 অংশে গ্রিফিথ টেলরের তত্ত্ব দেখুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর :

1. 2.1 অংশ দেখুন।
2. 2.2 অংশ দেখুন।
3. 2.2 অংশে কর্মধারাভিত্তিক শ্রেণীবিভাগে বাণিজ্যিক কর্মধারা অংশটি দেখুন।
4. 2.2 অংশে বাণিজ্যিক শহর (ঘ) অংশ দেখুন।
5. 2.2 অংশে বাণিজ্যিক শহর (ঙ) অংশ দেখুন।
6. 2.2 অংশে সাংস্কৃতিক শহর অংশ দেখুন।

2.3 মহানগর তত্ত্ব ও মহানগর এলাকা সম্বন্ধে ধারণা

সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৃহৎ নগরগুলিকে মেট্রোপলিটান আখ্যা দেওয়া হয়। R. E. Dickinson তাঁর ''City and Region'' গ্রন্থে মেট্রোপলিস বলতে আঞ্চলিক রাজধানীকে বুঝিয়েছেন। আবার Gras -এর মতে অঞ্চলের উৎপাদিত সমস্ত পণ্যসামগ্রী ব্যবসার উদ্দেশ্যে যে জায়গায় এনে জড়ো করা হয় এবং সেখান থেকে রপ্তানী করা হয় তাকেই মেট্রোপলিস বলে। অর্থাৎ মহানগর হল এমন একটি স্বাধীন ভৌগোলিক সত্ত্বা যা শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনৈতিক কাজকর্ম, প্রশাসন এবং সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। আবার Hudson-এর মতে মহানগর হল এমন শহর যা আশপাশের অন্যান্য শহরগুলির উপর আধিপত্য করে। Lewis Mumford-এর লেখায় মহানগর হল শহর অনুক্রমের তৃতীয় পর্যায়। মহানগরের জনসংখ্যা অন্ততঃ দশ লক্ষের বেশী হবে এবং এখানে শিল্পকেন্দ্র থাকবে। শহরতলি অঞ্চলটি বিস্তৃত হবে এবং আবাসিক এলাকাগুলি শহরের উপকণ্ঠে বিস্তার লাভ করবে। এই পর্যায়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা মানুষজনের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় ঘটবে, পাইকারী ও খুচরো ব্যবসা, ব্যাঙ্কিং ও বীমা, ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ থাকবে।

প্রকৃতপক্ষে মহানগর সৃষ্টির মূলে আছে বহুমুখী কর্মধারা। ভারতের জনগণনা অনুযায়ী যে সব শহরের জনসংখ্যা দশ লক্ষ বা তার বেশী তাদের মেট্রোপলিস নামে অভিহিত করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী ভারতে পঁচিশটি মেট্রোপলিস আছে এবং সারা পৃথিবীতে আছে মোট 150টি। মহানগরের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, বহু মানুষের মিলনক্ষেত্র। কর্মসূত্রে নানা অঞ্চলের অধিবাসীরা এখানে এসে বাস করতে থাকেন বলে নানা সংস্কৃতির আদানপ্রদান ঘটে। এইভাবে মহানগরে এক বিশেষ ধরণের মিশ্র সংস্কৃতির জন্ম হয়। তাই মহানগরকে Cosmopolitan city নামেও ডাকা হয়।

মহানগরের কর্মধারা আন্তর্জাতিক হওয়া দরকার। অনেকসময় কোন মহানগরের বহু কর্মধারার মধ্যে একটি বা দুটি প্রধান হয় এবং তার আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি থাকে। উদাহরণস্বরূপ, লস্‌এঞ্জেলস সিনেমা শিল্প, পিটস্‌বার্গে লৌহ ইস্পাত শিল্প, সিঙ্গাপুর বন্দর, হংকং বাণিজ্যকেন্দ্র, দিল্লী রাজধানী শহর, অক্সফোর্ড শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে। এই কারণে বহু বিদেশীর বসবাস ও আসা যাওয়া থাকে এবং এভাবে মহানগর ক্রমশঃ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়।

ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে মহানগর সৃষ্টি হতে পারে। কৃষি প্রধান দক্ষিণ এশিয়া এবং শিল্পোন্নত পশ্চিম ইউরোপ — উভয় জায়গাতেই মহানগর গড়ে উঠেছে। মহানগর সৃষ্টির কারণ পৃথক হলেও বিপুল জনসংখ্যাকে পরিষেবা দেবার ক্ষমতা দুটি ক্ষেত্রেই সমান। শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলে শিল্পে কাজ করার জন্য বহু দূর থেকে অনেক মানুষ এসে শহরে ভিড় জমায়। শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারের প্রসার, রপ্তানী বাণিজ্য ইত্যাদির জন্য আর্থিক ও বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের অফিস গড়ে তোলে। এইভাবে একটি প্রধান কাজকে ঘিরে বহু কর্মধারা বিস্তার লাভ করে এবং মানুষের ভিড়ে মহানগর আয়তনে বাড়তে থাকে। উন্নয়নশীল কৃষিপ্রধান দেশে অধিকাংশ অধিবাসীই জীবিকা হিসাবে কৃষির ক্ষেত্রে যুক্ত। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে সকলের পূর্ণ সময়ের কাজ থাকে না। অর্ধবেকারত্ব, ঋতুগত বেকারত্ব, প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব এই সব দেশের গুরুতর সমস্যা। ফলে গ্রাম থেকে কাজের খোঁজে মানুষ শহরে চলে আসে এবং অপরিকল্পিতভাবে শহর আয়তনে বাড়তে থাকে।

মহানগর সম্বন্ধে বুঝতে গেলে আরও দুটি ধারণা স্পষ্টভাবে জানা দরকার— মহানগর এলাকা (Metropolitan area) এবং মহানগর অঞ্চল (Metropolitan region)

1910 সালে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণনা অনুযায়ী খুব বড় শহরকে বোঝানোর জন্য মহানগর এলাকা কথাটি প্রথম ব্যবহার করা হয়। এই শহরগুলির বিস্তৃত শহরতলি আছে এবং প্রশাসনিক কাজকর্মের কেন্দ্র। 1950 সালে পরিবর্তিত হয়ে এটির নাম হয় Standard Metropotlitan Area এবং 1960 সালে Standard Metropolitan Statistical Area বলে অভিহিত করা হয়। 1990 সালে US Bureau of the Census জনসংখ্যার আয়তন, জনঘনত্ব, জীবিকার বৈচিত্র্য এবং বাড়িঘরের বিন্যাস অনুযায়ী মহানগর এলাকাগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছে।

(i) মহানগর পরিসংখ্যান এলাকা (Metropolitan Statistical Area) : যে সব কাউন্টিগুলির একটি কেন্দ্রীয় শহর আছে যার জনসংখ্যা 50,000 বা তার বেশী এবং যার পার্শ্বস্থ নগরায়িত এলাকার (urbanized area) মোট জনসংখ্যা কমপক্ষে এক লক্ষ।

(ii) গুচ্ছবদ্ধ মহানগর পরিসংখ্যান এলাকা (Consolidated Metropolitan Statistical Area) : এগুলি আগেরটির থেকে আকারে বড় এবং চতুর্পার্শ্বস্থ নগরায়িত এলাকার মোট জনসংখ্যা দশ লক্ষের বেশী।

(iii) প্রাথমিক মহানগর পরিসংখ্যান এলাকা (Primary Metropolitan Statistical Area) : একটি গুচ্ছবদ্ধ মহানগর এলাকার মধ্যে দুই বা ততোধিক প্রাথমিক মহানগর এলাকা থাকতে পারে।

সাধারণভাবে মহানগর এলাকা বলতে মহানগরের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত এলাকাগুলিকে বলা হয়ে থাকে। কলকাতার মেট্রোপলিটান এলাকাকে Kolkata Metropolitan District (KMD) বলা হয়। এটি উত্তর-দক্ষিণে প্রায় 85 km. বিস্তৃত এবং হুগলী নদীর উভয় তীরে এই এলাকা গড়ে 4km চওড়া। 1,350 বর্গ কিমি. বিস্তৃত কলকাতা মেট্রোপলিটান এলাকায় 3টি পৌর নিগম (কলকাতা, হাওড়া, চন্দননগর), 33টি পৌর প্রতিষ্ঠান। 72টি পৌর এলাকা, 165টি পঞ্চায়েত, 400টি মৌজা রয়েছে। অর্থাৎ কলকাতা মেট্রোপলিটান এলাকার মধ্যে নগরায়িত এবং গ্রাম্য উভয় ধরণের এলাকাই রয়েছে।

যতদূর পর্যন্ত মহানগর তার সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে ততদূর পর্যন্ত মেট্রোপলিটান অঞ্চল। পরিষেবা এবং পণ্য সামগ্রী আদান প্রদানের মাধ্যমে যে অঞ্চলের মানুষের চাহিদা মহানগরটি প্রত্যক্ষভাবে মেটাতে পারে তাই মহানগর অঞ্চল। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উভয় প্রভাব এই অঞ্চলের উপর সরাসরি এসে পড়ে। কেবল গ্রামীণ এলাকাই নয়, কম গুরুত্বপূর্ণ ছোট শহরও এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

কোন একটি শহর অনেকগুলি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে ধাপে ধাপে গড়ে ওঠে। নগরের পত্তন, তার বৃদ্ধি এবং ক্রমশঃ পরিণত হয়ে ওঠার একটি নির্দিষ্ট চক্রাকার পর্যায়ক্রম আছে। একটি ছোট গ্রামে যখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রের কাজকর্ম বাড়তে থাকে তখন ধীরে ধীরে গ্রামটিতে শহরাঞ্চলের বৈশিষ্ট্যগুলি আত্মপ্রকাশ করে। ঐ বসতিটির পরিষেবার ক্ষেত্র যত বিস্তৃত হয় তত সেটি আকৃতিতে বড় হয়। পরিষেবার প্রকৃতি পরিবর্তিত হতে থাকে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক কাজকর্ম বাড়তে থাকে। তখন বসতিটির গ্রামের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে নগরের বৈশিষ্ট্য লাভ করে। একটি নগরের কাজের পরিধি যত বাড়ে, জনসংখ্যার ঘনত্ব সেই হারে বাড়তে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি বাড়ার সাথে সাথে পরিষেবা ক্ষেত্রের আয়তন বাড়ে, নগরটির উপর নির্ভরশীল এলাকা বিস্তৃত হতে থাকে। একটা পর্যায় পর্যন্ত বাড়তে বড়তে এমন সময় আসে যখন নগরটির উপর চাপ এত বাড়ে যে তার পরিষেবা দানের ক্ষমতা চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছয়। এই অবস্থায় নগরটি আর বাড়ে না, স্থিতিশীল অবস্থা লাভ করে। যখন সমগ্র অঞ্চলটিতে নগরায়ণ ঘটে এবং সমগ্র দেশের জনসংখ্যা নাগরিক পরিষেবার আওতায় এসে পড়ে তখন পরিষেবা কেন্দ্রের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে।

শহরের উৎপত্তি ও বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ক্রম সম্বন্ধে Lewis Mumford নিম্নরূপ আলোচনা করেছেন—

Eopolis— গ্রাম থেকে সদ্য শহরের বৈশিষ্ট্য লাভ করা ছোট্ট শহর। এই অবস্থায় তার কাজ হল কৃষি, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ প্রভৃতি প্রাথমিক ক্ষেত্রের উৎপাদিত পণ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং পাইকারি বাজারে পাঠানো।

Polis— এটি এক ধরণের বাজার শহর। এটি কৃষিপণ্যের পাইকারি এবং খুচরো বিক্রয়কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে। এর উপর নির্ভর করে এখানে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, সংরক্ষণের জন্য বরফকল, প্যাকেজিং ফ্যাক্টরি প্রভৃতি গড়ে উঠতে থাকে।

Metropolis— ক্রমশঃ একটি Polis মেট্রোপলিসে রূপান্তরিত হয়। এই শহরের জনসংখ্যা অন্তত দশ লক্ষ। আশপাশের ছোট শহরগুলি উন্নত ধরণের পরিষেবা, যেমন, ব্যাঙ্ক, বীমা, উচ্চশিক্ষা, অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রভৃতির জন্য মেট্রোপলিসের উপর নির্ভর করে। এই ধরণের শহরে অনেক শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে এবং শহরতলি অঞ্চল ক্রমাগত আয়তনে বাড়তে থাকে। নানা দিক থেকে লোক এসে বসবাস করতে শুরু করার ফলে সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটে এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের নাগরিক চিন্তাভাবনা বিকাশ লাভ করতে থাকে।

Megalopolis — যখন অনেকগুলি মেট্রোপলিস পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে একটি অতিবৃহৎ শহরাঞ্চল গঠন করে এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চল তার পরিষেবা ক্ষেত্রের মধ্যে চলে আসে তখন তাকে মেগালোপলিস বলে। এই অবস্থায় ধন সম্পদের কেন্দ্রীভবন ঘটে। নানা ধরণের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হয়। একটি শহরের মধ্যে অনেকগুলি নিউক্লিয়াস তৈরি হয় যেখান থেকে শহরের কাজকর্ম পরিচালিত হয়। নিউ ইয়র্ক, বস্টন এর উদাহরণ।

Tyranopolis — যখন দেশটির সর্বত্র নগরায়ণ ঘটে এবং কেবলমাত্র প্রাথমিক ক্ষেত্রে কাজের সাথে জড়িত কোন প্রকৃত গ্রামাঞ্চল থাকে না, তখন নগরায়ণের যে অবস্থা সৃষ্টি হয় তাকে Mumford টিরানোপলিস বলে বর্ণনা করেছেন। এই অবস্থায় সংস্কৃতির আদানপ্রদান, জীবনযাত্রার মান, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছয় এবং যোগাযোগের ক্ষেত্র আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। যেমন বৃটেনের জনসংখ্যার 90% বেশী শহরে বাস করে।

Nekropolis—এটি হল মৃত শহর। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতি কারণে যখন নাগরিক পরিষেবা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে, সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলির কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়, মানুষজন শহর ছেড়ে চলে যেতে থাকে তখন শহরটি যে চেহারা নেয় তাকে নেক্রপলিস বলে। যেমন, ব্যবিলন, ফতেপুর সিক্রি প্রভৃতি। একটি নগরের ক্রমবিকাশের এটি একেবারে শেষ পর্যায়।

2.4 মেট্রোপলিটান এলাকার সীমা নির্ধারণ

মেট্রোপলিটান শহরের সীমা নির্ধারণের জন্য অনেক পৌরবিদ্ বিভিন্ন ধরনের উপাদান ব্যবহার করেছেন।

(a) সংবাদপত্রের প্রচার পরিধি — সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকা যেগুলির মাধ্যমে শহর ও পৌরক্ষেত্রের অধিবাসীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট খবর প্রচারিত হয় সেগুলির প্রচার এলাকা জেনে ঐ পৌরক্ষেত্রের সীমা নির্ধারণ করা যায়। যে পর্যন্ত ঐ সংবাদপত্রের পঞ্চাশ শতাংশ অন্তত বিক্রি হয় সেই পর্যন্ত ঐ শহরের প্রাথমিক সীমা ধরা যেতে পারে।

(b) সরকারী পরিবহণ পরিধি — F. H. W. Green 1930 সালে ইংল্যাণ্ডের সরকারী বাস সার্ভিসের সময়সূচী থেকে মানচিত্র তৈরি করেন। সেই অনুযায়ী সে অঞ্চল থেকে নির্দিষ্ট শহরে সহজে যাতায়াত করা যায়, সেই পর্যন্ত তিনি ঐ শহরের পৌরক্ষেত্র নির্ধারণ করেন। এইভাবে নিত্যযাত্রীর ট্রেনের মাধ্যমে যাতায়াতের সংখ্যা এবং এলাকা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

(c) পাইকারি ও খুচরো বাজার এলাকা—শহর থেকে খাদ্য দ্রব্য, ভোগ্য পণ্য, ওষুধপত্র যে সব এলাকায় পাঠানো হয় সেই সব অঞ্চলকে পৌরক্ষেত্র হিসাবে ধরা যেতে পারে।

(d) শিক্ষার ধারণ অঞ্চল—উচ্চ শিক্ষার জন্য যে সব এলাকা থেকে ছাত্রছাত্রী শহরে আসে সেই এলাকা পৌরক্ষেত্রের প্রভাব বলয়ের অন্তর্গত বলে ধরা যেতে পারে।

(e) টেলিফোনের সংখ্যা— কোন শহর থেকে অন্যান্য অঞ্চলে টেলি যোগাযোগের পরিমাণের মাধ্যমে মেট্রোপলিটান এলাকার সীমা নির্ধারণ করা যায়।

2.5 মহানগরের সমস্যা

মহানগরের সমস্যা দু ধরনের— অতিরিক্ত অপরিকল্পিত বৃদ্ধি কোন মহানগরের সমস্যা, আবার, কর্মধারা গতিরুদ্ধ হয়ে অন্য ধরণের সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই মহানগরের সমস্যাগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হল।

1. মহানগরের স্থিতিশীলতা (Metropolitan stagnation) নানা কারণে মহানগরের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে।

(ক) পরিবহণ ব্যবস্থার পরিবর্তন—অনেক সময় পুরনো রাস্তাকে পাশ কাটিয়ে নতুন বড় চওড়া রাস্তা তৈরি হয় এবং যোগাযোগের পথ সুগম হওয়ায় অন্য শহর বেশী গুরুত্ব পেতে থাকে। যেমন, ওয়ালটেয়ারের তুলনায় বন্দর হিসাবে বিশাখাপত্তনমের গুরুত্ব বৃদ্ধি।

(খ) শিল্পকেন্দ্রের গুরুত্ব হ্রাস — অনেক পুরনো মহানগরের প্রধান শিল্পটির গুরুত্ব হ্রাসের ফলে মহানগরটির বৃদ্ধি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। যেমন, বৃটেনের ম্যাঞ্চেস্টারের সুতী বস্ত্র বয়ন শিল্পের আর পৃথিবীব্যাপী একাধিপত্য নেই। তাই নগরটিও স্থিতিশীল অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে।

(গ) খনিজ দ্রব্যের উৎপাদনে ঘাটতি— পিটস্‌বার্গ এক সময়ে পৃথিবীর লৌহ ইস্পাত শিল্পের রাজধানী ছিল। এর মূল কারণ ছিল আপালেশিয়ান অঞ্চলের কয়লা। কয়লার উৎপাদন কমে যাওয়ার সাথে সাথে পিটস্‌বার্গের উৎপাদন কমে যায়, অনেক শিল্পকারখানা হ্রদ অঞ্চলে সরে যায় এবং মহানগরটির বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।

(ঘ) পরিবেশ দূষণ— মহানগরের দূষিত পরিবেশ এবং অপরিকল্পিত বৃদ্ধির ফলে একসময় বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। নতুন শিল্প স্থাপন করতে উদ্যোগপতিরা আর উৎসাহিত হন না। যেমন, আগ্রার পরিবর্তে এখন ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলি নয়ডা, গুরগাঁও প্রভৃতি জায়গায় সরে যাচ্ছে এবং এক সময়ের ছোট শহর দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগ্রা, কানপুর প্রভৃতি শহরগুলি স্থিতিশীল অবস্থায় পর্যবসিত হয়েছে।

2. মহানগরের বৃদ্ধি — মহানগরের বৃদ্ধি এবং তার জন্য নানা ধরণের সমস্যা তৈরী হয়।

(ক) পৌর বিক্ষেপণ (Urban sprawl) : দ্রুত বর্ধনশীল মহানগরের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল পৌর বিক্ষেপণ, উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় ধরণের দেশেই অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিসম্পন্ন অধিবাসীরা মহানগরের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা থেকে দূরে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বসতি স্থাপন করতে পছন্দ করে। আবার কোন সময় উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দেখা যায় যে, গ্রামাঞ্চল থেকে আগত দরিদ্র ছিন্নমূল মানুষগুলি মহানগরের উপকণ্ঠে বস্তি বা ঝুপড়ি বেঁধে বাস করতে শুরু করে। এভাবে মহানগর আয়তনে বাড়তে থাকে।

একটি মহানগর যেমন আয়তনে বাড়ে তেমনি পাশাপশি কয়েকটি নগর যুক্ত হয়ে পৌরপুঞ্জ (Conurbation) গড়ে ওঠে। মহানগরের প্রান্তবর্তী এলাকাগুলি ক্রমাগত প্রসারিত হয়ে পুষ্টিভবন পদ্ধতিতে (Process of accretion) পৌরপুঞ্জ তৈরী করে। অনেকসময় মহানগর তার পার্শ্ববর্তী কম গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিকে যুক্ত করে নিয়ে একত্রীকরণ পদ্ধতিতে (process of agglomeration) পৌরপুঞ্জ সৃষ্টি করে। কলকাতা মহানগরের ক্ষেত্রে উভয় প্রক্রিয়াতেই পৌরপুঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে।

কয়েকটি পৌরপুঞ্জ যুক্ত হয়ে মহাপৌরপুঞ্জ (Megalopolis) গঠন করে। কাছাকাছি অবস্থিত অনেকগুলি পৌরপুঞ্জ সম্প্রসারিত হতে হতে পরস্পরের মধ্যবর্তী আর কোন গ্রামীণ এলাকা থাকে না। গ্রামীণ এলাকা, ছোট শহর সবাইকে গ্রাস করে বিশাল মহাপৌরপুঞ্জ সৃষ্টি হয়। জাপানের ওসাকা থেকে কোবে, ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টার থেকে লীডস, জার্মানীর ক্রেফেল্ড থেকে হ্যাম, যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন থেকে ওয়াশিংটন প্রভৃতি বিশালাকৃতি মহাপৌরপুঞ্জ গড়ে উঠেছে। পৌরবিক্ষেপণের ফলে গ্রামীণ এলাকা ও ছোট শহরগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে।

(খ) প্রধান শহরের উত্থান (Development Primate City)—ভারত, চীন, ব্রাজিল প্রভৃতি অতি ঘন বসতিপূর্ণ দেশে প্রধান একটি বা দুটি শহর ক্রমাগত আয়তনে বাড়তে থাকে এবং সেগুলির উপর জনসংখ্যার চাপ আছড়ে পড়ে। এই ধরণের মহানগরকে primate city বলা হয়। অধিকাংশ primate city-র-ই ঔপনিবেশিক আমলে গোড়াপত্তন হয়। শহর কেন্দ্রিক অর্থনীতির বাড়বাড়ন্ত, অন্যান্য অঞ্চলে উন্নয়নের অভাবের ফলে সমস্ত ধরণের অর্থনৈতিক কাজকর্ম একটি শহরে কেন্দ্রীভূত হয়। এতে একদিকে যেমন শহরটির অপরিকল্পিত বৃদ্ধি ঘটে তেমনি অন্যান্য অঞ্চলগুলি বৈষম্যমূলক অর্থনীতির শিকার হয়। উদাহরণস্বরূপ ব্রাজিলের বুয়েনাস এয়ার্স, বাংলাদেশের ঢাকা, ফিলিপিনসের মানিলা প্রভৃতি শহরের নাম করা যেতে পারে।

মহানগরের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি যে কেবল তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সমস্যা তৈরী করে তাই নয়, মহানগর নিজেও নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ে। যেমন—

1. জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপ ও বেকারী—পশ্চিম ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পর থেকেই শহরগুলির উপর জনসংখ্যার চাপ বাড়তে থাকে। উন্নত দেশগুলিতে তো বটেই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কাজের আশায় ক্রমাগত মানুষের ভিড় জমতে থাকে। উন্নত দেশগুলিতে পরের দিকে এই প্রবণতা কমে যায় কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মানুষের শহরে ঢল অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু এত লোকের সবার কর্মসংস্থান হয় না। যারা শিক্ষিত এবং দক্ষ তারা কাজ পায়, অদক্ষ শ্রমিকেরা কায়িক শ্রমের কাজগুলিতে নিযুক্ত হয়। তা সত্ত্বেও এই বহিরাগত জনসংখ্যার একটা বড় অংশ নিম্ন মানের বৃত্তি, আংশিক সময়ের কাজ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। অনেকেই বেকার থাকে এবং উঞ্ছবৃত্তি ও অসামাজিক কার্যের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে।

2. নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব— নাগরিক পরিষেবার উপর জনসংখ্যার বৃদ্ধি জনিত চাপ এসে পড়ায় পরিষেবার বিঘ্ন ঘটে। প্রতিদিন নতুন নতুন এলাকা সংযোজিত হওয়ায় সর্বত্র সম মানের পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয় না। পানীয় জল, নিকাশী ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন রাখা, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক পরিষেবা বিঘ্নিত হয়। নিকাশী ব্যবস্থার উপর চাপ পড়ে ফলে সমস্ত ব্যবস্থাটাই অকেজো হয়ে পড়তে থাকে। কলকাতা, মুম্বই প্রভৃতি মহানগরগুলির অবস্থা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

3. পরিবহণ ব্যবস্থার উপর অতিরিক্ত চাপ—মহানগরের বৃদ্ধি ও তার অর্থনৈতিক উন্নতি অনেকটাই উন্নত ও দ্রুতগতির পরিবহণ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে জনসংখ্যার অনুপাতে রাস্তাঘাটের পরিমাণ বাড়ে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ ও পণ্য পরিবহণের জন্য পৃথক ব্যবস্থা না থাকায় উভয়ের চলাচলই বিঘ্নিত হয়। নিত্যযাত্রীদের জন্য দ্রুতগামী রেল ও বাস পরিবহণ অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু রাস্তাঘাটের প্রসার নগরায়ণের গতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ার ফলে ব্যস্ত সময়গুলিতে যানজট নিত্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে আবার বায়ুদূষণও ঘটতে থাকে।

4. ঘিঞ্জি অস্বাস্থ্যকর আবাসিক অঞ্চল—জনসংখ্যার চাপ যত বাড়ে, মহানগরের কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি যত বাড়ে, জমির দামও সেই হারে বাড়তে থাকে। এর প্রভাব মহানগরের উপর দুভাবে এসে পড়ে। জমির সংকট মেটানোর জন্য বাড়িগুলির উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। ছোট ছোট অপরিসর ফ্ল্যাট বাড়ি সংখ্যায় বাড়তে থাকে। অপরদিকে বহিরাগত মানুষজন যাদের সেটুকুও যোগাড় করার সামর্থ্য নেই তারা বস্তি অথবা ঝুপড়ি বানিয়ে, রেল লাইনের ধারে, রাস্তার পাশে জমি দখল করে বাস করতে শুরু করে। নাগরিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত এই সমস্ত অঞ্চলে মানুষ ঘেঁষাঘেঁষি করে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকতে বাধ্য হয়।

5. পরিবেশ দূষণ — কলকারখানা, যানবাহনের পরিত্যক্ত ধোঁয়ায় বায়ুদূষণ মহানগরের দুর্বিষহ সমস্যা। ধূলো এবং ধোঁয়ায় বায়ুদূষণের মাত্রা এমন তীব্র রূপ ধারণ করে যে, এর ফলে কুয়াশা এবং ধোঁয়াশা (smog) সৃষ্টি হয়। এই পরিবেশে ফুসফুসের অসুখ, হাঁপানি, এ্যালার্জি প্রভৃতিতে মানুষ সহজেই আক্রান্ত হয়ে পড়ে। উষ্ণতা বাড়ে, বৃষ্টির পরিমাণ কমে এবং আশপাশের অঞ্চল থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজ করে। জলদূষণ মহানগরগুলির অপর এক সমস্যা। পরিশোধিত পানীয় জল সরবরাহের পরিমাণ জনসংখ্যার সঙ্গে সমানভাবে বাড়ানো সবসময় সম্ভব হয় না। ফলে জলসংকট তীব্র আকার নেয়। উপরন্তু নিকাশী নালাগুলি পরিস্কার করা এবং নিকাশী জল শোধনের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অপরিশোধিত জল ভূপৃষ্ঠস্থ জলের সঙ্গে মিশে জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায়। ভূপৃষ্ঠস্থ জলের সরবরাহ যথেষ্ট না হওয়ায় নলকূপের মাধ্যমে ভৌমজল ব্যবহার করা হয়। ভৌমজল অতিরিক্ত ব্যবহার করার ফলে মাটির নীচের শিলাস্তরে ভারসাম্যের অভাব হয়। বিভিন্ন ক্ষতিকারক খনিজপদার্থ ভৌমজলের সাথে এসে মেশে। যেমন, কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আর্সেনিক দূষণ। কলকারখানাগুলি থেকে নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থ জলের সাথে মিশে দূষণ ঘটায়। যেমন, রং কারখানা থেকে শিশা (lead), কাগজকল, কাপড় কল থেকে ব্লীচিং পাউডার প্রভৃতি জলে এসে মেশে। শব্দদূষণ আরেকটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা। কলকারখানার শব্দ, গাড়িঘোড়ার শব্দ মহানগরের অধিবাসীদের দুভাবে ক্ষতি করে। অতিরিক্ত শব্দদূষণের ফলে বধিরতা দেখা দেয়, অল্প বয়সে শ্রবণশক্তি হ্রাস পায়। একটানা শব্দ দূষণের ফলে মস্তিষ্কের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটে। এর ফলস্বরূপ অধৈর্য, অল্পে রেগে যাওয়া, মনোযোগের বিঘ্ন ঘটে। এমনকি এর থেকে অবসাদ, মানসিক ক্লান্তি, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ পর্যন্ত ঘটতে পারে।

6. সরকারী ও প্রশাসনিক সমস্যা— মহানগর আয়তনে বিস্তৃত হতে থাকলে প্রশাসনিক জটিলতা তৈরী হতে থাকে। প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা আলাদা বিভাগ থাকলেও সমন্বয়ের অভাবে সেগুলি ভালমতো কাজ করতে পারে না। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে মহানগরের সমস্যাগুলিকে নিম্নলিখিতরূপে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়।

1. ভৌত সমস্যা —

(ক) আয়তনের অপরিকল্পিত বৃদ্ধি।

(খ) নাগরিক পরিষেবার অপ্রতুলতা।

(গ) শহরতলি এলাকার ক্রম সম্প্রসারণ।

(ঘ) অপরিসর রাস্তাঘাট এবং রক্ষণাবেক্ষণে ব্যর্থতা।

(ঙ) যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব এবং যানজট।

(চ) ঐতিহ্যবাহী ভবন প্রভৃতি সংরক্ষণের অসুবিধা।

(ছ) বস্তি ও ঝুপড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি।

2. অর্থনৈতিক সমস্যা —

(ক) উচ্চতম ও নিম্নতম আয়ের দুস্তর পার্থক্য।

(খ) শহরের কেন্দ্রীয় অংশ ও উপকণ্ঠের মধ্যে আয়ের বন্টনে পার্থক্য।

(গ) জমির মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি।

(ঘ) দারিদ্র্য ও বেকারত্ব।

(ঙ) কায়িক শ্রমের মূল্য হ্রাস।

3. সামাজিক সমস্যা —

(ক) পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতাবোধ।

(খ) অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি।

(গ) কৈশোরে অপরাধপ্রবণতা।

(ঘ) আত্মপরিচিতি নাশ।

4. জনসংখ্যা সম্বন্ধীয়—

(ক) মাত্রাতিরিক্ত জনঘনত্ব।

(খ) গ্রামাঞ্চল থেকে প্রব্রজন ও পরিবার বিচ্ছিন্নতা।

(গ) বহিরাগতদের চাপে স্থানীয় অধিবাসীদের কোণঠাসা হওয়া।

5. পরিবেশগত সমস্যা—

(ক) অপরিসর, অস্বাস্থ্যকর আবাসিক এলাকা।

(খ) বায়ুদূষণ

(গ) জলদূষণ

(ঘ) শব্দদূষণ

(ঙ) দৃশ্যদূষণ।

2.6 মেট্রোপলিটান পরিকল্পনা

অধিকাংশ মহানগরগুলি স্বাভাবিকভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠেছে। তাই পশ্চিম ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া ও আমেরিকার বেশীরভাগ মহানগরগুলির আভ্যন্তরীণ বিন্যাসে শৃঙ্খলার অভাব রয়েছে। রাস্তাঘাটগুলি নানা দিকে বিভিন্ন কোণে ছড়ানো, আঁকাবাঁকা, কোথাও সরু, কোথাও বা চওড়া। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের বৃদ্ধি শিল্পবিপ্লবের আগে পর্যন্ত নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। হঠাৎই গ্রাম থেকে শহরে প্রব্রজনের সংখ্যা বাড়ে এবং মহানগরগুলি যেখানে সেখানে যেমন তেমন ভাবে আকৃতিতে বাড়তে থাকে। ফলে যে অবিন্যস্ত চেহারা নেয় পরবর্তীকালে বাস করার জন্য একান্তভাবেই তা পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যেমন 1666 সালে লন্ডনে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড হয় যা নেভানোর জন্য রাস্তার অভাবে সময়মত পৌঁছোন যায়নি। এর ফলে শহরের এক বড় অংশের ঘিঞ্জি বসতি এলাকা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। বহু পুরনো শহরের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা এত ঘন বসতিপূর্ণ এবং বাণিজ্যিক প্রয়োজনে এত বেশী ঘিঞ্জি হয়ে পড়েছে যে বিকেন্দ্রীকরণের আশু প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে।

তবে এ কথা মনে করা ভুল হবে যে প্রাচীন কালে নগর পরিকল্পনার কোন ধারণা ছিল না। গ্রীক, রোমান এবং চীনাদের মধ্যে নগর পরিকল্পনার বিকাশ ঘটেছিল। ভারতেও নগর পরিকল্পনার ইতিহাস অনেকদিনের। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করা। এথেন্স, রোম, প্রভৃতি এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ভারতে সিন্ধুসভ্যতার আমলেও মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা শহরে আয়তাকার নগর পরিকল্পনার চিহ্ন পাওয়া গেছে। পূর্বে আট ধরনের নগর পরিকল্পনা প্রচলিত ছিল। মনসরা শিল্পশাস্ত্র অনুযায়ী দণ্ডকা, সর্বতোভদ্র, নন্দভত্র, পদ্মকা, স্বস্তিক, প্রস্তর, কার্মুক এবং চতুর্মুখ—এই আটটি নগর পরিকল্পনার প্রকারভেদ ছিল। এগুলির অধিকাংশই আয়তাকার, বর্গাকার অথবা বৃত্তাকার। শহরে প্রবেশের চারটি পথ থাকত। প্রধান প্রবেশ পথের পাশে থাকত মন্দির, বড় পুষ্করিণী এবং সকলের মিলিত হবার জন্য উন্মুক্ত স্থান, পুরো শহরটি চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা থাকত এবং বর্ণ অনুযায়ী আবাসিক এলাকা ছোট ছোট ব্লকে ভাগ করা থাকত। সোজা রাস্তা দিয়ে এলাকাগুলি বিভক্ত করা হত।

ঔপনিবেশিক আমলে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় যে শহরগুলির পত্তন হয় তাদের অধিকাংশেরই পরিকল্পনা ছিল চৌখুপি (grid-iron) অথবা অঙ্গুরীয়াকার (radial)। ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তদশ শতকে ইউরোপে যে সব নতুন শহর গড়ে ওঠে বা পুরনো শহরের সংস্কার সাধন করা হয় সেখানে উপরোক্ত দুটি প্যাটার্ন নেওয়া হয়েছিল। আরেক ধরণের বিন্যাস হল Vista. এক্ষেত্রে লম্বা রাস্তা একটি কোন স্মারক স্থাপত্যের সামনে গিয়ে শেষ হত। অন্যান্য রাস্তাগুলির অঙ্গুরীয়াকার বিন্যাস ঐ প্রধান স্মারকটি থেকে

বৃত্তাকারে চতুর্দিকে ছড়ানো থাকত। ফ্রান্সের ভার্সাই, যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডি. সি., ব্রাজিলের ব্রাসিলিয়া এই প্রকার পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মহানগরগুলি যেহেতু ফাঁকা জমির উপর পত্তন করা হয়েছিল তাই grid-iron প্যাটার্ন বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু পরের দিকে দেখা গেছে যে মহানগর যখন তার আপন গতিতে বাড়তে আরম্ভ করেছে তখন তার পুরনো বিন্যাস পুরোপুরি বজায় থাকে নি। নতুন নতুন বাজার এলাকা ও আবাসিক অঞ্চল সুবিধামতন গড়ে উঠেছে। (চিত্র 2.1 & 2.2)

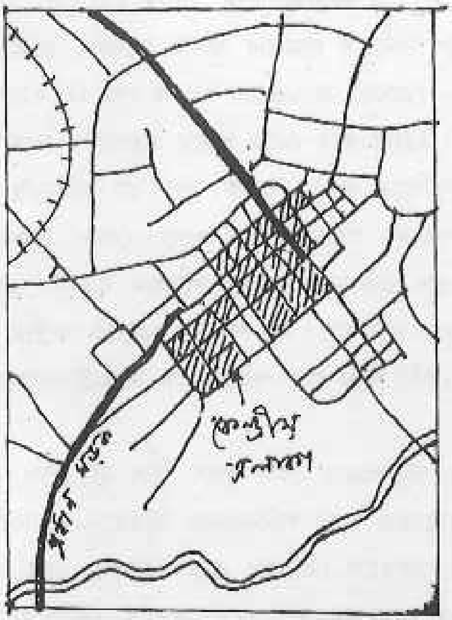

তাইপিং-পারক-গ্রিড-আয়রণ সিস্টেমে গড়ে ওঠা শহর

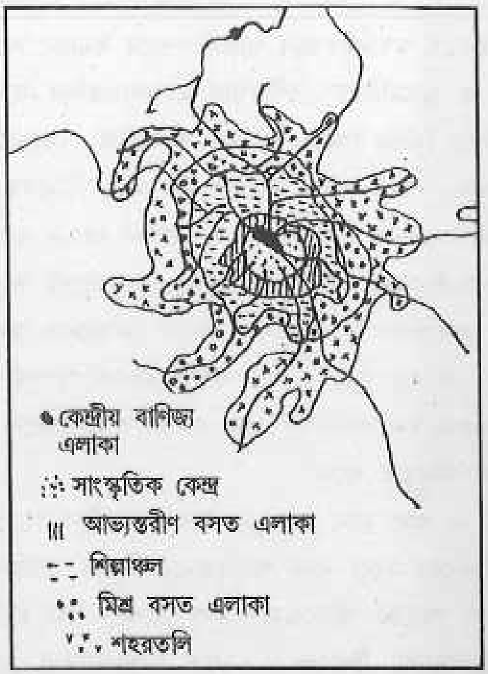

(চিত্র 2.1 ও চিত্র 2.2)

বর্তমানে পরিবেশ সচেতনতা বাড়ার ফলে grid-iron এবং vista-দুটি পদ্ধতিই কতকটা বাতিল হয়ে গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা, মালয়েশিয়ার পেটালিং জয়া শহর দুটিতে উদ্যান শহর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সমগ্র শহরটি একটি লম্বাটে পার্কের দুধারে বিন্যস্ত। পার্কে এবং রাস্তার দুধারে প্রতি বছর অসংখ্য গাছ লাগানো হয়। বর্তমানে মহানগরগুলি ব্যস্ততম অঞ্চল থেকে প্রধান বাজারগুলিকে সরিয়ে মার্কেট কমপ্লেক্স গড়ে তোলা হচ্ছে। এর ফলে যানজট এড়িয়ে ভিড় বাঁচিয়ে বাজার করা যাচ্ছে। কার পার্কিং-এর সুবিধা, রেস্টুরান্ট প্রভৃতি থাকায় বাজার করতে আসা লোকজনের সুবিধা হচ্ছে এবং অন্যদিকে মহানগরেরও পরিবেশ পরিচ্ছন্ন থাকছে। লন্ডন ও বার্মিংহামের মাঝে নতুন শহর মিলটন কেইনস্, পুরনো শহর ভিয়েনা তে মহানগরের উপকণ্ঠে এই ধরণের সুবৃহৎ মার্কেট কমপ্লেক্স গড়ে তোলা হয়েছে।

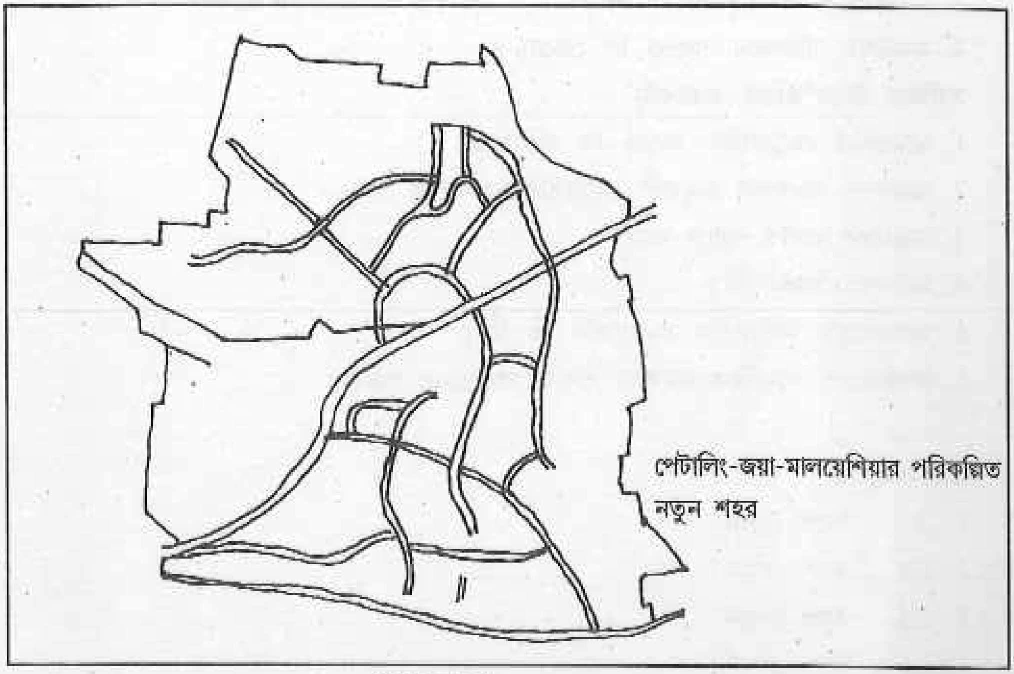

(চিত্র 2.3)

মহানগরগুলির উপর জনসংখ্যার চাপ বাড়ার ফলে জমির দাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। আবাসনের চাহিদা পূরণের জন্য ছোট ছোট বাড়ির পরিবর্তে গগনচুম্বী অট্টালিকা তৈরী করে জমির সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় দুর্ভাগ্যবশত দেখা গিয়েছে যে, নানা ধরণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার লোকজন পাশাপাশি বাস করা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কোন সাংস্কৃতিক বিনিময় ঘটে নি বরঞ্চ বিচ্ছিন্নতাবোধ জন্ম নিয়েছে। প্রতিবেশীর প্রতি সৌভ্রাতৃত্ব বোধের জায়গায় অবিশ্বাস এবং ঔদাসীন্য বাসা বেঁধেছে। সেকারণে আবার ছোট ছোট বাড়ি ও সামনে একটু বাগান যাতে আসা যাওয়ার পথে প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপচারিতার সুযোগ ঘটে সেভাবে আবাসিক অঞ্চলগুলিতে পরিকল্পনা করার কথা ভাবা হচ্ছে।

ভারতের মহানগরগুলির মধ্যে চণ্ডীগড়, ভুবনেশ্বর, ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতি গুটিকয়েক বাদ দিলে অধিকাংশই ঔপনিবেশিক আমলে গড়ে উঠেছে। দিল্লী এবং হায়দ্রাবাদের ইতিহাস অবশ্য প্রাচীন। কিন্তু বিকাশ এবং অগ্রগতি ঔপনিবেশিক আমলেই শুরু হয়েছিল। তাই কলকাতা, মুম্বাই, চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, আমেদাবাদ, এমনকি দিল্লীতেও শহরের মূল বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক এলাকা অত্যন্ত ঘনসংবদ্ধ। মহানগরগুলির বিকেন্দ্রীকরণ, নতুন আবাসিক ও প্রশাসনিক এলাকা গড়ে তোলার জন্য শহরের উপকণ্ঠে উপনগরী গড়ে তোলা হচ্ছে। যেমন, দিল্লী ও নতুন দিল্লী, হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ, কলকাতা ও সল্টলেক এবং রাজারহাট উপনগরী ইত্যাদি।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

1. মহানগরের সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত পর্যালোচনা করুন।
2. মহানগর এলাকার সীমা কিভাবে নির্ধারণ করা যায়?

3. মহানগরের সমস্যাগুলি কি কি ?

4. মহানগর পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায় ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

1. মামফোর্ড মেট্রোপলিস বলতে কি বুঝিয়েছেন ?

2. ভারতের জনগণনা অনুযায়ী মেট্রোপলিসের সংজ্ঞা দিন।

3. মহানগর এলাকা কাকে বলে ?

4. মহানগর অঞ্চল কি ?

5. মহানগরের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি কি কি ?

6. মহানগরের সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি আলোচনা করুন।

উত্তরমালা :

1. 2.3 অংশ দেখুন।

2. 2.4 অংশ দেখুন।

3. 2.5 অংশ দেখুন।

4. 2.6 অংশ দেখুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর :

1. 2.4 অংশে Lewis Mumford-এর শহরের উৎপত্তি ও বিকাশের পর্যায়ক্রম অংশ দেখুন।

2. 2.3 অংশ দেখুন।

3. 2.3 অংশ দেখুন।

4. 2.3 অংশ দেখুন।

5. 2.5 অংশ দেখুন।

6. 2.5 অংশ দেখুন।

2.7 গ্রাম—নগরের যোগাযোগ

গ্রাম ও নগর দুটি পৃথক সত্বা নয়। বরঞ্চ পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত—গ্রাম কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদিত দ্রব্য যোগান দেয় আর শহর ও নগর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রের শিল্পদ্রব্য ও সেবামূলক কাজের যোগানদার। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শহর ও গ্রামের মধ্যে আদান প্রদানের সম্পর্ক ক্রমাগত বেড়েছে, শহুরে কর্মধারা ও জীবনযাত্রা নানা পথে গ্রামকে অধিকার করে নিচ্ছে। বর্তমানে যোগাযোগ যত বেশী সুগম হয়েছে ততই শহর ও গ্রামের মধ্যে পার্থক্য কমে আসছে। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, ট্রেন-বাস সংযোগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরস্পর নির্ভরশীলতাও বাড়ছে। শহরের নিকটবর্তী গ্রামীণ এলাকা শহরে দুধ, শাকসব্জী প্রভৃতি সরবরাহ করে, আবার শহরের পাইকারি বাজার থেকে গ্রামের খুচরো দোকান তার মালপত্র যোগাড় করে আনে। গ্রাম থেকে নগরে প্রতিদিন বহু মানুষ চাকরি ও ছোট ব্যবসাসূত্রে আসা-যাওয়া করেন। কোর্ট কাছারি ও প্রশাসনিক কাজেও গ্রামের মানুষকে শহরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হয়। অপরদিকে শহুরে অভিজাত মানুষজন গ্রামে তাঁদের খামার বাড়ি, গ্রীষ্মকালীন আবাস প্রভৃতি স্থাপন করেন। এইভাবে পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় দিক থেকেই গ্রাম এবং শহর ও নগর উপকৃত হয়।

গ্রাম ও শহরের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপকতার মধ্যে পার্থক্য আছে। যোগাযোগের প্রসারতা ও গভীরতা, পণ্য ও সেবা বিনিময়ের মাত্রা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ভূগোলবিদ্ গ্রাম-শহরের সম্পর্ককে নানা ভাবে আলোচনা করেছেন।

(ক) গ্রাম-শহর উপকণ্ঠ (Rural urban fringe) : Von Thunen 1826 সালে দেখিয়েছেন যে একটি শহর অথবা শিল্পকেন্দ্রকে ঘিরে গোলাকারে অন্যান্য সরবরাহ অঞ্চলগুলি গড়ে ওঠে। 1925 সালে জোনাসন (Jonasson) এবং 1928 সালে ম্যাকেঞ্জি (Mackanje) ইউরোপীয় শহর সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেন যে, শহরগুলি বাংলোবাড়ি, গুদাম, কারখানা, এল. পি. জি. ফিলিং স্টেশন প্রভৃতি তৈরীর জন্য চারপাশের গ্রামীণ এলাকাগুলি ব্যবহার করে। 1955 সালে R. L. Singh (1955), R. C. Gupta (1972) এবং M. M. P. Sinha (1980) যথাক্রমে বারাণসী, দিল্লী ও পাটনা শহরে সমীক্ষা চালিয়ে দেখেন যে মূল শহর থেকে যত গ্রামীণ এলাকায় অগ্রসর হওয়া যায় তত ধীরে ধীরে যোগাযোগের প্রকৃতি বদলাতে থাকে এবং গ্রামের জীবনযাত্রার উপর শহরের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে।

শহরতলি এলাকাকে চিহ্নিত করার জন্য ভূগোলবিদেরা অনেক ধরণের সংজ্ঞা প্রয়োগ করেছেন। R.L. Singh-এর মতে শহরতলি হল এমন গ্রামীণ এলাকা যার কিছু কিছু শহুরে বৈশিষ্ট্য আছে। আবার R. E. Dickinson শহরতলি বলতে সেই সব অঞ্চলকে বুঝিয়েছেন যেখানে প্রধান যোগাযোগ পথের দুধারে কারখানা, পানীয় জল পরিশোধন কেন্দ্র, গ্যাস ফিলিং স্টেশন প্রভৃতি গড়ে ওঠে এবং অনেক বাড়িঘরের কাঠামো শহুরে ধাঁচের হয়। বিনোদনের জন্য খামার বাড়ি, খেলাধূলার জন্য গল্ফ কোর্স, পোলো কোর্স প্রভৃতি থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে শহরতলি প্রকৃতপক্ষে শহর ও গ্রামের মধ্যবর্তী পরিবর্তনশীল অঞ্চল। এই অঞ্চলের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

(i) এই অঞ্চলে কলকারখানা, ঘরবাড়ি সবই কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে গড়ে ওঠে।

(ii) শহর যত তার কর্মকাণ্ড প্রসারিত করতে থাকে জমির দামও তত বাড়তে থাকে। বাড়তি টাকার লোভে কৃষকেরা তাদের কৃষিজমি বিক্রি করে দেয়।

(iii) দাম যত উর্ধ্বমুখী হয় তত দ্রুত জমির হাতবদল ঘটে।

(iv) এই অঞ্চল থেকে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ নানা কাজে শহরের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে যাতায়াত করে।

(v) শহরতলি অঞ্চলে জনঘনত্ব দ্রুত বাড়তে থাকে এবং জীবনযাত্রার মান ও প্রকৃতি সতত পরিবর্তনশীল হয়।

(vi) শহরের আগ্রাসী ভূমিকা প্রবল হলেও এই অঞ্চলে কিছু কিছু শাকসব্জী চাষ, পশুপালন, দুগ্ধ সরবরাহ প্রভৃতি গ্রামীণ কাজকর্ম বজায় থাকে।

অনেক ভূগোলবিদ্ শহরতলি অঞ্চলকে আবার প্রধান (Primary) ও গৌণ (secondary) এই দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রধানতঃ পাঁচটি উপাদানের ভিত্তিতে এই বিভাগ করা হয়েছে—

- শহরে কাজের জায়গায় পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় সময়।
- শহুরে জীবনযাত্রা অভ্যাসের মাত্রা।
- জমির দাম।
- জনঘনত্ব। ও
- প্রাথমিক ক্ষেত্রে কার্যে নিযুক্ত জমির পরিমাণ।

(খ) উম্‌ল্যান্ড (Umland) : ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী Andrew Allix (1914) উম্‌ল্যান্ড কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন। শহরের চতুর্পার্শ্বস্থ এলাকাকে বোঝানোর জন্য তিনি এই শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন। পরবর্তীকালে অনেকেই এই শব্দটি ব্যবহার করেন ও নানাভাবে একে সংজ্ঞায়িত করেন। Whittlesey উম্‌ল্যান্ড বলতে শহরের চারপাশে 30/40 মাইল ব্যাসার্ধ যুক্ত এলাকাকে বুঝিয়েছেন। Griffith Taylor নগরের সঙ্গে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে সম্পর্কিত এলাকাকে উম্‌ল্যান্ড আখ্যা দিয়েছেন। R.L. Singh-এর মতে শহরের সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে সম্পর্কিত অঞ্চল হল উম্‌ল্যান্ড।

উম্‌ল্যাণ্ডের সীমা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন ভূগোলবিদ্‌রা কতকগুলি উপাদানকে ব্যবহার করেছেন। যেমন—

(i) সবজি ও দুধ সরবরাহ এলাকা।

(ii) বাস পরিষেবা এলাকা।

(iii) নিত্যযাত্রী যাতায়াত অঞ্চল।

(iv) স্বাস্থ্য পরিষেবা এলাকা।

(v) শিক্ষা পরিষেবা এলাকা।

(vi) সংবাদপত্র প্রচারের পরিধি।

(vii) খুচরো বিক্রয় এলাকা। ইত্যাদি।

(গ) হিন্টার ল্যান্ড (Hinterland) — ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী Andrew Allix (1914) এবং ঐ একই বছরে Van eleff অর্থনৈতিক পরিবেশকে উম্‌ল্যান্ড ও হিন্টারল্যান্ড এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। হিন্টারল্যান্ড শব্দটি প্রকৃতপক্ষে বন্দর-শহরের পশ্চাদ্‌ভূমি বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। যে বিস্তীর্ণ এলাকা বন্দরের পরিষেবার

উপর নির্ভরশীল এবং যে অঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য ঐ বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানী করা হয় সেই অঞ্চলকে হিন্টারল্যান্ড বলা হয়েছে।

2.8 গ্রাম-নগরের সম্পর্কের ক্ষেত্রসমূহ

গ্রাম ও শহরের সম্পর্ক ও যোগাযোগের ক্ষেত্রগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

(১) ভৌত যোগাযোগ (Physical linkage)— গ্রামের মানুষ নানা কাজে শহরে যাতায়াত করেন এবং সেকারণে গ্রাম-শহরের মধ্যে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হওয়া প্রয়োজন। এই যোগাযোগ নানাভাবে সাধিত হতে পারে। যেমন—

(ক) যাতায়াত ব্যবস্থা— পৌরকেন্দ্রগুলি নানা দিক থেকে আসা রাজপথ ও রেলপথের মিলনকেন্দ্র হিসাবে গণ্য হয়। এই যোগাযোগ পথগুলি একটি পৌরকেন্দ্রের রক্তসংবাহী নালীর মত। এগুলির মাধ্যমে গ্রাম থেকে উৎপাদিত কৃষি ও ডেয়ারীজাত পণ্য শহরে আসে এবং শহর থেকে খুচরো ব্যবসার মালপত্র লেনদেন হয়। যাতায়াত ব্যবস্থা যত উন্নত ও দ্রুতগামী হয় শহরের প্রভাব বলয় তত প্রশস্ত হয়।

(খ) যোগাযোগ ব্যবস্থা— টেলিফোন সংযোগ, সংবাদপত্র, কেবল্ টি. ভি. প্রভৃতির মাধ্যমে যোগাযোগ যত উন্নত হয় শহরে ভাবনাচিন্তা এবং জীবনযাত্রার পদ্ধতি তত গ্রামীণ জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

(গ) নিত্যযাত্রী সংযোগ— শহরের কর্মকাণ্ড যত ব্যাপক ও বিস্তৃত হয় ততই নতুন নতুন কর্মসংস্থান তৈরী হয়। গ্রাম থেকে বহুলোক প্রতিদিন এই সব কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত করেন। নিত্য আসা যাওয়ার ফলে গ্রাম-শহরের মধ্যে সম্পর্কের আদান-প্রদান সহজ হয়। আবার শহরের কারখানার জন্য জমির সংস্থান না হওয়ায় শহরের উপকণ্ঠে যে সব কলকারখানা গড়ে ওঠে অনেক শহরবাসীও সেগুলিতে কাজের সুবাদে যাওয়া আসা করেন। এভাবে প্রাত্যহিক যোগাযোগের ফলে সম্পর্ক দৃঢ় হয়।

(২) পণ্য বিনিময় সম্পর্ক — শহর ও গ্রামের মধ্যে সম্পর্কের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হল পণ্য বিনিময়। সমগ্র অঞ্চলের উন্নতির জন্য এই সম্পর্ক প্রসারিত হওয়া দরকার। বিনিময়যোগ্য প্রধান পণ্যগুলি নিম্নরূপ :—

(ক) কৃষিজাত ও ডেয়ারী পণ্য — শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ এলাকাগুলিতে সব্জী চাষ, পশুপালন, পোলট্রি প্রভৃতি গড়ে ওঠে। এদের প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র হল নিকটবর্তী পৌর এলাকা, আঞ্চলিক উন্নয়ন, পরিকাঠামোর উন্নতি প্রভৃতি এই পণ্যগুলির উৎপাদন ও বন্টনের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

(খ) শিল্পজাত পণ্য — বস্ত্রবয়ন শিল্প, পাটশিল্প, চিনি ও বেকারী শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ইত্যাদি কাঁচামালের জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের উপর নির্ভরশীল হয়। শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকের সরবরাহের একটা বড় অংশ উমল্যান্ড যোগান দেয়। শহর থেকে কৃষক রাসায়নিক সার, পাম্পসেট, উচ্চফলনশীল বীজ প্রভৃতি কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে আনে।

(গ) খুচরো ও পাইকারী ব্যবসা — পাইকারী ও গুদামজাত পণ্যের খুচরো ব্যবসার বাজারের বড় ক্ষেত্র গ্রামাঞ্চল। বস্ত্র, ঔষধপত্র, খেলার সরঞ্জাম, বইখাতা, সাজের জিনিস প্রধানতঃ শহর থেকেই গ্রামের খুচরো বাজারে নিয়ে আসা হয়।

(৩) সামাজিক সম্পর্ক — সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের সম্পর্ক সবচেয়ে বেশী মজবুত হয়। নানাদিক থেকে এই সম্পর্ক প্রসারিত হয়েছে।

(ক) সামাজিক বিনিময়— পারিবারিক ও বৈবাহিক সম্পর্ক গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ নিকটতর করে। বহু ব্যক্তি চাকরি সূত্রে শহরে থাকলেও পরিবার গ্রামের বাড়িতেই থাকে। প্রতি সপ্তাহন্তে তাঁরা গ্রামের বাড়িতে যান এবং তাঁদের বাড়িগুলি শহুরে তৈজসপত্রে সেজে ওঠে।

(খ) সাংস্কৃতিক বিনিময়— খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির ক্ষেত্রে শহরের প্রভাব গ্রামের দিকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা সিনেমা থিয়েটার, মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা প্রভৃতি দেখার জন্য শহরে ভিড় জমায়। আবার শহরের উচ্চবিত্তরা গ্রামে তাঁদের খামার বাড়ি, অবসর আবাসন প্রভৃতি তৈরি করেন।

(গ) শিক্ষা ও উৎকর্ষ কেন্দ্র — বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র, স্পোর্টস ইনস্টিটিউট প্রভৃতির জন্য গ্রামের মানুষকে শহরের উপর নির্ভর করতে হয়।

(ঘ) উচ্চমানের চিকিৎসা — গ্রাম থেকে শহরের বড় বড় হাসপাতাল ও নার্সিংহোম গুলিতে রোগী ও তাঁর পরিবারের মানুষজনের নিয়মিত যাতায়াত লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য বর্তমানে শহরের প্রান্তবর্তী গ্রামীণ এলাকাগুলিতে অনেক আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ও ম্যাসাজ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। শহর থেকে অনেকেই দেশজ পদ্ধতিতে চিকিৎসা লাভের জন্য এগুলিতে আসেন।

(৪) তথ্য সংগ্রহ — অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য গ্রামের মানুষকে শহরের উপর নির্ভর করতে হয়। যেমন—

(ক) ব্যাঙ্ক ও বীমা সংক্রান্ত — কৃষিঋণ, স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প, স্বনির্ভর প্রকল্প প্রভৃতি গ্রাম কেন্দ্রিক ব্যাঙ্ক পরিষেবা সংক্রান্ত খোঁজ খবর ; কৃষি ফসলের বীমা, কোল্ড স্টোরেজ প্রভৃতি সম্পর্কিত তথ্য ও যোগাযোগের প্রধান কেন্দ্র হল নিকটবর্তী শহর। অবশ্য গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক প্রভৃতির শাখা গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারিত হওয়ায় এই ব্যাপারে শহর নির্ভরতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

(খ) প্রশাসনিক নির্ভরতা— রাজ্য রাজধানী, জেলার সদর দপ্তর, সাব-ডিভিশনের সদর শহরাঞ্চলেই অবস্থিত হয়। জেলা কোর্ট, হাইকোর্ট, পুলিশের প্রধান কার্যালয় ইত্যাদির প্রয়োজন থাকলে গ্রামের মানুষকে শহরেই আসতে হয়।

(গ) রাজনৈতিক প্রয়োজন — রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, প্রশাসনিক নীতি, প্রভৃতি কারণে গ্রাম-শহরের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত হয়। উপনগরী নির্মাণ, শহরের বাণিজ্য এলাকার বিকেন্দ্রীকরণ, ট্রাক টার্মিনাল তৈরী প্রভৃতির প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত অনেক সময় রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নেওয়া হয়। কোন অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নতির জন্য গ্রাম-শহরের মধ্যে যোগাযোগ যত প্রসারিত হয় ততই ভাল।

প্রধান পৌর বসতি এবং তার চতুর্পার্শ্বস্থ প্রান্তবর্তী অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাবার জন্য Friedman তাঁর Core-Periphery মডেল প্রয়োগ করেছেন। ভেনিজুয়েলার আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি এই মডেলটি উদ্ভাবন করেন। শহর হল কেন্দ্রীয় (Core) এলাকা — এখান থেকেই শিল্প দ্রব্য, মূলধন, কারিগরি জ্ঞান প্রভৃতি শহরতলি ও পার্শ্বস্থ গ্রামীণ এলাকায় যায়। অপর দিকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল (Peripheral region) শ্রমিক, ক্রেতা, খাদ্য ও শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ করে। পারিপার্শ্বিক এলাকা তাদের উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় অঞ্চলের ওপর নির্ভর করে আর কেন্দ্রীয় অঞ্চলে নানা ধরণের কর্মকাণ্ড একত্রিত হয় বলে অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এইভাবে আঞ্চলিক উন্নয়নকে কেন্দ্রীয় অঞ্চল নেতৃত্ব দেয় ও তার পার্শ্ববর্তী সরবরাহ এলাকা একই সাথে ধীরে ধীরে অগ্রগতি করতে থাকে।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী—

1. গ্রাম ও শহরের মধ্যে কি কি ধরণের সম্পর্ক আছে ?

2. শহরতলি অঞ্চল কি ভাবে শহরের উপর নির্ভরশীল ?

3. উমল্যান্ড এবং হিন্টারল্যান্ডের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

4. গ্রাম ও শহর পরস্পরের উপর কিভাবে নির্ভরশীল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

1. উমল্যান্ড কি ?

2. শহর কি কি কারণে উমল্যান্ডের উপর নির্ভর করে ?

3. কোর-পেরিফেরি মডেলের মাধ্যমে ফ্রিডম্যান কি বোঝাতে চেয়েছেন ?

4. শহরতলি এলাকাকে কিভাবে চিহ্নিত করা যায় ?

উত্তরমালা :

1. 2.8 অংশ দেখুন।

2. 2.7 অংশে শহরতলি (ক) অংশটি দেখুন।

3. 2.7 অংশে উমল্যান্ড (খ) ও হিন্টারল্যান্ড (গ) অংশদুটি দেখুন।

4. 2.8 অংশ দেখুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর :

1. 2.7 অংশে উমল্যান্ড (খ) অংশটি দেখুন।

2. 2.7 অংশে উমল্যান্ড (খ) অংশটি দেখুন।

3. 2.8 অংশে ফ্রিডম্যানের মডেল দেখুন।

4. 2.7 অংশে শহরতলি (ক) অংশটি দেখুন।

একক 3 ❑ গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প—ভারতের উদাহরণ

গঠন

3.0 গ্রামের উন্নয়ন প্রকল্প—ভারতের উদাহরণ

3.1 গ্রামোন্নয়নের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী

3.2 ভারতের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা

3.3 আঞ্চলিক উন্নয়নে কৃষি ও শিল্পের ভূমিকা

3.4 আঞ্চলিক উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা

3.5 আঞ্চলিক উন্নয়নে শিল্পের ভূমিকা

3.6 আঞ্চলিক বৈষম্য

3.0 গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প— ভারতের উদাহরণ

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলি এখনও পর্যন্ত গ্রামীণ অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। তিন চতুর্থাংশ লোক গ্রামে বাস করে যার অধিকাংশই কৃষিজীবী। এদের মধ্যে 40 শতাংশ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে। উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রায় অর্ধেক লোকই দারিদ্র কবলিত অবস্থায় দিনযাপন করে। এদের মধ্যে অপুষ্টির হার এত বেশী যে প্রায়শই শারীরিক এবং মানসিক বৃদ্ধি ব্যহত হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম ও সংক্রামক ব্যাধির সহজ শিকার। এই জনসংখ্যার এক বড় অংশ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। এই অবস্থার যদি পরিবর্তন করতে হয় তবে কেবলমাত্র কৃষির উন্নতিই যথেষ্ট নয়। এমনকি ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি মিটিয়ে দিলেও অবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন অসম্ভব। সামগ্রিকভাবে অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য তাই সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা প্রয়োজন যার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে মানুষ দারিদ্র্যের কবল থেকে মুক্ত হয়ে সুস্থ, স্বনির্ভর জীবনযাপন করতে পারবে।

3.1 গ্রামোন্নয়নের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী

দীর্ঘদিন পর্যন্ত গ্রামোন্নয়ন বলতে গ্রামে শিল্প স্থাপন করাকে বোঝানো হত। বিকেন্দ্রীকরণের একটি পদ্ধতি হিসাবে এটি খুবই প্রচলিত ছিল। কিন্তু এর ফলে গ্রামের মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ খুব একটা প্রসারিত হত না। কারণ, বড় বড় শিল্প কারখানায় কাজ করার উপযুক্ত দক্ষতা স্থানীয় লোকেদের বড় একটা থাকত না। একমাত্র কুটির শিল্পের মাধ্যমে কিছু কর্মসংস্থান হত কিন্তু বড় শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কুটির শিল্পের বিকাশ সব সময়ই ব্যহত হত। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প পরস্পরের পরিপূরক না হওয়ায় ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগ কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হত। এই কারণে গ্রামোন্নয়নের ইচ্ছা বা উদ্যোগ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তা সফল হত না। গ্রামোন্নয়নের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীগুলি নিম্নরূপ—

I. প্রাথমিক চাহিদা পূরণ (Basic need approach) — প্রথমদিকে গ্রামোন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী পরিবারগুলির প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করা। এরজন্য যেমন উৎপাদন বাড়ানো প্রয়োজন তেমনি উৎপাদিত পণ্যের সুষম বণ্টন করা দরকার। কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো আরেকটি অত্যাবশ্যক কাজ যার দ্বারা দারিদ্র্য দূরীকরণ কিছুটা হলেও সম্ভব। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অধিকাংশ দেশের সরকারই দারিদ্র্যের মূল কারণ দূর করার চেষ্টা না করে বিদেশী অর্থসাহায্যে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পানীয় জলের বন্দোবস্ত, রাস্তাঘাট, গৃহনির্মাণ, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ প্রভৃতি জনসেবামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এর ফলে মানুষের তাৎক্ষণিক চাহিদা হয়ত কিছুটা পূরণ হয়েছে কিন্তু মূল অবস্থার খুব একটা ইতরবিশেষ হয় নি।

II. সর্বাঙ্গীণ গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী (Integrated rural development)—পরবর্তীকালে গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীগুলিকে সর্বাত্মক কল্যাণমুখী করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি, স্বনির্ভরতার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এগুলিকে পরিকল্পনার লক্ষ্য ধরা হয়েছে। Waterston সর্বাত্মক গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার ছয়টি উপাদান নিয়ে আলোচনা করেছেন।

(a) শ্রমনিবিড় কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা।

(b) কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ছোট সরকারী পরিকাঠামো নির্মাণ।

(c) শ্রমনিবিড় ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন।

(d) স্বনির্ভরতা কর্মসূচী এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ।

(e) নিকটবর্তী শহর এবং বাণিজ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন।

(f) বিবিধ ক্ষেত্রের পরিকল্পনা ঐ কার্যপদ্ধতির সমন্বয়ের জন্য স্বশাসিত প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস তৈরী করা।

উপরোক্ত উপাদানগুলির ভিত্তিতে রচিত পরিকল্পনা অনেকটাই বিস্তৃত হলেও উপযুক্ত সমন্বয়ের অভাবে এজাতীয় বৃহৎ পরিকল্পনা সফল করে তোলা সম্ভব হয় না।

III. গ্রন্থিকেন্দ্র বিন্যাস (Growth centre strategy)—শহর ও গ্রামের মধ্যে সুযোগ সুবিধার পার্থক্য দূরীকরণের জন্য অনেক ভূগোলবিদ গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নকেন্দ্র স্থাপনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। Thonson ভারতের বাজার শহরের উপর গবেষণা করার সময় গ্রামজ উৎপাদনগুলি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে গ্রামের নিকটে বাজার স্থাপন করার কথা বলেছেন। R. P. Misra বলেন, The distance — social and economic — between the village and the town is indeed great and it an be reduced only by the emergence of urban communities which are socially close to villages but economically and organizationaly more like the urban centres.'' অর্থাৎ গ্রাম-শহরের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয়ক্ষেত্রেই যে বিপুল দূরত্ব আছে তা দূর করার একমাত্র উপায় হল এমন এক শহুরে সমাজের সৃষ্টি করা যা সামাজিকভাবে গ্রামীণ কিন্তু আর্থিক ও পরিচালনার দিক দিয়ে একান্তভাবেই শহুরে।

ভারত ছাড়াও অন্যান্য দেশে যেমন, আফ্রিকার নাইজিরিয়া, ইথিওপিয়া, মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো, বলিভিয়া, দক্ষিণ এশিয়ার তাইওয়ান, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশেও কৃষি পণ্য সংগ্রহ, গুদামজাতকরণ এবং বিক্রয়ের বাজারের অভাবের দরুন গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা অনেকাংশে সফল হয়নি। একাধিক রাস্তার সংযোগস্থলে বিদ্যালয়, ভোগ্যপণ্যের খুচরো বাজার, প্রাইভেট ডাক্তারখানা, গাড়ি সারাইয়ের কারখানা প্রভৃতি গড়ে উঠলে ঐ এলাকার জনসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। তার সঙ্গে তাল রেখে রাস্তা ও গাড়ির সংখ্যা বাড়ে

এবং এলাকাটি ক্রমেই জমজমাট হয়ে ওঠে। ভারত ছাড়াও পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে এইভাবে গ্রামাঞ্চলে বিশৃঙ্খলভাবে গ্রন্থিকেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

IV. স্বনির্ভরতা লাভ (Agropolitan approach) — গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গী হল স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে জনগোষ্ঠীকে পরিচালনা করা। Friedman এবং Weaver মনে করেন পারস্পরিক সহযোগিতা এবং স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে গ্রামীণ সমাজ এগিয়ে যেতে পারে। গ্রামোন্নয়নের এই দৃষ্টিভঙ্গী নতুন নয়। মহাত্মা গান্ধীর সেবাগ্রাম (1920) এবং ওয়ার্ধা (1938), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীনিকেতন স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে পরিচালিত গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা। আফ্রিকার তানজানিয়ায় গৃহীত "উজামা" পরিকল্পনা এর সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু গ্রামীণ সমাজ জাতি, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে এত ভাগে বিভক্ত যে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলাই প্রধান সমস্যা।

V. সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গী — বর্তমানে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিকে আরও বেশী জনমুখী করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই মতানুযায়ী কোন পরিকল্পনা অন্তত চারটি অভীষ্ট পূরণ করবে।

(a) বিতর্ক সৃষ্টিকারী উন্নয়ন হ্রাস পাবে— শহর না গ্রাম, (dichotomons development) কৃষি না শিল্প, বৃহৎ না ক্ষুদ্র পরিকল্পনা— এই জাতীয় বিতর্ক সৃষ্টিকারী ক্ষেত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হবে।

(b) জনসংখ্যার দরিদ্র এবং পিছিয়ে পড়া মানুষজনের প্রয়োজনসমূহ অগ্রাধিকার পাবে।

(c) অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হবে।

(d) পরিকল্পনার পরিচালনগত দিকে স্থানীয় মানুষের যত বেশী সম্ভব অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে।

3.2 ভারতের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা

ভারতে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার ইতিহাস অনেক দিনের। 1921 সালে Martaindem project, F. L. Brayne-এর গুরগাঁও পরিকল্পনা, রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতন, মহাত্মা গান্ধীর সেবাগ্রাম আশ্রম গ্রামের মানুষের শিক্ষা ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্য সামনে রেখে গড়ে তোলা হয়েছিল। ২রা অক্টোবর 1952 সালে Community Development পরিকল্পনাই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গৃহীত প্রথম গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা।

I. Community Development — এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে সব রাজ্যের সব জেলাগুলিকে Community Development ব্লকে ভাগ করা হয়েছে। ভারত সরকারের অনুমোদিত এই পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলি নিম্নলিখিতরূপ—

(a) কৃষি ও সংযুক্ত ক্ষেত্র — (i) অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত জমি পুনরুদ্ধার ; (ii) জলসেচ, বীজ ও সারের যোগান। কৃষি যন্ত্রপাতির প্রসার, নতুন কৃষি পদ্ধতির প্রসার, পশুচিকিৎসার ব্যবস্থা, পশু প্রজনন কেন্দ্র, বনসৃজন ; (iii) কৃষিঋণ প্রদান।

(b) যোগাযোগ ব্যবস্থা — (i) রাস্তা নির্মাণ, (ii) পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি।

(c) শিক্ষা ক্ষেত্র— (i) প্রাথমিক স্তরে অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, (ii) মাধ্যমিক স্তরের স্কুল স্থাপন, (iii) বয়স্ক শিক্ষার প্রসার ও লাইব্রেরী স্থাপন।

(d) স্বাস্থ্য ব্যবস্থা— (i) নিকাশী ব্যবস্থার প্রসার ; (ii) মাতৃসদন স্থাপন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র নির্মাণ।

(e) কর্মসংস্থান— (i) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ঋণ দান, (ii) কো-অপারেটিভ স্থাপন, (iii) শিল্প দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বাজারের সংস্থান।

(f) গৃহনির্মাণ

(g) সমাজকল্যাণ— (i) লোকশিক্ষা ও বিনোদনের জন্য রেডিও, টি.ভি. ইত্যাদি সংযোগ, (ii) জেলাভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

প্রাথমিক প্রস্তুতি ছাড়াই পরিকল্পনাটি তাড়াহুড়ো করে নেওয়ার ফলে প্রতি ক্ষেত্রে পরিচালনা ও তদারকির উপযুক্ত দক্ষ লোকের অভাব রয়েছে। পঞ্চায়েতগুলি ও ব্লক উন্নয়ন অফিসারের হাতে সর্বাত্মক পরিকল্পনা নেওয়ার মত অর্থের অভাব রয়েছে। উপরন্তু চিরাচরিত জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় সমাজকে এত ভাগে ভাগ করে ফেলেছে যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ চালানো বাস্তবে সম্ভব হয় না। পাশাপাশি অবস্থিত ব্লকগুলির মধ্যে কাজের সমন্বয়ের অভাব আছে।

II. Intensive Area Development Programme— দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষের দিকে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে Ford Foundation-এর কয়েজন বিজ্ঞানী কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন বাড়ানোর জন্য অনেকগুলি পরামর্শ দেয়। তাঁদের পরামর্শের ভিত্তিতে ভারত সরকার 1960 সালে সাত রাজ্যের সাতটি জেলায় Intensive Area Development Programme (IADP) শুরু করে। জেলাগুলিতে উন্নয়নের নিম্নলিখিত চারটি লক্ষ্য স্থির করা হয়।

(a) জলসেচ ব্যবস্থার সামগ্রিক অগ্রগতি।

(b) বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিকাশী ব্যবস্থার প্রসার, মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ।

(c) পঞ্চায়েতী রাজ ভালভাবে কার্যকর করা।

(d) কো-অপারেটিভ ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো।

(e) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় বন্দোবস্ত নেওয়া।

Community Development Programme-এর বহুমুখী লক্ষ্যের পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষ্যপূরণের দিকে এই পরিকল্পনায় যত্ন নেওয়া হয়। উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহার করে পাঞ্জাব ও হরিয়ানার গমের উৎপাদন 175% বাড়ানো সম্ভব হয়। যদিও ধান ও মিলেটের ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নি। গমের ক্ষেত্রে এই অভূতপূর্ব উন্নতিকে সবুজ বিপ্লব বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

III. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ—চতুর্থ পরিকল্পনায় উপরোক্ত লক্ষ্য পূরণের জন্য ভারত সরকার একগুচ্ছ পরিকল্পনা গ্রহণ করে— ক্ষুদ্র চাষীর উন্নয়ন সংস্থান (Small Farmers' Development Agency SFDA), প্রান্তিক চাষী ও কৃষি শ্রমিক উন্নয়ন সংস্থান (Marginal Farmers' and agricultural labourers' Dev. Agency MFAL), গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জন্য চটজলদি ব্যবস্থা (Crash Scheme for Rural Employment CSRE) ইত্যাদি। এগুলি মূলতঃ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, কৃষিশ্রমিক এবং গ্রামের কুমোর, মাদুর প্রভৃতি কারিগরদের কথা ভেবে তৈরী। পঞ্চম পরিকল্পনায় SFDA এবং MFAL একসাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনাগুলির অধীনে কৃষিঋণ দেওয়া, টিউবওয়েল, কূপ প্রভৃতি খনন করা, সেচের জন্য পাম্পসেটের ব্যবস্থা করা, বীজ ও সারের যোগান দেওয়া ও প্রয়োগ পদ্ধতি দেখানো প্রভৃতি কাজ করা হয়েছে।

IV. খরা প্রবণ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প—চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ে খরা প্রবণ এলাকা

উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়। ভারতের প্রায় 19% এলাকা খরাপ্রবণ এবং 12% মানুষ খরা কবলিত এলাকাগুলিতে বাস করেন। এ কারণে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খরাপ্রবণ এলাকা উন্নয়ন পরিকল্পনা (Drought Prone Areas Programme (DPAP) নেওয়া হয়। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল নিম্নরূপ :

(a) সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ও রক্ষণাবেক্ষণ।

(b) মৃত্তিকার আর্দ্রতা সংরক্ষণ এবং বনসৃজন।

(c) কৃষি পদ্ধতির আধুনিকীকরণ এবং পশুচারণ ক্ষেত্রের উন্নতি।

(d) পশুপালনে উৎসাহ দান।

(e) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী এবং কৃষি শ্রমিকদের উন্নয়ন।

DPAP-এর মাধ্যমে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট, হরিয়ানা, জম্মু-কাশ্মীর, কর্ণাটক, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, উত্তর প্রদেশের অনেক জায়গায় সেচব্যবস্থার প্রসার হয়েছে। মৃত্তিকা সংরক্ষণ বিশেষ করে রাজস্থানে বালিয়াড়ি স্থায়ীকরণের কাজ হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় উন্নয়নের সুফল যাদের কাছে পৌঁছানোর কথা ছিল সেই সবচেয়ে দরিদ্র ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী এবং কৃষি শ্রমিকরা এর থেকে সরাসরি তেমনভাবে উপকৃত হয় নি।

IV. গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পরিকল্পনা— তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় Rural Works Programme (RWP) গ্রহণ করা হয় যার লক্ষ্য ছিল অন্তত 2.5 মিলিয়ন শ্রমিকের জন্য বছরে বেশিদিন কাজের বন্দোবস্ত করা। 1971 সালের এপ্রিল মাসে Cash Scheme for Rural Employment (CSRE) নামে আরেকটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়। প্রতি জেলায় অন্তত 1000 জনের সারা বছরের কর্মসংস্থান এবং স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পে তাদের সামিল করার উদ্দেশ্যে বছরে 50 কোটি টাকা ধার্য করা হয়। 1976-77 সালে গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে কর্মসংস্থানের জন্য কাজের বদলে খাদ্য (Food for Work-FWP) প্রকল্প নেওয়া হয়। এই প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য হল মজুরির সম্পূর্ণ ও আংশিক ভাগ খাদ্য শস্যের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। 1980-81 সালে এই প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে National Rural Employment Programme (NREP) রাখা হয়।

V. সর্বাত্মক গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা (Integrated Rural Development Pragramme-IRDP) — 1977 সালে জনতা দলের সরকারের আমলে ২০০০টি CD ব্লকে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হল জনসাধারণের চেতনা ও দক্ষতা বাড়ানো। সমাজের একেবারে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মধ্যে ছাগল, হাঁসমুরগী, প্রভৃতি বিতরণ করা যাতে এগুলি পালন করে তারা স্বনির্ভর হতে পারে। বনাঞ্চলের নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে সামাজিক বনসৃজন ও তার রক্ষণাবেক্ষণ, মাছ চাষ, ঝুড়ি, মাদুর জাতীয় স্বল্প মূলধন বিনিয়োগকারী কুটির শিল্প প্রভৃতিতে উৎসাহ দান এবং এগুলি থেকে আয়ের একটা অংশ সংগ্রহ করা যাতে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি হয়। এগুলিই হল IRDP-র লক্ষ্য।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী :

1. গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের উপযোগীতা কি?

2. বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প কত ধরণের হতে পারে উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

3. কি কি উদ্দেশ্য সামনে রেখে ভারতে গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পগুলি গৃহীত হয়েছে?

4. গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির মধ্যে কোনগুলি সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে করছেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

1. সর্বাঙ্গীণ গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর লক্ষ্য কি ছিল ?
2. ভারতে খরা-প্রবণ এলাকা উন্নয়নের জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলির করণীয় কাজ কি কি ছিল ?
3. ভারতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গৃহীত পরিকল্পনাগুলির নাম বলুন।
4. গ্রন্থিকেন্দ্র বিন্যাস গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প হিসাবে কতটা উপযুক্ত ?

উত্তরমালা :

1. 3.0 ভূমিকা দেখুন।
2. 3.1 অংশ দেখুন।
3. 3.2 অংশ দেখুন।
4. 3.2 অংশে বিভিন্ন প্রকল্পগুলির উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করে যেগুলি উপযুক্ত মনে হয় লিখুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর :

1. 3.1 এবং 3.2. অংশে সর্বাঙ্গীণ গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী অংশটি দেখুন।
2. 3.2 অংশে খরা-প্রবণ অঞ্চলের জন্য গৃহীত প্রকল্প অংশ দেখুন।
3. 3.2 অংশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পরিকল্পনা অংশ দেখুন।
4. 3.1 অংশে গ্রন্থিকেন্দ্র বিন্যাস অংশ দেখুন।

3.3 আঞ্চলিক উন্নয়নে কৃষি ও শিল্পের ভূমিকা

ভারতের আঞ্চলিক উন্নয়নে কৃষি ও শিল্প উভয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ভারতের মত বৃহৎ এবং মিশ্র অর্থনীতির দেশে আঞ্চলিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা সহজ নয়। ভারতের প্রায় 69% অধিবাসী গ্রামে বাস করে এবং গ্রামীণ অর্থনীতির মূল ভিত্তি হল কৃষি। তাই কৃষির উন্নতি এবং কৃষি পণ্যের বিপণন—এই দুটির উপর কার্যতঃ ভারতের আঞ্চলিক উন্নয়নের অনেকখানি নির্ভর করে! জাতীয় আয়ের প্রায় 40% কৃষি যোগান দেয়। তাছাড়াও এই বিপুল জনসংখ্যার দেশে খাদ্যের যোগান বজায় রাখার জন্যও কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ভারত কৃষি প্রধান দেশ হলেও অনেকগুলি খনিজ সম্পদ, যেমন—কয়লা, লৌহ আকরিক, তামা, বক্সাইট, অভ্র প্রভৃতি এই দেশে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। তাই খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও ধাতু শিল্প ভারতের অর্থনীতির আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক। কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে ইলেকট্রিকাল ও ইলেকট্রনিক শিল্প, মোটরগাড়ি ও জাহাজ নির্মাণ শিল্প ইত্যাদি শিল্পেও ভারতের লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আঞ্চলিক উন্নয়নে তাদের ভূমিকা সবসময় সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় নি। কোন কোন অঞ্চল নানা কারণে অন্যদের থেকে বাড়তি সুবিধা ভোগ করেছে।

3.4 আঞ্চলিক উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা

স্বাধীনতার পরেই গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য Community Development Programme গ্রহণ করা হলেও কৃষি উন্নতি কল্পে সরাসরি তেমন কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ দিকে Ford Foundation-এর সদস্য কমিটি ভারতের গ্রামগুলিতে সমীক্ষা চালিয়ে 1959 সালে India's Food Crisis and Steps to Meet it নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। এই রিপোর্টে যে সকল সাজেশন দেওয়া ছিল তার ভিত্তিতে ভারত সরকার 1960 সালে Intensive Area Development Programme (IADP) গ্রহণ করে। কৃষির উন্নতিকল্পে এটিই প্রথম সরকারী পদক্ষেপ।

প্রথমে সাতটি রাজ্যের সাতটি জেলায় এই কর্মসূচী নেওয়া হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের পশ্চিম গোদাবরী, বিহারের সাহাবাদ, মধ্যপ্রদেশের রায়পুর, তামিলনাড়ুর তাঞ্জাভুর, পাঞ্জাবের লুধিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের আলিগড় এবং রাজস্থানের পালি। এর মধ্যে প্রথম চারটি জেলায় ধান, পঞ্চম ও ষষ্ঠ জেলায় গম ও শেষ জেলাটিতে মিলেট চাষের উন্নতির জন্য চিহ্নিত করা হয়। 1965 সালের মধ্যে মোট 114টি জেলাকে এই কর্মসূচীর আওতায় নিয়ে আসা হয় ও নাম দেওয়া হয় Intensive Agricultural Areas Programme (IAAP)। উচ্চফলনশীল বীজের দ্বারা 1966 সালে খরিফ মরশুমে চাষ করা শুরু হয়। এর ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। 1965-66 সালের তুলনায় 1967-68 সালে 28% বেশী ফলন হয় এবং একে সবুজ বিপ্লব নামে অভিহিত করা শুরু হয়।

কিন্তু ক্রমশঃ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি বিষয় বিশেষ করে চোখে পড়ে। প্রথমতঃ গমের উৎপাদনশীলতা 115% বৃদ্ধি পেলেও ধান, জোয়ার ও বাজরার ক্ষেত্রে 1965-66 থেকে 1979-80 পর্যন্ত তেমন কোন লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন হয় নি, ভুট্টার চাষে মিশ্র ফল দেখা গেছে। সুতরাং এই অগ্রগতিকে সবুজ বিপ্লব না বলে বরঞ্চ গম বিপ্লব নামে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, সব রাজ্যে কৃষির উৎপাদন একই হারে বৃদ্ধি পায়নি। পাঞ্জাব ও হরিয়ানার বৃদ্ধির হার যথাক্রমে 8.35%, 6.66%। সেখানে উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ বা তামিলনাড়ুতে যথাক্রমে 3.28%, 3.14%, 3.12% মাত্র। বিহার বা মধ্যপ্রদেশে এই হার আরও কম, যথাক্রমে 1.67%, 1.29%। মাথাপিছু উৎপাদনের ক্ষেত্রেও পাঞ্জাব ও হরিয়ানা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক এগিয়ে রয়েছে। ফলতঃ কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কৃষিপণ্যের উৎপাদনের উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও আঞ্চলিক উন্নয়নে তার ভূমিকা সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছে।

তৃতীয়তঃ, উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহারের সুযোগ সব চাষীরা সমানভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। যাদের কৃষিক্ষেত্রের আয়তন বড়, নিয়মিত জলসেচ দেবার ব্যবস্থা আছে এমন চাষীরাই উচ্চফলনশীল বীজের দ্বারা উপকৃত হয়েছে। কিন্তু ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের তেমন কোন অবস্থান্তর হয়নি। কৃষিক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগের ক্ষমতা এবং উচ্চতর কারিগরি দক্ষতা যাদের আছে, কৃষির উন্নতির প্রকৃত সুফল তাদেরই হস্তগত হয়েছে।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খরা-প্রবণ এলাকা প্রকল্প (Drought Prone Area Programme) গ্রহণ করা হয়। এর আওতায় 13টি রাজ্যের মোট 74টি জেলার 557টি ব্লককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের 7টি, বিহারের 4টি, গুজরাটের 10টি, হরিয়ানার 3টি, জম্মু-কাশ্মীরের 2টি, কর্ণাটকের 10টি, মধ্যপ্রদেশের 6টি, মহারাষ্ট্রের 6টি, উড়িষ্যার 2টি, রাজস্থানের 13টি, তামিলনাড়ুর 2টি, উত্তরপ্রদেশের 6টি ও পশ্চিমবঙ্গের 3টি জেলাকে প্রকল্পে সামিল করা হয়। এর মধ্যে রাজস্থানে ইন্দিরা গান্ধী খাল ও রাজস্থান

ফীডার ক্যানাল ; রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের চম্বল নদী প্রকল্প ; গুজরাটের উকাই খাল প্রকল্প এবং রুদ্রমালা, ওজাট, দান্তিওয়াড়া, পানম ও কাপড়াপাড়া সেচ প্রকল্প গুলি সাফল্য লাভ করায় এই তিনটি রাজ্যে কৃষির উন্নতি ঘটেছে। তুলা, ইক্ষু, গম ও মিলেট চাষে এই তিনটি রাজ্যের সেচ সমৃদ্ধ এলাকাগুলি উন্নতি করেছে। কিন্তু অন্যান্য খরা-প্রবণ অঞ্চলগুলিতে কোন বড় ধরণের পরিবর্তন ঘটে নি। পশ্চিমবঙ্গে প্রধানত বোরো চাষ এবং ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পের উপর নির্ভর করে কৃষির উৎপাদন বাড়ানো হয়েছে।

কৃষির উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি হলেও সর্বস্তরের চাষীদের কাছে তার সুফল যে পৌঁছয় নি, তার একটা বড় কারণ হল বিপণন ব্যবস্থার ত্রুটি। চাষীরা সরাসরি বাজারের সঙ্গে যুক্ত না থাকার ফলে মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে বিক্রয় ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এই কারণে চাষীরা অনেক ক্ষেত্রেই ন্যায্য দাম পান না। কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ এমনকি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র চাষীদের আত্মহননের সংবাদ এই ইঙ্গিতই বহন করে যে, ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলই এখনও পর্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক উন্নয়নের শিকার।

3.5 আঞ্চলিক উন্নয়নে শিল্পের ভূমিকা

স্বাধীনতার আগে থেকেই ভারতের শিল্প সমৃদ্ধ এলাকাগুলি নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। এর মধ্যে কলকাতার নিকটবর্তী হুগলী শিল্পাঞ্চল, আসানসোল শিল্পাঞ্চল, জামসেদপুরের লৌহ-ইস্পাত শিল্প, মুম্বই-পুণে শিল্পাঞ্চল, আমেদাবাদ-ভাদোদরা শিল্পাঞ্চল এবং দিল্লীর পার্শ্ববর্তী আগ্রা-কানপুর শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি উল্লেখের দাবী রাখে।

স্বাধীনতা লাভের পর উন্নয়নের লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকেই শিল্প স্থাপনের দিকে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে ভিলাই, রৌরকেল্লা এবং দুর্গাপুরে তিনটি বৃহদাকার লৌহ-ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। সিন্ধ্রীর সার কারখানা, হিন্দুস্তান শিপইয়ার্ড, চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানা, নাঙ্গাল সার কারখানা— এই সব বৃহৎ সরকারী উদ্যোগের মাধ্যমে একদিকে যেমন শিল্পোন্নয়ন ঘটাবার চেষ্টা করা হয় তেমনি শিল্প স্থাপনের জন্য পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলিকে বেছে নেওয়া হয়। এছাড়াও পাট, সুতীবস্ত্র বয়ন, চিনিকল প্রভৃতি চিরাচরিত শিল্পগুলিরও আধুনিকীকরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এইভাবে শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এক ঝাঁক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। মহলানবিশ মডেলের এই পরিকল্পনা এবং ভারী শিল্প স্থাপনে সরকারী বিনিয়োগ— এই দুইয়ের মাধ্যমে কোন কোন অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়। যেমন সমগ্র ছোটনাগপুর অঞ্চল, পূর্ব মধ্যপ্রদেশের ভিলাই, রায়পুর, বিলাসপুর অঞ্চল, দক্ষিণে চেন্নাই, সালেম, বাঙ্গালোর-কোয়েম্বাটুর অঞ্চল প্রভৃতি। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ সেভাবে না হওয়ায় দেশের সর্বত্র শিল্পায়নের প্রভাব তেমনভাবে পড়ে নি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগও প্রসারিত হয় নি।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দা এই দুইয়ের যুগ্ম প্রভাবে শিল্পোন্নয়ন জোর ধাক্কা খায়। অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা বছরে 8% ধার্য করা হলেও কোন সময়ই তা 5% ছাড়ায় নি। এইভাবে চলার পর ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আধুনিক হাইটেক শিল্পের (ইলেকট্রনিক, পেট্রোকেমিকাল) উপর জোর দেওয়া হয়। সরকারী বিনিয়োগের উপর অত্যধিক গুরুত্ব কমিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয় এবং শিল্পে বিকেন্দ্রীকরণের উপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়

ততদিনে শিল্পের উৎপাদন পদ্ধতি ও কারিগরি কুশলতায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলি এত অগ্রগতি করে গেছে যে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের প্রবেশের সুযোগ সীমিত হয়ে গিয়েছে। শিল্পোন্নয়নের গতি সামান্য বেড়ে 6% হলেও তার প্রভাব শিল্পকেন্দ্রের পারিপার্শ্বিক অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছে বৃহত্তর হিন্টারল্যান্ড তার আওতায় আসে নি।

নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে GATT চুক্তির পরবর্তীকালে শিল্পক্ষেত্রে কতকগুলি বড় রকমের পরিবর্তন আসে। বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন উদ্যোগে গুরু শিল্প স্থাপিত হয়, সরকারী শিল্প কারখানাগুলির ব্যক্তিগত মালিকানায় হস্তান্তর করা শুরু হয় এবং বাজার ও ক্রেতার চাহিদা শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেতে শুরু করে। বিদ্যুৎ, জল ও পরিকাঠামোর প্রসার ঘটানোর সরকারী উদ্যোগের প্রসার ঘটানো হয় এবং শিল্পক্ষেত্রে বেসরকারী বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান করা হয়। এর ফলে রাসায়নিক সার, পেট্রোকেমিকাল, বৈদ্যুতিক পাখা, পাম্প প্রভৃতি তৈরী, সিমেন্ট, ট্রাক, অটো, মোটরবাইক, গাড়ি প্রভৃতি নির্মাণ শিল্প, ইলেকট্রনিক শিল্প, নানাবিধ ভোগ্যপণ্য তৈরীর কারখানা গড়ে ওঠে। এর ফলে শিল্পে কিছুটা বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে এবং নতুন কতকগুলি শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠে।

হরিয়ানায় ফরিদাবাদ-গুরগাঁও-আম্বালা, উত্তরপ্রদেশে আগ্রা-মথুরা-মীরাট, মহারাষ্ট্রের নাগপুর-ওয়ার্ধা, শোলাপুর-পুনে, অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দ্রাবাদ-বিশাখাপত্তনম, কর্ণাটকের কোলাপুর-বাঙ্গালোর-সাংলি, মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর-উজ্জয়িনী-নাগদা, গোয়া ও কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোর-মার্মাগাঁও, কেরালার তিরুবন্তপুরম-কোচি, উড়িষ্যার পারাদ্বীপ, পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়া প্রভৃতি অনেকগুলি নতুন শিল্পাঞ্চল ভারতের মানচিত্রে সংযোজিত হয়েছে যেগুলি শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণে সাহায্য করেছে। শিল্পের সন্তোষজনক অগ্রগতি এবং বিকেন্দ্রীকরণ উভয়ের উপরই নির্ভর করছে আঞ্চলিক উন্নয়নে তার ভূমিকা কতটা মূল্যবান হবে।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী :

1. ভারতের আঞ্চলিক উন্নয়নে কৃষি ও শিল্প গুরুত্বপূর্ণ কেন?
2. কৃষি আঞ্চলিক উন্নয়নে কিভাবে সহায়তা করেছে?
3. কৃষির উন্নতির সুফল ভারতের সর্বত্র সমানভাবে পৌঁছেছে কিনা আলোচনা করুন।
4. শিল্পে উন্নতির সুফল ভারতের কোন কোন অংশ সব থেকে বেশী ভোগ করছে?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

1. IADP কি?
2. কেন ভারতের সব রাজ্য IADP-র ফলে সমানভাবে উপকৃত হয় নি?
3. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতে কিভাবে শিল্পোন্নয়ন ঘটেছে?
4. সাম্প্রতিককালে শিল্পের ক্ষেত্রে কি ধরণের পরিবর্তন হয়েছে?

উত্তরমালা :

1. 3.3 অংশ দেখুন।
2. 3.4 অংশ দেখুন।
3. 3.4 অংশ দেখুন।
4. 3.5 অংশ দেখুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর :

1. 3.4 অংশ দেখুন।
2. 3.4 অংশ দেখুন।
3. 3.5 অংশ দেখুন।
4. 3.5 অংশের শেষাংশ দেখুন।

3.6 আঞ্চলিক বৈষম্য

ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে বৈষম্য নানা প্রকার। স্থানগত বৈষম্য (Spatial inequality), অর্থনৈতিক বৈষম্য (Economic inequality), আয়ের বন্টনে বৈষম্য (Inequality in income), সামাজিক বৈষম্য (Social inequality) প্রভৃতি নানা ধরনের অসাম্যের মধ্যে দিয়ে মানুষকে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। ভারতে এই অসাম্যের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। প্রথমতঃ, প্রকৃতি ভারতভূমির সর্বত্র সমান উদার নয়। নদীবিধৌত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সমভূমি অঞ্চল কৃষির পক্ষে উপযুক্ত ; তেমনি আবার পূর্ব ভারতের মালভূমি অঞ্চল খনিজ সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ফলে কৃষি ও শিল্পায়নের আঞ্চলিক বৈষম্যের ভৌগোলিক কারণ যথেষ্ট রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, ভারত প্রায় তিনশ বছর ধরে ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল। ফলে দীর্ঘদিন ভারতের অর্থনীতি ঔপনিবেশিক শাসকদের স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হত। ভারত থেকে ইংরেজরা তাদের শিল্পকেন্দ্রগুলির জন্য কাঁচামাল (তুলা, কয়লা) নিয়ে যেত। এই উদ্দেশ্যে তারা কলকাতা ও মুম্বই বন্দর দুটি ভালভাবে গড়ে তোলে ও বন্দরের সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে রেল যোগাযোগ স্থাপন করে। ক্রমশঃ এই দুটি বন্দর ভারতের অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। পার্শ্ববর্তী এমনকি দূরবর্তী অঞ্চল থেকে কাজের আশায় দক্ষ ও অদক্ষ সব ধরনের শ্রমজীবী মানুষ ভিড় জমাতে থাকে। এইভাবে চারপাশের বিস্তীর্ণ হিন্টারল্যান্ড এই দুটি বন্দর শহরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং আঞ্চলিক বৈষম্যের সূচনা হয়। মূলধন এবং দক্ষ পরিচালনার অভাবে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলি সব দিক থেকে বঞ্চিত হতে থাকে।

তৃতীয়তঃ, স্বাধীনতার পরে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য যে সব পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নেওয়া হয়, প্রয়োজনের তুলনায় সেগুলি অপ্রতুল তো বটেই, উপরন্তু কখনও কখনও সেগুলি বিপরীত ফল প্রদান করেছে। উচ্চফলনশীল বীজের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদন বাড়ানোর জন্য যে প্রযুক্তি অবলম্বন করা হয়েছিল তাতে বড় খামার, সেচযুক্ত জমি, প্রচুর সার প্রয়োগ করে যে সব জায়গায় চাষ হয়, তারাই লাভবান হয়েছে। ফলে বড় চাষীরা সুফল পেলেও ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের অবস্থার কোন সুরাহা হয়নি। ক্ষুদ্র জোত বিশিষ্ট ধান উৎপাদক অঞ্চলগুলির অবস্থা একই থেকে গিয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অনেকগুলি বৃহৎ শিল্প স্থাপিত হলেও আঞ্চলিক ভারসাম্য স্থাপনে তাদের ভূমিকা সীমিত থেকে গিয়েছে।

চতুর্থতঃ, সমস্যা সমাধানে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির সীমাবদ্ধতা আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নি। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত খরা-প্রবণ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প আংশিক সাফল্য পেলেও পশ্চাৎপর অঞ্চল উন্নয়নের অন্যান্য প্রকল্পগুলি তেমন সাফল্যের মুখ দেখে নি। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প, পাহাড়ী ও আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পগুলির খাতে

ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কম। উপরন্তু শিক্ষার প্রসার সেভাবে না ঘটায় আদিবাসীরা প্রকল্পগুলির সুযোগ নিতে সক্ষম হয় নি।

3.6.1 আঞ্চলিক বৈষম্যের মাত্রা পরিমাপ—

আঞ্চলিক বৈষম্যের মাত্রা পরিমাপ করার জন্য বিজ্ঞানীরা অনেকগুলি নির্দেশকের উপর নির্ভর করেছেন। ভারতে যেহেতু রাজ্যভিত্তিক সমীক্ষা চালানো হয় এবং পরিকল্পনা গ্রহণ, অর্থবরাদ্দ সবই রাজ্যভিত্তিক ধরা হয় তাই তথ্য সংগ্রহের একক হিসাবে রাজ্যকেই গণ্য করা হয়েছে। সেজন্য আঞ্চলিক বৈষম্যের আলোচনাতেও রাজ্যে রাজ্যে পার্থক্যের প্রসঙ্গই প্রধান বিবেচ্য হবে। আঞ্চলিক বৈষম্য পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন সময়ে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করা হয়েছে।

I মাথাপিছু আয় সমীক্ষা (percapita income) বিভিন্ন রাজ্যের মাথাপিছু গড় আয় পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্র সারণীর একেবারে উপর দিকে রয়েছে। প্রথমোক্ত রাজ্যদুটি কৃষি ক্ষেত্রে ও তৃতীয়টি শিল্পক্ষেত্রে এগিয়ে থাকায় এই উন্নতি সম্ভব হয়েছে। সর্বভারতীয় মাথাপিছু গড় আয়ের সামান্য উপরে রয়েছে গুজরাট, কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু, হিমাচলপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ। এছাড়া বাদবাকী সব রাজ্যগুলির মাথাপিছু আয় সর্বভারতীয় গড়ের নীচে রয়েছে। এর মধ্যে বিহার, উত্তরাঞ্চল, উত্তর প্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, জম্মু ও কাশ্মীর এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি সারণীর একেবারে নীচের দিকে অবস্থান করছে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মাথাপিছু আয়ের মধ্যে পার্থক্যের হারও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে। মাথাপিছু আয়ের সম্যক পার্থক্য (standard deviation) পরিমাপ করে দেখা যাচ্ছে যে 1960-61 সালে রাজ্যে রাজ্যে পার্থক্য যেখানে 60.15 ছিল সেখানে 2000-01 সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 266.93।

II শিল্পে অগ্রগতির মাত্রা— শিল্পে কোন রাজ্য কতটা অগ্রসর হয়েছে তার নিরিখেও আঞ্চলিক বৈষম্য পরিমাপ করা যায়। এর জন্য যে উপাদানগুলি সম্বন্ধে তথ্য জানা প্রয়োজন সেগুলি হল—

(a) শিল্পে নিযুক্ত উৎপাদনশীল মূলধনের পরিমাণ।

(b) মোট শ্রমিকের কত শতাংশ শিল্পে নিযুক্ত।

(c) মোট শতকরা উৎপাদন।

(d) শতকরা মূল্য সংযোজন (percent value added)

A. J. Singh এবং M. V. George-এর "Regional Economic Development in India"—নামক প্রবন্ধে দেখা যাচ্ছে যে, শিল্পে নিযুক্ত উৎপাদনশীল মূলধনের শতকরা পরিমাণ মহারাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশী। তারপর আছে গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও একত্রে বিহার ও ঝাড়খণ্ড। শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের শতকরা হারও মহারাষ্ট্রে সর্বাধিক এবং তার পরে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, গুজরাট ও ঝাড়খণ্ড। মোট উৎপাদনের 10 শতাংশের বেশী শিল্পক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত হয় এমন রাজ্যের সংখ্যা মাত্র ছয়—মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশ। মূল্য সংযোজনের শতকরা হারেও মহারাষ্ট্র সব রাজ্যের চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে।

সুতরাং শিল্পে অগ্রগতির মাত্রা পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে শিল্পে উন্নতির ভরকেন্দ্র হল মহারাষ্ট্র। পূর্বভারত, দক্ষিণ ভারত এবং পশ্চিম ভারতের কোন কোন রাজ্য শিল্পে কিছুটা অগ্রগতি করলেও আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে তার প্রভাব উল্লেখযোগ্য নয়।

III. মিশ্র উপাদানের ভিত্তিতে—বিবিধ উপাদানের উপর নির্ভর করে অনেক অর্থনীতিবিদ ভারতে আঞ্চলিক বৈষম্যের মাত্রা পরিমাপ করেছেন। এর মধ্যে অশোক মিত্র, ভি. নাথ, হেমলতা রাও প্রমুখের গবেষণা পৃথক উল্লেখের দাবী রাখে।

অশোক মিত্রের গবেষণা— 1961 সালের পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করে তখনকার রেজিস্ট্রার জেনারেল শ্রী অশোক মিত্র আঞ্চলিক উন্নয়নের মাত্রা পরিমাপ করার চেষ্টা করেন। তিনি যে সব উপাদান গ্রহণ করেছিলেন সেগুলিকে তিনি ছয়টি ব্লকে ভাগ করেন—

1. ভূতত্ত্ব, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু—গৃহের প্রকারভেদ, ভাষা ও জনসংখ্যার জাতিগত বণ্টন।

2. কৃষির পরিকাঠামো (জোতের আয়তন, কৃষি শ্রমিকের শতকরা হার, প্রতি 100 একর জমি পিছু নিযুক্ত মোট কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ইত্যাদি)

3. প্রচলিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের হার (অকৃষিকাজে কর্মনিযুক্তির শতকরা হার, কুটির শিল্পে নিয়োজিত একক ব্যক্তি ও পরিবারের শতকরা হার ইত্যাদি)।

4. সম্ভাব্য মানব সম্পদ (জনঘনত্ব, নারী-পুরুষের অনুপাত, বহিরাগত জনসংখ্যার শতকরা হার, সাক্ষরতার হার, তফসিলী জাতি ও উপজাতির শতকরা হার ইত্যাদি)।

5. ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প এবং পরিকাঠামো (খুচরো ব্যবসায় নিয়োজিত জনসংখ্যা, শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের হার, বাজার, খাবারের দোকান, অতিথিশালা, স্কুল, হাসপাতাল, প্রভৃতির সংখ্যা, রাস্তার দৈর্ঘ্য প্রভৃতি)।

6. আধুনিক শিল্প (বৈদ্যুতিক সংযোগের প্রসার, বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী শিল্প কারখানার সংখ্যা ইত্যাদি)।

উপরোক্ত উপাদানগুলির ভিত্তিতে গবেষণা করে অশোক মিত্র দেখেছেন যে তৎকালীন ভারতের 327টি জেলার 79টি উন্নয়নের একেবারে নীচের ধাপে থেকে গিয়েছে। এগুলিতে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় 20% বাস করে। 88টি জেলা তৃতীয় ধাপে এবং 62টি জেলা দ্বিতীয় ধাপে অবস্থান করছে। মাত্র 84টি জেলা ও প্রায় 31% অধিবাসী উন্নয়নের উচ্চতম ধাপে পৌছতে পেরেছে। রাজ্যওয়াড়ি তথ্য বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছিলেন যে মহারাষ্ট্র উন্নয়নের উচ্চতম ধাপে রয়েছে। তারপর গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ু, কর্ণাটক উল্লেখনীয়। বিহার, রাজস্থান, উড়িষ্যা, জম্মু-কাশ্মীর এবং উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে।

ভি. নাথ, হেমলতা রাও, বি. এন. গাঙ্গুলি, দেবেন্দ্র গুপ্তা প্রমুখ অর্থনীতিবিদেরা পরবর্তীকালে রাজ্যগুলির উন্নয়নের মাত্রা পরিমাপের চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন ধরনের উপাদানের সাহায্যে পরিমাপ করার চেষ্টা করলেও সকলেই কমবেশী একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কেরালা এবং পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়নের প্রথম সারিতে অবস্থান করছে। বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি পশ্চাৎপর রাজ্যের তালিকাভুক্ত।

IV. জীবনযাত্রার মানের সূচকের ভিত্তিতে (Physical Quality of Life Index—PQLI) —শিশুমৃত্যুর হার, সাক্ষরতার হার, দারিদ্র্যসীমার উর্দ্ধে বসবাসকারী জনসংখ্যার শতকরা পরিমাণ— এই তিনটি উপাদানের উপর ভিত্তি করে 1971 সাল থেকে জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। 2001 সালের জনগণনা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে PQLI অনুযায়ী জীবনযাত্রার মানে সর্বোচ্চ অবস্থায় রয়েছে কেরালা (89.11), দ্বিতীয় স্থানে পাঞ্জাব (66.28) এবং তৃতীয় স্থানে গুজরাট (58.38)। চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে, হরিয়ানা (55.68) এবং মহারাষ্ট্র (53.27)। এই কয়েকটি তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম এবং

চতুর্থ স্থানাধিকারীর মধ্যেই প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। নীচের সারিতে আছে বিহার (18.17) এবং উড়িষ্যা (6.7) অর্থাৎ প্রথম ও শেষ রাজ্য দুটির মধ্যে জীবনযাত্রার মানের পার্থক্য 13 গুণেরও বেশি।

V. মানব উন্নয়নের সূচকের মাধ্যমে (Human Development Index)—UNDP (United Nations Development Programme) তিনটি উপাদানের ভিত্তিতে মানব উন্নয়নের সূচক নির্দেশ করেছেন। উপাদানগুলি যথাক্রমে— আয়ুষ্কাল, বয়স্ক শিক্ষা, মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন। এই সূচক অনুযায়ী কেরালা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, গুজরাট, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক মানব উন্নয়নের প্রথম সারিতে অবস্থান করছে। সবচেয়ে পিছনে রয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তর প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী :

1. আঞ্চলিক বৈষম্য বলতে কি বোঝায়?
2. ভারতে আঞ্চলিক বৈষম্যের কারণগুলি কি কি?
3. আঞ্চলিক বৈষম্য কি কি উপায়ে পরিমাপ করা যায়?
4. ভারতে কোন কোন রাজ্যগুলি অধিক অসাম্যের শিকার?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

1. স্বাধীনতার পর আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?
2. কি কি উপাদানের ভিত্তিতে আঞ্চলিক বৈষম্যের মাত্রা পরিমাপ করা যায়?
3. অশোক মিত্র কিভাবে আঞ্চলিক বৈষম্য পরিমাপ করেন?
4. মানব উন্নয়নের সূচক বলতে কি বোঝায়?
5. মানব উন্নয়নের সূচক অনুযায়ী কোন কোন রাজ্য এখনও পর্যন্ত পশ্চাৎপর রয়ে গিয়েছে?

উত্তরমালা :

1. 3.6-এর ভূমিকা অংশ দেখুন।
2. 3.6-প্রথমাংশ দেখুন।
3. 3.6-এর আঞ্চলিক বৈষম্যের মাত্রা পরিমাপ অংশ দেখুন।
4. 3.6-এর আঞ্চলিক বৈষম্যের পরিমাপ অংশ দেখুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর :

1. 3.6-এর আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য গৃহীত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অংশ দেখুন।
2. আঞ্চলিক বৈষম্যের মাত্রা পরিমাপের পদ্ধতিগুলির নাম লিখুন।
3. আঞ্চলিক বৈষম্য পরিমাপের পদ্ধতিগুলির মধ্যে মিশ্র উপাদানের ভিত্তিতে পরিমাপের অংশ দেখুন।
4. 3.6-এর শেষাংশে মানব উন্নয়নের সূচক অংশ দেখুন।
5. মানব উন্নয়নের সূচক অংশ দেখুন।

গ্রন্থ নির্দেশিকা

Agarwal, A. N. (2000) - Indian Economy; Problems of Development and Planning.
Alexander, J. (1990) - Economic Geography.
Bhat, L. S. (1973) - Regional Planning in India.
Carter, H. (1981) - The Study of Urban Geography.
Chand, M. Puri, V. K. (1988) - Regional Planning in India.
Dickinson, R. E. - City and Region.
Hall, Peter (1974) - Urban and Regional Planning.
Hartshorn, T. A. and Alexander, J. W. - Economic Geography.
Jhonston, R. J. Gragary, Derek, Pratt, G. Watts, M. (ed) - A Dictionary of Human Geography.
Kuklinski, A. R. (ed 1972) - Growth Poles and Growth centres in Regional Planning.
Long, Goh ching and Morgan G. C. (1996)- Human and Economic Geography.
Misra R. P. (1969) - Regional Planning, Concept, Techniques, Policies.
Misra R. P., Sunderam and Rao (1974) - Regional Planning in India-A Strategy.
Mitra, Ashok (1971) - Levels of Regional Development in India.
Mondal, R. B. - Urban Geography.
Ray, P - Economic Geography - A Study of Resources.
Sengupta and Sdaryak, G (1961) - Economic Regionalisation of India.
Singh, R. Y (1990) - Geography of Settlement.
Srivastava, O. S. - Economics of Growth, Development and Planning.
Taylor G. - Urban Geography.
সেন, জ্যোতির্ময় (২০০০) - জনবসতি ভূগোল।
শীল, অজিতকুমার - সম্পদ সমীক্ষা।

NOTES

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

— সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

— Subhas Chandra Bose

Price : Rs. 225.00

(*NSOU* -র ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-1, Salt Lake City, Kolkata-700 064 and
Printed at : Royal Hlaftone Co., 4, Sarkar Bye Lane, Kolkata-700 007